এম ফিল অভিসন্দর্ভ

আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ'র দর্শনে

মানব মুক্তির স্বরূপ

মোঃ আব্দুল কুদ্দুস

রেজি নং ৩০/০৮

দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা ১০০০

নভেম্বর ২০১১ ইং

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

কৃতজ্ঞতাস্বীকার ---------- ০৫

সার-সংক্ষেপ ---------- ০৬

এক নজরে আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ'র সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম ---------- ০৮

উপস্থাপনা ---------- ২৫

- প্রাকৃতিক জীবন ---------- ২৬
- লক্ষ্যচ্যুত জীবন ---------- ৩০
- লক্ষ্যসম্পন্ন জীবন ---------- ৩৫

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন ঃ আল্লামা তাবাতাবাঈ'র মূল্যায়ন ---------- ৪০

দর্শনে মানব পরিচিতির প্রয়াস---------- ৫৮

আল্লামা তাবাতাবাঈ'র দৃষ্টিতে মানুষ সৃষ্টির রহস্য---------- ৮৪

- পরাপ্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়বাদ---------- ৮৫
- সৃষ্টি রহস্য ---------- ৮৮
- মানব সৃষ্টির চূড়ান্ত লক্ষ্য ---------- ৯০
- পরম স্রষ্টার দৃষ্টিকোণ থেকে মানব সৃষ্টির সার্মাগ্রক লক্ষ্য ---------- ৯২
- কোরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ---------- ৯৩

মানুষ ও আলমে যার ---------- ৯৮

মানবমুক্তির পথ ---------- ১০৬

- মুক্তির অর্থ কী?---------- ১০৭
- পাশ্চাত্যের মানবিক বিজ্ঞানে মানব মুক্তির প্রসঙ্গ---------- ১০৭
- পাশ্চাত্যের দৃষ্টি মূলত বস্তুগত মানবের দিকে ---------- ১০৮
- মানবমুক্তির জন্য ঐশ্বরিক পদক্ষেপ ---------- ১০৯
- মুক্তির পথ ---------- ১১০
- মুক্তির নিয়ামকসমূহ---------- ১১২

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশ

এ অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিষয়ে এম. ফিল. ডিগ্রী প্রদানের জন্য উপস্থাপনের অনুমতি দেওয়া হলো

অনুমোদনক্রমে

১. ২৮.১১.২০১১

ড. আনিসুজ্জামান
প্রফেসর, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

465920

২. ২৮/১১/২০১১

ড. মুহাম্মদ আবদুল লতিফ
প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Library
465920

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

- মুক্তির প্রতিবন্ধকসমূহ ---------- ১১৫

মানব মুক্তির স্বরূপ ---------- ১১৭

- একটি প্রশ্ন ---------- ১২৪
- সমস্যাটা কোথায়? ---------- ১২৬
- লক্ষ্যসম্পন্ন জীবনের বৈশিষ্ট্য ---------- ১২৭

উপসংহার ---------- ১৩২

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ---------- ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায় অবশেষে গুরুত্বপূর্ণ ও জীবন ঘনিষ্ঠ এ অভিসন্দর্ভটির কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হলো। 'মানবমুক্তি'র মতো একটি কঠিন ও স্পর্শকাতর বিষয়ের ওপর গবেষণা পরিচালনা মোটেও সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তবে সমকালের মহান দার্শনিক আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ'র দর্শন চিন্তায় এ সম্পর্কে যে দিকনির্দেশনা রয়েছে, তা আমাদের কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। এ অভিসন্দর্ভে প্রাচীন ও আধুনিক কালের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে মানব মুক্তির ভাবনাসমূহের বিশ্লেষণ করত এক্ষেত্রে আল্লামা তাবাতাবাঈ'র দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার প্রতিটি পরতে আমার পিতৃতুল্য পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এদেশের বরেণ্য দার্শনিক প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে সঠিক দিক-নির্দেশনা ও অবিরাম অনুপ্রেরণা যুগিয়ে এ গবেষণা কাজ সফল করতে সাহায্য করেছেন। সেজন্যে তাঁদের উভয়ের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া সাবেক ও বর্তমান বিভাগীয় চেয়ারপারসনদ্বয় যথাক্রমে মিসেস হোসনে আরা আলম ও মিসেস লতিফা বেগমসহ এম ফিল কোর্স পরিচালনাকারী আমার সকল শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রসঙ্গত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ইরানের কোম নগরীতে অবস্থিত আল-মুস্তাফা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির দর্শন বিষয়ে আমার সম্মানিত শিক্ষক প্রফেসর ড. কামাল হায়দারীকে, যিনি দীর্ঘ চার বছর আমাকে আল্লামা তাবাতাবাঈ'র দর্শনের ওপর পাঠদান করেছেন। একইভাবে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ঢাকাস্থ ইরান কালচারাল সেন্টারের সাবেক কালচারাল কাউন্সেলর ড. এম আর হাশেমী মহোদয়কে, যিনি আমার গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ

বাইরের জীবনের জন্যে মানুষের যেমন কিছু মৌলিক অধিকার রয়েছে, তেমনি তার মনেও রয়েছে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন। কোত্থেকে এসেছি? কোথায় আছি? আর কোথায় যাব? কিন্তু এসব প্রশ্নের বিপরীতে তিন ধরনের মানব জীবন পরিলক্ষিত হয় :

এক. সে সকল বেখবর মানুষদের জীবন, যারা অন্যান্য প্রাণীদের মতো সকালে নিদ্রা থেকে উঠে রুজি সংগ্রহের জন্যে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে যায়। তারপর খেয়ে নিদ্রাগমন। মাঝে অন্যান্য জৈবিক প্রয়োজন পূরণ। এভাবেই জীবনের শুরু আর এতেই শেষ। আমরা এ ধরনের জীবনের নাম দিয়েছি প্রাকৃতিক জীবন।

দুই. কিছুটা সচেতন ও জাগ্রত জনগোষ্ঠী, যারা মানব মনের মৌলিক প্রশ্নগুলো নিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া করেছে, কিন্তু কষ্ট স্বীকার করে এ প্রশ্নগুলোর সদুত্তর খোঁজেনি- পরিণতিতে এ বস্তুজীবন নিয়েই তারা সন্তুষ্ট। আমরা এ ধরনের জীবনের নাম দিয়েছি লক্ষ্যচ্যুত জীবন।

তিন. যারা উপরোক্ত মৌলিক প্রশ্নত্রয় নিয়ে নিরলস ভাবে অগ্রসর হয়েছে। অবশেষে সন্ধান পেয়েছে জীবনের প্রাকৃতিক রূপের উর্দ্ধে এক পরাপ্রাকৃতিক জগতের। এ জগতে প্রত্যাদেশ ও ঐশীপুরুষদের ভূমিকা অনস্বীকার্যভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে, প্রকৃত মানব মুক্তির পথ ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে। আমরা এ ধরনের জীবনের নাম দিয়েছি লক্ষ্যসম্পন্ন জীবন।

আল্লামা তাবাতাবাঈ সমসাময়িক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন মুসলিম দার্শনিক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন ও আধুনিক দর্শনের নিবিড় পর্যালোচনা করে তিনি মানব মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছেন। তিনি এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কোরআনের দর্শন ভিত্তিক তাফসীরকারকও বটে। তাঁর রচিত ২০ ভলিউয়্যুমের বিশাল তাফসীর গ্রন্থ 'আল-মীযান' কে মানবিক বিজ্ঞানের একটি সেরা বিশ্বকোষ বললে অত্যুক্তি হয় না। কোরআনিক শিক্ষার আলোকে গড়ে উঠেছে তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। The Principles of Philosophy and the Method of Realism শিরোনামে পাঁচ খণ্ডে রচিত তাঁর বিশাল দর্শন গ্রন্থটি এরই প্রতিফলন। মানব মুক্তির স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর দর্শন চিন্তায় যা পাওয়া যায় এক কথায় তা এভাবে ব্যক্ত করা যায় : তিনি উপরোক্ত মৌলিক প্রশ্নত্রয়ের উৎকৃষ্ট সমাধান প্রদান করতে সক্ষম হয়েছেন। আর একটু খোলাসা করে বলা যায় এভাবে :

Dhaka University Institutional Repository

Man is mortal এ ইংরেজি বাক্যটিতে is পদটি একটি সংযোজক অব্যয় পদ হিসাবে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করে এবং এভাবে সে নিজেও একটি অর্থপূর্ণ অবস্থান লাভ করতে সক্ষম হয়। উদ্দেশ্য ও বিধেয় ছাড়া একাকী ও স্বাধীনভাবে তার যেমন নিজস্ব কোন অবস্থান থাকে না, অনেকটা তেমনি মানুষের এ ক্ষণকালীন পার্থিব জীবনও যদি এর পূর্বাপর উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সাথে সংযুক্ত না থাকে, কেবলই জড় থেকে উত্থান ও জড়েই বিনাশ হয়, তাহলে জীবনও পরিণত হবে is পদের মতো অর্থহীন। বস্তুত জীবনের উপরোক্ত তিনটি মৌলিক প্রশ্নের প্রথমটির সমাধান প্রদানে আল্লামা তাবাতাবাঈ কোরআনের দর্শন থেকে 'আলমে যার' তথা 'the world of pre-existence' এর আলোচনার অবতারণা করেছেন। বাকী দুটি প্রশ্ন অর্থাৎ 'কোথায় আছি' এবং 'কোথায় যাব' এর সমাধান প্রদানে তিনি জড়বাদের অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতাকে সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং কোরআনের 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্যে এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব' এ আয়াতের আলোকে অস্তিত্বমান এ জগত ও জীবন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। এভাবে তিনি মানব জীবন ও মানব মুক্তি সম্পর্কে তিনটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তাঁর আলোচনা ও গবেষণা পরিচালনা করেছেন। এগুলো হলো :

- A Treatise on Man before the World (Risalah dar insan qabl al-dunya)
- A Treatise on Man in the World (Risalah dar insan fi al-dunya)
- A Treatise on Man after the World (Risalah dar insan ba'd al-dunya)

তাঁর এ দার্শনিক গবেষণায় substantial motion তত্ত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যার অংশ হিসাবে মানবের অস্তিত্বও সুদূর অতীত থেকে substantial গতির মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে জড় থেকে প্রাণ, তারপর আত্মার সঞ্চারণ এবং সবশেষে এক incorporeal সীমানায় প্রবেশ করে। ঠিক যেমন ছিটিয়ে থাকা বিন্দু জল একত্র হয়ে পরিণত হয় একটি জলরাশিতে, তারপর গড়িয়ে চলে, প্রথমে নদীনালা হিসাবে, তারপর সাগরের বুক পাড়ি দিয়ে একসময় মহাসাগরে মিশে যায়। যেন এটাই তার আসল অস্তিত্ব, আসল পরিচয় ও স্বরূপ। তার আর কোন পথ পাড়ি দেবার অপেক্ষা নেই, নেই কোন প্রশ্নও। সংখ্যার প্রশ্নও এখানে চলে না যে কতজন মানুষ এরূপে পূর্ণতা অর্জন করে। সৃষ্টির নিগুঢ় তত্ত্ব অনুসারে এখানে যেন একজন সমান সবজন (একজন মানুষ = সকল মানুষ)। এক সর্বব্যাপী অর্থে সৃষ্টিকর্তার উপাসনার মাধ্যমেই অর্জিত হয় মানবের এ পূর্ণতা।

Dhaka University Institutional Repository

জীবন ও কর্ম

আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ

(১৮৯২ - ১৯৮১ ইং)

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে
আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ'র
জীবন ও কর্ম

ভূমিকা

আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হুসাইন তাবাতাবাঈ বিগত তিন শতকের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক। ইরানের এ মহান মনীষী দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম জ্ঞানকেন্দ্রসমূহে দর্শন শাস্ত্রে যে বন্ধ্যাত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছিল, সে অবস্থার অবসান ঘটিয়ে মুসলিম দর্শনকে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তিনি কেবল তাঁর পূর্বসূরী দার্শনিক সাদরুল মোতাআল্লেহীন সিরাজী মোল্লা সাদরার (১৫৭১-১৬৪০) [১] প্রতিষ্ঠিত 'হিকমাত-ই মুতাআলীয়া'[২] দর্শনের ব্যাখ্যাতা ছিলেন না, বরং এ দার্শনিক মতবাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। তদ্রুপ, একাধিক সুযোগ্য শিষ্য প্রতিপালনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা যেমন মার্কসবাদের মোকাবেলায় ধর্মীয় চিন্তাধারাকে নতুন জীবন দান করেন। তিনি এমনকি পাশ্চাত্য সমাজেও তা প্রচারের প্রয়াস চালান। এককথায় বলা যায়, বিংশ শতকে ইরানে শুধু নয়, গোটা মুসলিম চিন্তা-দর্শনে তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য।

আল্লামা তাবাতাবাঈ'র বংশ পরিচয়

আল্লামা তাবাতাবাঈ'র পিতামহ একজন প্রখ্যাত দীনি আলেম ও মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়াও বিচিত্র কিছু বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। একদিন কোরআন তেলাওয়াত করার সময় তিনি এ আয়াতে এসে পৌছলেন 'এবং স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তাঁর প্রতিপালককে আহবান করে বলে : আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'[৩] এ আয়াত পাঠ করার পর তিনি ভগ্ন হৃদয় হয়ে পড়েন এবং সন্তানের অধিকারী না থাকার কারণে দুঃখভারাক্রান্ত হন। ঠিক তখনই তিনি এরূপ অনুধাবন করেন যে, যদি এ অবস্থায় তিনি স্রষ্টার কাছে স্বীয় মনোস্কামনা প্রার্থনা করেন তাহলে পূরণ হবে। তিনি প্রার্থনা করলেন। স্রষ্টাও তার দীর্ঘ এক জীবন পর এক

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান তাকে দান করেন। সে সন্তানই আল্লামা তাবাতাবাঈ'র শ্রদ্ধাভাজন পিতা। গর্বিত এ পিতা স্বীয় সন্তানের নাম রাখেন তার পিতামহের নামেই 'মুহাম্মদ হুসাইন।'

শৈশব ও কৈশর

তিনি ইরানের আযারবাইজান প্রদেশের তাবরিজ নগরীতে ১৮৯২ (বর্ণান্তরে ১৮৯৩) একটি সম্ভ্রান্ত সাইয়্যেদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি প্রথমে মাতা এবং নয় বছর বয়সে পিতাকে হারান। একমাত্র ছোট ভাইকে নিয়ে তিনি অসহায় অবস্থায় শৈশব থেকে কৈশরে পদার্পণ করেন। সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন ছয় বছর যাবত তৎকালীন প্রচলিত পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষা শেষ করে ফারসি ভাষার অমূল্য সম্পদ অর্থাৎ গুলিস্তান ও বুস্তান ইত্যাদি উচ্চমান কিতাব পাঠে মনোনিবেশ করেন। তিনি ব্যাকরণ ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি মীর্জা আলী নাকী নাম্মী জনৈক ক্যালিগ্রাফার প্রশিক্ষকের নিকট ক্যালিগ্রাফি শেখেন। এসব প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর মেধার তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম না হওয়ায় অগত্যা তিনি তাবরিজের তালেবিয়া বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখানে আরবী সাহিত্য ও ফেকাহ শাস্ত্রের ওপর পড়াশুনা চালিয়ে যান। সেখানে সাত বছর পড়াশুনা করার পর মুহাম্মাদ হুসাইন তাঁর ভাইকে সঙ্গে নিয়ে সেদিনের বৃহত্তম জ্ঞান নগরী ইরাকের নাজাফ শহরের উদ্দেশে রওনা হন। বিখ্যাত এ ধর্মতত্ত্ব কেন্দ্রে তিনি দীর্ঘ দশ বছর ধরে দীনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর গভীর পড়াশুনা চালিয়ে যান। পাশাপাশি আত্ম-সংশোধন ও চরিত্র গঠনের ব্যাপারে আদর্শ পুরুষে পরিণত হন।

তাঁর শিক্ষকবৃন্দ

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হোসাইন গণিত বিষয়ে নাজাফের তৎকালীন বিখ্যাত গণিতবিদ সাইয়েদ আবুল কাশেম খনসারির নিকট শিক্ষা লাভ করেন। আর ইসলামী আইনশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করেন প্রখ্যাত দুই পণ্ডিত আয়াতুল্লাহ[৪] নায়িনী ও আয়াতুল্লাহ ইসফাহানী'র তত্ত্বাবধানে। আইন শাস্ত্রের ওপর তাঁর অধ্যয়ন দীর্ঘ এক দশক কালেরও বেশি। আর তাঁর দর্শনের শিক্ষক ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ হাকিম ও দার্শনিক সাইয়্যেদ হোসাইন বদকুবে। এ মহান শিক্ষকের সান্নিধ্যে সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হোসাইন তাবাতাবাঈ স্বীয় সহোদরকে সহপাঠী করে বছরের বছর দর্শনের ওপর অধ্যয়ন ও গবেষণা চালিয়ে যান। এক আত্ম-জীবনীতে স্বয়ং সাইয়্যেদ তাঁর দর্শন অধ্যয়নের প্রসঙ্গে বলেন : 'দর্শনে আমি তৎকালের প্রখ্যাত হাকিম ও দার্শনিক সাইয়্যেদ হোসাইন বদকুবে'র নিকট ছয় বছর শিষ্যত্ব গ্রহণ করি এবং এ সময়কালে আমি সাবযেভারির 'মানজুমা', সাদরুল মুতাআল্লেহীন সিরাজির 'আসফার' ও 'মাশায়ির', ইবনে সিনার 'শিফা' এবং ইবনে মাসকাওয়াই এর 'আল হিকমাতুল খালিদা', তামহিদাত' এবং 'তাহ্যিবুল আখলাক' গ্রন্থ গুলো অধ্যয়ন করি। মরহুম শিক্ষক আমার শিক্ষার প্রতি যে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন সে সুবাদে আমি যাতে দার্শনিক ধ্যান ধারণা ও প্রমাণবিদ্যার সাথে

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিত হতে সক্ষম হই, সেজন্যে আমাকে নির্দেশ প্রদান করেন যেন গণিত শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করি। শিক্ষকের আদেশ পালনার্থে আমি সে সময়কার শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ আগা সাইয়্যেদ আবুল কাছেম খনছারির নিকট উপস্থিত হই এবং আলজেবরা, ত্রিকোণমিতি ও লগারিদমের ওপরে একটি করে পূর্ণ কোর্স সমাপ্ত করি।'

তিনি ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র ও নীতিবিদ্যার ওপর পড়াশুনা করেন আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী আগা কাজী তাবাতাবাঈ'র নিকট। আত্ম-সংশোধন ও আত্মিক সাধনামূলক স্বজ্ঞা জ্ঞান লাভে এ মহান শিক্ষাগুরুর প্রভাব এমনই গভীর ছিল যে বর্ণিত হয়েছে, 'যখনই সাইয়্যেদ মোহাম্মদ হোসাইন তাবাতাবাঈ তাঁর এ শিক্ষাগুরু অর্থাৎ আয়াতুল্লাহ কাজীর নাম শুনতেন, সাথে সাথে তিনি বেহাল হয়ে পড়তেন।' একজন শিক্ষাগুরু হয়েও তিনি তাঁর শিষ্যদের আত্মিক উন্নতির সর্বাত্মক দীক্ষা দিতেন। তিনি উপদেশ বাণীতে বলতেন : 'তোমার নিষ্ঠাকে বৃদ্ধি করো। আর আল্লাহর জন্যে লেখাপড়া করো। তোমার জিহ্বাকেও বেশি বেশি পাহারায় রাখবে।'

স্বয়ং আল্লামা তাবাতাবাঈ বলেন : 'আমি শিক্ষা জীবনের শুরুর দিকে যখন সবে আরবী ব্যাকরণের নিয়ম কানুনগুলো শিখছিলাম, তখন পড়াশুনা চালিয়ে যাবার তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। একারণে, যা কিছুই পড়তাম, বুঝতাম না। এভাবে চার বছর কেটে যায়। আমি আরবি ব্যাকরণ নিয়েই পড়ে থাকি। তারপর কখন একসময় মহান আল্লাহর কৃপা আমাকে ঘিরে ধরে, আমাকে বদলে ফেলে এবং আমি নিজের মধ্যে লেখাপড়ার প্রতি ব্যতিক্রমধর্মী এক ধরনের আকুলতা ও বিহ্বলতা অনুভব করলাম। এমনভাবে যে, সেদিন থেকে আমার শিক্ষা জীবনের শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ সতের বছরের মধ্যে আর কখনো অধ্যয়ন ও অনুধ্যানের কাজে কষ্ট বা নিরাশ হইনি। তখন আমি দুনিয়ার মন্দ ও সুন্দরকে ভুলে গিয়ে জাগতিক ঘটনাবলীর মধ্যে তিক্ততা ও মিষ্টতাকে সমান বলে মনে করতাম। যারা জ্ঞানানুরাগী ছিল না তাদের সঙ্গ আমি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করি। খাওয়া, ঘুম এবং জীবন ধারণের অনিবার্য বিষয়গুলোতে ন্যূনতম পরিমাণেই তুষ্ট হতে থাকি। বাদবাকি সময়ে কেবল লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকি। প্রায়শই বিশেষ করে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে এমন ঘটনা অনেক ঘটতো যে, পড়াশুনা করতে করতে রাত অতিবাহিত হয়ে যেত, ভোরের সূর্যোদয় ঘটলে তখনই বুঝতে পারতাম। সবসময় আমি পরের দিনের পাঠটি আগের রাতেই সমাধান করে তবে ক্লাসে যেতাম। কোথাও সমস্যা থাকলে যে কোন মূল্যে তা সমাধান করে ফেলতাম। পরেরদিন যখন ক্লাসে হাজির হতাম শিক্ষক কী বলছেন, তা আগে থেকেই আমি অবগত থাকতাম। কখনোই কোন সমস্যা শিক্ষক পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার দরকার পড়তো না।'

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

আল্লামা তাবাতাবাঈ তাবরিযস্থ তাঁদের ফসলের জমি থেকে যে অর্থ আসার কথা ছিল তা ঠিকমতো না পৌঁছার কারণে অর্থ সংকটে পতিত হন এবং এক পর্যায়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। উল্লেখ্য,

Dhaka University Institutional Repository

ইরানের তৎকালীন শাহের পক্ষ থেকে বিদেশে কোন অর্থ সরবরাহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়াই এ সংকটের মূল কারণ। নিজ ভূমে তাবরিযের শাদাব গ্রামে ফিরে তিনি পরবর্তী দশ বছর কৃষিকাজে কাটান। তদীয় পুত্র প্রকৌশলী সাইয়্যেদ আব্দুল বাকি তাবাতাবাঈ বলেন : 'আমার ভাল মনে পড়ে যে, আমার পিতা সর্বদা এবং সারা বছর জুড়ে নানা কর্ম-তৎপরতার মধ্যে কাটাতেন। প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যেও একটি ছাতা মাথায় কিম্বা কোন চামড়ার কাপড় গায়ে চড়িয়ে কাজে নেমে পড়া তাঁর জন্যে একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল। তাবরিযের শাদাব গ্রামে দীর্ঘ দশ বছর অবস্থান কালে বিরামহীন কর্মতৎপরতার মাধ্যমে তিনি ভূ-গর্ভস্থ পানির সঞ্চালন ক্যানেল খনন, ফসলের ক্ষেতগুলোতে মাটি বদলে সেখানে উর্বর মাটি সরবরাহ করা এবং নতুন নতুন বৃক্ষরাজির সমারোহে কয়েকটি ফলের বাগান গড়ে তোলেন। আর গরমকালে বসবাসের জন্যে গ্রামে একটি রুচিসম্মত বাড়ী নির্মাণ করেন। সে বাড়ীর ভূগর্ভস্থ অংশে আধুনিক কায়দায় একটি স্নানাগারও নির্মাণ করেন।

কোম নগরীর উদ্দেশে যাত্রা

আল্লামা তাবাতাবাঈ তাবরিযে দীর্ঘ একদশক অবস্থান করার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ইরানের জ্ঞান নগরী কোম শহরের উদ্দেশে যাত্রা করবেন। অবশেষে ১৯৪৬ সালে তিনি কোম নগরীতে প্রবেশ করেন। আল্লামা এ জ্ঞান নগরীতে কমই পরিচিত ছিলেন। তাবরিযের কিছু ছাত্র যারা কোমে পড়াশুনা করতো, জানতে পারে যে এমন একজন ব্যক্তি কোমে এসেছেন। এ কারণে তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে ক্লাস নেবার জন্যে অনুরোধ জানায়। প্রথমদিকে তিনি ইসলামের ফেকাহ ও উসুল শাস্ত্রের উচ্চতর স্তরে অধ্যাপনা শুরু করেন। কিন্তু অচিরেই উপলব্ধি করেন যে, কোমে এসব বিষয়ে চর্চা করার যথেষ্ট সুযোগ বর্তমান। কিন্তু কোরআনিক বিষয়াবলী এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পড়াশুনা অর্থাৎ দর্শনের চর্চা বড়ই অপ্রতুল। এ কারণে তিনি অধ্যাপনার বিষয় পরিবর্তন করেন এবং তাফসীরুল কোরআন ও দর্শনের ওপরে অধ্যাপনা শুরু করেন। নতুন পড়াশুনার স্বাদ লাভ করার সুবাদে ক্রমেই তাঁর ক্লাস খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যার সুফল আজও দৃশ্যমান।

কোমের বিদ্যমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিমন্ডল সম্পর্কে এক মূল্যায়নে আল্লামা বলেন :'যখন আমি কোমে আসি, কোমের বিদ্যমান পড়াশুনার পরিবেশ সম্পর্কে একটা স্টাডি করি। সেখানে যে জিনিসটার প্রয়োজন বেশি অনুভব করি সেটা হলো কোরআনের ওপর পড়াশুনা। আমাদের সমাজের কোরআনের সাথে পরিচিত হওয়ার দরকার ছিল খুব বেশি। তদ্রুপ নিজের আকীদা বিশ্বাসকে অন্যের মোকাবেলায় সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে প্রয়োজন বুদ্ধিবৃত্তিক ও যুক্তি-প্রমাণ ভিত্তিক চর্চা। কিন্তু সেখানে দর্শন পাঠের কোন চিহ্ন ছিল না। দর্শন কিম্বা কোরআনের তাফসীর একটি পাঠ্য হিসাবে উল্লেখিত ছিল না। বরং নিন্দার পাত্র ছিল বৈকি।'

আল্লামার দার্শনিক কর্মপন্থা

আল্লামা তাবাতাবাঈ দার্শনিক গবেষণায় কিছু স্বাতন্ত্র্যতার অধিকারী ছিলেন। যেমন:

Dhaka University Institutional Repository

১. তাঁর চিন্তার ভিত্তি কেবলমাত্র নিশ্চিত প্রমাণ দ্বারাই গঠিত হতো। কারণ, দার্শনিক বিষয়াবলী কেবল নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা দ্বারাই প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

২. তিনি বিখ্যাত ও মহান দার্শনিকবৃন্দের চিন্তা মুখস্ত ও পুনরাবৃত্তি করেই ক্ষান্ত হতেন না। অতীত দার্শনিকবৃন্দের চিন্তাধারাকে সমালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাচাই করতেন।

৩. আপেক্ষিক ও অপ্রকৃত বিষয়গুলোকে তিনি দার্শনিক বিষয়াবলির সাথে গুলিয়ে ফেলতেন না। নিজের চিন্তার মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে তিনি অস্তিত্বমান জগতের বাস্তব বিষয়গুলোকেই বেছে নিয়েছিলেন।

৪. হেকমাত তথা দর্শনে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক উৎকর্ষতা এতদূর পৌঁছেছিল যে, বুদ্ধিবৃত্তিক সামগ্রিকতাকে তিনি কোন ইমপ্রেশন বা আইডিয়ার সাহায্য ছাড়াই সরাসরি অনুধাবন করতেন।

৫. তাঁর দার্শনিক বিশ্লেষণের একটি নীতি ছিল বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে বিচার ও পর্যালোচনা করা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান সমস্যার ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন না করতেন, ততক্ষণ সে বিষয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হতেন না।

৬. তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যাবলীর বিন্যাসে গাণিতিক পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণ করতেন।

৭. তিনি বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ থেকে উপকৃত হতেন।

আল্লামা তাবাতাবাঈ যখন দর্শনের অধ্যাপনা শুরু করেন, তাঁর উপস্থাপনা সারমর্মের মতো করে হতো। তিনি কোন পুনরাবৃত্তি করতেন না, উদাহরণ প্রদান করতেন না। কথা কম, কিন্তু তার ভেতরে অনেক অর্থ। চিন্তা করে তবেই কথা বলতেন। যখন কোন বিষয়ে আলোচনায় প্রবেশ করতেন তখন উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলতেন : 'এ ক্লাসে উপস্থিত সবাই আলোচ্য বিষয়ে চিন্তা করবো এবং প্রবন্ধ লিখব।' তাঁর শিক্ষকতার এ পদ্ধতি শীঘ্রই আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং ছাত্ররা দলে দলে তাঁর ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে থাকে।

যদিও এক পর্যায়ে তাঁকে কোম নগরীর ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে দর্শন পাঠদান থেকে বিরত থাকার জন্যে চাপ প্রয়োগ করা হয় এবং তিনি বাধ্য হন প্রকাশ্য ক্লাস বর্জন করে রাতের বেলায় বিশেষ কিছু ছাত্রকে নিয়ে গবেষণামূলক ক্লাস তাঁর নিজ গৃহেই অনুষ্ঠিত করতে। দেইনানী'র বর্ণনা মোতাবেক - কিছু কিছু ধর্মীয় পন্ডিতের পীড়াপীড়ির কারণে সাদরুল মুতাআল্লেহীনের বিখ্যাত দর্শন গ্রন্থ 'আসফার' এর ওপর তাঁর প্রাত্যহিক দর্শনের ক্লাস বন্ধ হয়ে যায়। তখন একদল ছাত্রের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে ইবনে সিনার দর্শন গ্রন্থ 'আশ-শিফা'র ওপর ক্লাস নেবার অনুমতি প্রদান করা হয়। তখন তিনি নিজ গৃহেই এবং কখনো কখনো কোন কোন ছাত্রের বাসায় ভ্রাম্যমানরূপে নৈশকালীন দর্শন ক্লাসের চালু করেন এবং সেখানে আসফার গ্রন্থের পাঠদান অব্যাহত রাখেন। সপ্তাহে বৃহস্পতি ও শুক্র এ দুদিন করে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্লাসে অংশগ্রহণ সবার জন্যে উন্মুক্ত ছিল না। কেবল বাছাইকৃত কিছুসংখ্যক ছাত্র সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারতেন যাদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে জনা দশেক হবে। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন ড. বেহেশতী, অধ্যাপক শহীদ

Dhaka University Institutional Repository

মোতাহহারী, আয়াতুল্লাহ মোন্তাজেরী, ইজ্জুদ্দীন ইমামী, জনাব রশিদপুর প্রমুখ। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ বিদেশী ভাষা জানতেন। জনাব তেহরানী জার্মান ভাষা, ড. বেহেশতী ইংরেজি ভাষা, জনাব নাইয়েরী ফ্রেন্স ভাষা এবং জনাব রশীদপুর রুশ ভাষা জানতেন। এ সংবাদ জানতে পেরে আল্লামা তাদেরকে দায়িত্ব দেন এসব ভাষায় বিশ্বের বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রসমূহের সাথে পত্র মারফত যোগাযোগ গড়ে তুলতে এবং তাদের নিকট থেকে বস্তুবাদী দর্শনের ওপর যুক্তি-প্রমাণ সংগ্রহ করতে। ছাত্ররা পত্রযোগাযোগ শুরু করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ডাকযোগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে দর্শনের বই কিতাব কোমে আসতে থাকে। ছাত্ররা এসব বই পাঠ করে সারসংক্ষেপ ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করে আল্লামার কাছে উপস্থাপন করতেন। উপস্থাপিত বিষয়াবলী ক্লাসে বিশ্লেষণ করা হতো এবং প্রাচ্যের দর্শনের সাথে এর তুলনামূলক ষ্টাডি চালানো হতো।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা তাবাতাবাঈ'র পুত্র বলেন : আমি বাবাকে প্রশ্ন করি পাশ্চাত্যের দর্শন সম্পর্কে। তিনি বলেন : পাশ্চাত্য দর্শন আমাদের প্রাচ্যের দর্শনের তাৎপর্য অনুধাবন করতে অক্ষম। আমরা বলি 'আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়'। পাশ্চাত্য বুঝতে পারে না যে আল্লাহ কে যে তিনি এক ও অদ্বিতীয় হবেন? কিভাবে সম্ভব যে ঈশ্বর এক হবেন অথচ আমাদের নাগালের মধ্যে হবেন না? আমরাও আবার পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী দর্শনকে অনুধাবন করি না। মোটকথা, আল্লামা তাবাতাবাঈ তাঁর ক্লাসে প্রয়াস চালান এ দু'ধারার দর্শনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরতে এবং এর মাঝখান থেকে একটি নতুন ধারা বের করে আনতে।

আল্লামা তাবাতাবাঈ ক্লাসে উপস্থিত ছাত্রদেরকে বলতেন, 'আমরা যারা উপস্থিত আছি আজকের আলোচ্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করবো এবং প্রবন্ধ লিখবো।' সকলেই চিন্তা করতো এবং প্রবন্ধ লিখতো। কিন্তু কেবল আল্লামা তাবাতাবঈ'র লেখা প্রবন্ধগুলোই উল্লেখ হতো। এ প্রবন্ধের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮ টিতে। যা লিখতে তিনি সময় ব্যয় করেন ছয়টি বছর। দর্শনের এ গভীরতম উপস্থাপনা আজ দুনিয়ার অনেক জায়গার আধুনিক দর্শনের ধারক বাহক। এগুলো একত্র করে পাঁচ খণ্ড বিশিষ্ট আল্লামা তাবাতাবাঈ'র দর্শন গ্রন্থ The Principles of Philosophy and the Method of Realism (Iranian: *Usul-i-falsafeh va ravesh-i-ri'alism*) পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধগুলো এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকলেই বুঝতে সক্ষম হয়।

এছাড়া তিনি আরবী ভাষায় দর্শনের ওপর 'বিদায়াতুল হিকমা' এবং 'নেহায়াতুল হিকমা' শিরোনামে দুটি দর্শন শিক্ষার বই রচনা করেন। এ বইগুলো বর্তমানে অনেক দেশে যেমন ফ্রান্সে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পড়ানো হচ্ছে।

আল্লামা তাবাতাবাঈ'র দার্শনিক মেধা ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর সবচেয়ে প্রিয়তম ছাত্র অধ্যাপক শহীদ মোতাহহারীর মন্তব্য হলো :'দর্শনে আল্লামা তাবাতাবাঈ'র একাধিক মতবাদ রয়েছে। এমন সব মতবাদ যা

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিকভাবে মানসম্পন্ন। হয়তো বা ৫০ কিম্বা ৬০ বছর পরে গিয়ে এগুলোর মূল্য স্পষ্ট হবে। কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের মূল্য বুঝি না।'

'হেনরী কর্বন' এর সাথে পরিচয়

ফরাসি প্রফেসর ড. হেনরী কার্বন তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। প্রত্যেক শরৎকালে তিনি তিন মাসের জন্যে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন এবং দর্শন বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। মুর্তাজা মোতাহ্হারীসহ আল্লামা তাবাতাবাঈ'র সিনিয়র ছাত্রবৃন্দের মধ্যে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করতেন তারা তাঁকে চিনতেন এবং তাঁকে বলেছিলেন যে, দর্শন বিষয়ে সবচেয়ে উচ্চতর ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের গবেষণামূলক শিক্ষা যার কাছে রয়েছে তিনি হলেন আল্লামা তাবাতাবাঈ। আরও বলেছিলেন আল্লামা গ্রাফবিহীন দর্শনের চর্চা করেন। 'গ্রাফবিহীন' কথাটি বলার উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান স্থপতিরা যখন ভবনের নকশা করেন তখন কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাফের সাহায্য নেন। অর্থাৎ তারা পূর্ব থেকেই ভবনের ধারণা মস্তিষ্কে গড়ে তোলেন। অনেক পণ্ডিতের অবস্থাও তাই। তারা নিজ মস্তিষ্ককে চালিত না করে বরং অন্যের চিন্তার ফসল নিয়ে নাড়াচড়া করেন মাত্র। কিন্তু যারা অগ্রসর থাকেন তাদের এধরনের গ্রাফের প্রয়োজন হয় না। আল্লামা তাবাতাবাঈ ছিলেন তাদেরই একজন, সমস্যার সমাধান প্রদানে যার বাইরের তথ্যের প্রয়োজন হত না।

এরপর থেকে হেনরী কর্বন ও আল্লামা তাবাতাবাঈ'র মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতি দু'সপ্তাহে একবার তেহরানের একটি বাড়ীতে তাদের মধ্যে সাক্ষাত হতো। ড. নাসর এসময়ে তাদের মধ্যে মাধ্যম হিসাবে সহযোগিতা করতেন। ড. নাসর মূলত আমেরিকায় পড়াশুনা করেন এবং কিছু সম্পূরক লেখাপড়া করার জন্যে ইরানে ফিরে এসেছিলেন। এ সাক্ষাতের খবর ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সিনিয়র প্রফেসরও তাতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ড. শায়েগান, যিনি ভারত থেকে সংস্কৃত বিষয়ে পি এইচ ডি করেন, ড. সেপাহবুদি, যিনি ফ্রান্সে লেখাপড়া করেন। প্রফেসর হেনরীও শিয়া মতবাদ নিয়ে গবেষণায় রত ছিলেন। এ স্টাডি সার্কেল ৮ থেকে ১০ বছর অব্যাহত থাকে। অবশ্য আল্লামা তাবাতাবাঈ অন্যান্য শিক্ষকদের সাথেও যোগাযোগ রাখতেন।

তিনি বলতেন : 'পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ তথা পাশ্চাত্য জগত আমাদের জ্ঞানের কিছু অংশ মানে না। আমাদের যেসব জ্ঞান হাদীস ও রেওয়ায়াতের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোকে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করে থাকে।' এ বিষয়ে সচেতন থেকে তিনি তাঁর তাফসীর ও দর্শনের ভিতকে এমন ভাবে বিন্যস্ত করেন যাতে গোটা দুনিয়ার কাছে গ্রহণীয় হয়। একারণে তিনি এমনকি কোরআনের তাফসির রচনার সময়ও হাদীস ও রেওয়ায়াতের ভিতকে প্রথমদিকে অনুসরণ করলেও পরে তা দূরে সরিয়ে রেখে তদস্থলে প্রমাণনির্ভর ও বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসিরের পন্থা অবলম্বন করেন। দর্শনের বেলায় তিনি বলেন : 'আমাদের প্রাচ্য-দর্শনে যেসব

Dhaka University Institutional Repository

পরিভাষা রয়েছে সেগুলো পশ্চিমাদের কাছে বোধগম্য নয়। বিপরীতক্রমে তাদের বস্তুবাদী দর্শনের অনেক কথাও আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। সুতরাং আমাদের ও তাদের দর্শনের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। তাই তাদেরকে আমাদের কথাগুলো বুঝতে হবে।'

আল্লামা তাবাতাবাঈ'র চিন্তাধারার স্বরূপ

এ মহান বিদ্বান সবসময়ই চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকতেন। দিনে রাতে, উঠতে বসতে, শয়নে নিদ্রায় এবং ভ্রমণে সব সময়েই। চিন্তার বিষয়ও ছিল এমন সব ব্যাপার নিয়ে যা নিত্যনৈমিত্তিক বা সচরাচর ছিল না। আল্লামা তাবাতাবাঈ'র ছাত্র ড. গোলাম হোসাইন ইবরাহীমী দেইনানী এ প্রসঙ্গে বলেন : 'একজন ছাত্র হিসাবে আমি দেখেছি, তিনি কোমের ছাত্রদের মাঝেই হোক আর তেহরানে হেনরী কর্বনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের মাঝেই হোক, আমি অনুভব করতাম যে তিনি কোন বিষয় ততক্ষণ পর্যন্ত উত্থাপন করতেন না, যতক্ষণ না সে ব্যাপারে চিন্তা করেছেন এবং তার কাছে সেটা আর নতুন বিষয় থাকেনি।' এতদসত্ত্বেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন যে কোন বিষয়ে নতুন করে আবার চিন্তা করতে।

আল্লামা তাবাতাবাঈ'র চিন্তার মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্য

ড. দেইনানী বলেন, একটি প্রশ্ন, যার কোন প্রথাগত উত্তর নেই এবং আমি বাধ্য হই অলৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করতে, অর্থাৎ আমি নিজেও জানি না কী ভাবে এটা সম্ভব! প্রশ্নটি আমি নিজে অনেকবার নিজের কাছে উত্থাপন করেছি যে, একজন মানুষ, যিনি তাবরিয থেকে নাজাফে যান এবং পুনরায় তাবরিযে ফিরে আসেন। সেটাও আবার 'শাদাব'- এর মতো একটি গ্রামে! কিছুকাল সেখানে কাটান। তারপরে কোম নগরীর উদ্দেশে রওনা হন। আমি জানি না, তাবরিযের শাদাব গ্রাম আর কোম নগরীর সমন্বয়ে যে ফলাফল দাঁড়ায় তা কি আল্লামা তাবাতাবাঈ হতে পারেন কিনা? হয়তো এর সমষ্টিস্বরূপ একজন ফকীহ, মুফাসসির কিম্বা একজন সাধকপুরুষ দীনী আলেম হতে পারেন। কিন্তু তাঁর দর্শন চিন্তায় যে মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্য আমি প্রত্যক্ষ করতাম, সেটা এমন এক ব্যতিক্রমী ব্যাপার ছিল যে, হয়তো আমি কোন পাশ্চাত্য দার্শনিককেই এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলতে পারবো না। এ মৌলিকতার ভেদ ব্যাখ্যা করতে আমি অপারগ। কেবল এটুকুই বলতে পারি যে, তা ছিল ঐশী অনুগ্রহ। এর বাইরের কথা আমি কিছু জানিনা। কারণ, সেদিন না তাবরিযে এমন কোন দার্শনিক ছিলেন, আর না ছিলেন নাজাফে বা কোমে। তাই, এ প্রশ্ন তেমনই বহাল রয়েছে, আর আমার কাছে কোন উত্তর নেই। কেবল ঐ একটি কথা ছাড়া যেটা আমি বললাম। অর্থাৎ আল্লামার মৌলিক ও স্বতন্ত্র চিন্তা ঐশ্বরিক দান ছিল তাঁর জন্য।

ইউনেস্কো'র প্রতি আল্লামা তাবাতাবাঈ'র চিঠি

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা তাবাতাবাঈ দর্শনের জ্ঞান ও ভাবনার পাদপিঠে দাঁড়িয়ে পবিত্র কোরআনের তাফসিরও লিখেন 'তাফসিরুল মীযান' নামে। এ তাফসীর রচনা কালে কখনো কখনো এমনসব বিষয়ের সম্মুখীন হতেন যেগুলোর ক্ষেত্রে স্থান কালের পরিস্থিতি বিবেচনায় নেয়া এবং চিন্তার প্রয়োগ করার প্রয়োজন ছিল। একারণে তিনি ইউনেস্কো'র কাছে চিঠি লেখা শুরু করেন। ১৯৪৮ সালের দিকে এ চিঠি বিনিময় শুরু হয় এবং ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। তিনি কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হলে ইউনেস্কোর কাছে চিঠি লিখতেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডাটা সংগ্রহের জন্য। যেমন, নারীর কুমারীত্বের প্রশ্নে পাশ্চাত্যে যখন অবাধ যৌনাচার ছেয়ে যায় এবং প্রাচ্যের দেশগুলো এদিক থেকে যথেষ্ট নিরাপদ ছিল। কারণ, এ সমাজে নারীর কুমারীত্ব সম্মানের চোখে দেখা হয়। কন্যারা স্বীয় কুমারীত্ব কে বজায় রাখে বিবাহ অবধি। কিন্তু পাশ্চাত্যে এটা কোন বিষয় নয়। অচিরেই কন্যারা কুমারীত্ব হারিয়ে বসে। এ জাতীয় বিষয়ে তিনি ইউনেস্কোর সহায়তা গ্রহণ করতেন। সেদিন তথ্য পাওয়া গিয়েছিল যে, আমেরিকার নারীদের মধ্যে ১২ শতাংশেরও অধিক বাল্যকালেই স্বীয় কুমারীত্ব হারিয়ে ফেলে। (এটি তৎকালীন জরিপের তথ্য, সর্বশেষ জরিপে এ চিত্র ভয়াবহ। বর্তমানে সেখানে অনূর্ধ্ব ১২ বছরের কন্যাদের মধ্যে ৯০ শতাংশেরও বেশি তাদের কুমারীত্ব হারিয়ে ফেলে)

ঠিক এভাবেই তিনি উত্তরাধিকার, নৈতিকতা, পারিবারিক সম্পর্ক ও দাম্পত্য জীবন, সাধারণ সহায় সম্পত্তি আইন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে দেশ বিদেশের সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতেন এবং আধুনিক সব বিষয়ে তিনি পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। আল্লামা তাবাতাবাঈ বলতেন, তাফসিরুল মীযান রচনা করতে আমার জীবনের কুড়িটি বছর পরিশ্রম করেছি। কিন্তু তারপরও প্রতি দুবছরে একটি নতুন আল-মীযান তাফসীর লেখা উচিত। যাতে সে দু'বছরের নতুন পরিস্থিতিও সেখানে বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।

আল্লামা তাবাতাবাঈ'র প্রধান শিষ্যবৃন্দ

আল্লামা তাবাতাবাঈ দর্শনের ওপর অসংখ্য শিষ্য গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে যেসকল ব্যক্তি ইরানের শিক্ষা, সংস্কৃতি, গবেষণা এবং প্রশাসনিক অঙ্গনে নেতৃত্বের ভূমিকা রেখেছেন কিম্বা এখনো রাখছেন, তাঁদের অনেকেই আল্লামা তাবাতাবাঈ'র প্রত্যক্ষ অথবা ভাবশিষ্য ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতমরা হলেন :

১. আয়াতুল্লাহ শহীদ মূরতাজা মেতাহহ্হারী : তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষক, যার আততায়ীর গুলিতে নিহত হবার দিবসটি ইরানে জাতীয় শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। তিনি আল্লামা তাবাতাবাঈ কর্তৃক The Principles of Philosophy and the Method of Realism এর ব্যাখ্যা লেখার জন্যে নিয়োজিত হন।

২. ড. সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হোসাইনী বেহেশতী : তিনি ইরানের বিপ্লবোত্তর সংবিধান প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং পরবর্তীতে পার্লামেন্টের স্পীকার থাকা অবস্থায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

Dhaka University Institutional Repository

৩. **মুহাম্মাদ জাওয়াদ বাহোনার :** ইরানের বিশিষ্ট স্কলার ও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী।

৪. **নাসের মাকারিম শিরাজী :** এযুগের অন্যতম শীর্ষ মুজতাহিদ। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। এগুলোর মধ্যে তাঁর নেতৃত্বে আলেমদের একটি বোর্ড কর্তৃক রচিত কুড়ি খণ্ড বিশিষ্ট 'তাফসীর-এ নমুনা' গ্রন্থটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৫. **ইমাম মুসা সাদর :** নাজাফের শীর্ষ ফকীহ ও দার্শনিক। নাজাফের ধর্মতত্ত্ব কেন্দ্র পরিচালনায় অসামান্য অবদানের জন্য তিনি ইমাম উপাধি লাভ করেন।

৬. **আয়াতুল্লাহ ইবরাহীম আমীনী :** ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা নির্বাচনী পরিষদের অন্যতম সদস্য।

৭. **সাইয়্যেদ হুসাইন নাসর :** প্রখ্যাত ইরানী দার্শনিক ও জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

৮. **আব্দুল্লাহ জাওয়াদী আমুলী :** ইরানের এ সময়ের শীর্ষ দার্শনিক, ফকীহ ও মুফাসসির। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেইনী সোভিয়েট ইউনিয়নের তৎকালীন (১৯৮৯ ইং) কম্যুনিস্ট নেতা মিখাইল গর্বাচেভকে আস্তিক্যবাদে প্রত্যাবর্তনের আমন্ত্রণ জানিয়ে যে ঐতিহাসিক পত্র প্রেরণ করেছিলেন, সে পত্রের বাহক ছিলেন আয়াতুল্লাহ জাওয়াদী আমুলী।

৯. **হাসান হাসান যাদেহ আমুলী :** ইরানের শীর্ষ আধ্যাত্মিক সাধক পুরুষ।

১০. **আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহানী :** প্রবীন শিক্ষাবিদ এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ইমাম সাদেক রিসার্চ ইনিস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক।

১১. **হোসাইন নুরী হামাদানী :** বর্তমান ইরানের শীর্ষ ফকিহবৃন্দের একজন।

১২. **ড. গোলাম হোসাইন ইবরাহীম দেইনানী :** তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর।

১৩. **আয়াতুল্লাহ তাকী মিসবাহ ইয়াযদী :** শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক এবং পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষজ্ঞ। কোম নগরীতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অফ ফিলোসফি- তে প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের প্রায় পাঁচ শতাধিক গবেষক তাঁর তত্ত্বাবধানে দর্শন বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত রয়েছে।

১৪. **সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন অশতিয়ানী :** প্রখ্যাত ইরানী দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ এবং বহু ধর্মীয় গ্রন্থের প্রণেতা।

১৫. **সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী :** ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা (রাহ্‌বার)।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা তাবাতাবাঈ'র রচনাবলী

আল্লামা তাবাতাবাঈ'র রচনাবলীর সংখ্যা অনেক। এগুলো আরবী এবং ফার্সী ভাষায় রচিত। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলো সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ উল্লেখ করা হলো :

১. **তাফসীরুল মিযান :** ২০ খণ্ডে রচিত এ তাফসীর গ্রন্থটি একটি বিশ্বকোষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ, কোরআনের আলোকে মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ ইত্যাদি সকল বিষয়ে নিবিড় গবেষণা ও পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে এতে। আল্লামা'র জীবনের সুদীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে দিনরাত গবেষণার ফসল এ তাফসীরে তাঁর অনুসৃত রীতিটি মূলত তাঁর শিক্ষক আগা কাজী তাবাতাবাঈ'র কাছ থেকে শেখা, যা তিনি কোম নগরীতে এসে বাস্তবে রূপ দান করেন। আল-মীযান বিগত কয়েক শতকে মুসলমানদের তাফসীরের অঙ্গনে বিরাট শূণ্যতা পূরণ করে ইতোমধ্যেই এক অভাবনীয় মর্যাদার স্থান দখল করেছে। মূল আরবী ভাষায় রচিত এ বিশাল তাফসীর গ্রন্থটি বিশ্বের বিভিন্ন জীবন্ত ভাষায় অনূদিত হয়েছে

২. **বেদায়াতুল হিকমাহ :** দর্শন শিক্ষার এটি প্রথম বই। তিনি বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় আগ্রহী ছাত্রদের জন্যে সংক্ষিপ্তরূপে দর্শনকে বোঝার উপযোগী করে বইটি রচনা করেন। এটি প্রথমে কোম নগরীর জ্ঞানকেন্দ্রসমূহে, তারপর গোটা ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে দর্শনের একটি জনপ্রিয় পাঠ্যবই হিসাবে পঠিত হচ্ছে।

৩. **নেহায়াতুল হিকমাহ :** এ বইটিও আরবী ভাষায় রচিত দর্শনের উচ্চ পর্যায়ের আরেকটি পাঠ্য বই। এ উভয় বইয়ের ওপরে ইরানে অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। বিগত একশ' বছরে কোন মুসলিম দার্শনিকের লেখা দর্শন শিক্ষার বই এতোটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। যারা দর্শনের বোদ্ধা, তারা মনে করেন, মুসলিম দর্শনকে এগিয়ে নিতে এবং এর বিস্তার ঘটাতে আল্লামা তাবাতাবাঈ'র এ দুটি বই নজিরবিহীন অবদান রেখে চলেছে।

৪. **উসূলে ফালসাফা ও রাভেশে রেয়ালিজ্‌ম :** (The Principles of Philosophy and the Method of Realism): এটি আল্লামা তাবাতাবাঈ'র সমসাময়িক পাশ্চাত্য দর্শন, বিশেষ করে কম্যুনিজম ও বস্তুবাদের চুলচেরা বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ। বইটির উচ্চমান দার্শনিক ভাষা ও বক্তব্য সাধারণের সহজবোধ্য করে উপস্থাপনের জন্য তিনি তাঁর সুযোগ্য শিষ্য আয়াতুল্লাহ শহীদ মূর্তাজা মোতাহ্হারীকে দায়িত্ব প্রদান করেন। বর্তমানে এ বইটি শহীদ মোতহহারীর ব্যাখ্যাসহ প্রকাশিত হয়েছে।

৫. **প্রফেসর হেনরী কর্বন এর সাথে দার্শনিক আলোচনা সমগ্র :** এ ফরাসি প্রফেসরের সাথে আল্লামা তাবাতাবাঈ'র দার্শনিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাগত এবং আকিদা-বিশ্বাসগত বিষয়াদি নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘদিন ধরে যে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলো সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হয়েছে এ গ্রন্থে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার তুলনামূলক চিত্র অনবদ্য ভাবে ফুটে উঠেছে এ গ্রন্থের পাতায় পাতায়।

৬. **সোশাল রিলেশন্‌স ইন ইসলাম :** এ গ্রন্থে মানুষ ও সমাজ, মানুষের সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক জীবনের ভিত্তি, ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা... ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী আলোচিত হয়েছে।

৭. **শিয়াইজ্‌ম ইন ইসলাম :** এ বইটিও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

৮. **টিচিংস অফ ইসলাম :** একজন মুসলমান ব্যক্তির যেসব বিষয়ে জানা নৈতিক দায়িত্ব তার সবই সুবিন্যস্ত ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এ গ্রন্থে। বইটি বাংলা ভাষায়ও অনুবাদ হয়েছে 'ইসলাম পরিচিতি' শিরোনামে।

৯. **লুব্বুল লুবাব :** আরবী ভাষায় রচিত এটা আল্লামা তাবাতাবাঈ'র নীতিবিদ্যার ওপর অন্যতম গ্রন্থ।

১০. রেসালাতু ইনসান কাব্‌লাদ্দুনিয়া (A Treatise on Man before the World)

১১. রেসালাতু ইনসান ফিদ্দুনিয়া (A Treatise on Man in the World).

১২. রেসালাতু ইনসান বা'দাদ্দুনিয়া (A Treatise on Man after the World) .

শেষোক্ত তিনটি গ্রন্থ মানব বিজ্ঞানের ওপর আল্লামা তাবাতাবাবী'র সবচেয়ে পরিপূর্ণ গ্রন্থ। মানুষ সম্বন্ধে কোরআনিক ভিত্তিমূলের ওপর দাঁড়িয়ে আল্লামা তাবাতাবাঈ'র দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ রয়েছে এ গ্রন্থে। অত্র অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হোসাইন তাবাতাবাঈ'র দর্শন চিন্তায় মানব মুক্তির স্বরূপ'। এ অভিসন্দর্ভ পরিচালনায় আল্লামা তাবাতাবাঈ'র সকল রচনাবলীর ওপর নিবিড় অধ্যয়ন প্রয়োজন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু উল্লিখিত এ গ্রন্থটি মূল উপজীব্য হিসাবে মানব-মুক্তির বিষয়ে তাঁর দর্শন তুলে আনতে অনেক সহায়ক হয়েছে। আরবী ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটির অত্যধিক জ্ঞানগত মূল্যের কারণে বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদের প্রয়াস চলছে। তবে ইতোমধ্যে ফার্সী ভাষায় প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ এর একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ অনুবাদ ও ব্যাখ্যাটি ইরানের সমকালীন অন্যতম সেরা দার্শনিক, তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ড. সাদেক লারিজানী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

১৩. **আল্লামা'র কবিতা সমগ্র :** আল্লামা তাবাতাবাঈ সবকিছুকে ছাপিয়ে ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক সাধনার অগ্রপথিক হিসাবে। পারস্যের হাজার বছরের ইরফান তথা আধ্যাত্মিক সাধনা মাওলানা জালালউদ্দীন রুমীর অমর কাব্যগ্রন্থ মাসনাভী, শেখ সা'দীর গুলিস্তান ও বুস্তান, হাফিয শিরাজীর দেওয়ানে হাফিয এবং ফরিদুদ্দীন আত্তার এর দিওয়ান সহ অসংখ্য সাধকের কবিতায় যেমন

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাহিত হয়ে এসেছে, আল্লামা তাবাতাবাঈও তাঁর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর উচ্চমান আধ্যাত্মিক কবিতার একটি নমুনা নিম্নরূপ :

"আমার ধর্ম, যা ভালবাসা, হৃদয়বানদের
একথাই বলবো এবং বলেছি অনেকবার
এ দল থেকে বহির্ভূত যারা বেশি হুঁশিয়ার
ভালবাসার ধর্মে উপাসনা হয় পাগলপরার
আনন্দ, সুখ, নিদ্রা ও ভোগ যত যা কিছু
হৃদয়বানদের কোন কাজ নেই, এসবের পিছু
ভালবাসার মায়ায় বিদগ্ধজনের রিক্ত শূন্য হাত
কেবল অন্তরের আকুলতা আর চোখের অশ্রুপাত
হৃদয়বানদের পাড়ায় অন্তর আর ভোগের মাঝে
দন্ডায়মান রয়েছে এক দেয়াল সব অলিগলি বাঁকে
কত হাল্লাজরা ফাঁসির কাষ্ঠ বরণ করেছে এখানে
কত না ফরহাদ সঁপেছে জীবন মৃত্যুর পদতলে
কত মত আর কত পথ এ বিশ্ব ভুবনে, তবু
কি আছে জগতের, সেতো হৃদয় ও ভালবাসা, শুধু
মৃত যে, তার নিয়ে গর্বের কিছু নেই কখনো
কিন্তু সিংহপুরুষ ও সিদ্ধপুরুষ যারা
তারা ছিড়ে ফেলেছে জীবন হরণকারী মৃত্যুফাঁদ
ভালবাসার ভবনে তাঁরা মুক্ত স্বাধীন
পানির নালায় কত যে ফুল, রঙিন
নিজ রক্তে রক্তাক্ত, হয়েছে মুক্ত, স্বাধীন।"

আল্লামা তাবাতাবাঈ'র অন্যান্য দক্ষতা

আল্লামা তাবাতাবাঈ'র পুত্র বলেন : "আমার পিতা ব্যক্তিগত জীবনে তীরন্দাযীতে খুবই পটু ছিলেন এবং অশ্ব চালনায় বলতে গেলে তাবরিয নগরীতে তাঁর জুড়ি ছিল না। সুন্দর হস্তলিখন এবং আঁকাআঁকিতেও কম যেতেন না। তিনি বরাবরই লেখালেখিতে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। কবিতা রচনাও পাশাপাশি চলতো। আর

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাবিদ হিসাবে তিনি ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন, ছিলেন কালাম শাস্ত্র, ফেকাহ ও উসুল, দর্শন এবং গণিতের সবগুলো শাখায় সর্বোচ্চ স্তরের অভিজ্ঞ শিক্ষক। পাশাপাশি নীতিবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। আর হাদীস ও রেওয়ায়াত শাস্ত্রে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। হয়তো বিশ্বাস করবেন না, আমার পিতা এমনকি কৃষিবিদ্যায় এবং স্থাপত্য বিদ্যায়ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল তাবরীয নগরে তাঁর পৈত্রিক জমিতে চাষাবাদ করেছেন। আর কোম নগরীর ঐতিহ্যবাহী হুজ্জাত মসজিদের মূল স্থপতি তিনিই ছিলেন।

এতো কেবল তাঁর ব্যাপ্তিময় জীবনের অংশবিশেষ বলা হলো। কারণ, আপনারা জানেন, 'আল্লামা' উপাধি যে কোন বিদ্বানের প্রাপ্য নয়। আর পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদগণ যাকে-তাকে আল্লামা নামে আখ্যায়িত করেন না। যতক্ষণ না কারো জ্ঞানের ব্যাপ্তি, গভীরতা এবং তৎকালের সমুদয় জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্য তাদের কাছে সুপ্রমাণিত হয়।"

জীবনাবসান

আল্লামা তাবাতাবাঈ এক বর্ণাঢ্য জীবনের সায়াহ্নে এসে ইরানের মাশহাদ শহরে ইমাম রেযা'র মাযার যিয়ারত করতে যান। ২২ দিন সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু তার শরীর অসুস্থ থাকায় তাঁকে তেহরানে এনে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসায় বিশেষ কোন উপকার না হওয়ায় তাঁকে তাঁর আবাসভূমি কোমে আনা হয় এবং তিনি স্বীয় গৃহে শয্যাশায়ী হন। এ সময়ে তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠজনরা ছাড়া তাঁর সাথে কেউ সাক্ষাতের অনুমতি পেত না।

ইঞ্জিনিয়র আব্দুল বাকি বর্ণনা করেন যে, মৃত্যুর ৭/৮ দিন আগে আল্লামা কাউকে কোন জবাব দিতেন না। কথা বলতেন না। জিহবার নিচে কেবলই উচ্চারণ করতেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। অবস্থা যতই খারাপের দিকে যাচ্ছিল ততই তিনি স্বল্প আহার করতেন। আর তদীয় শিক্ষাগুরু প্রয়াত আয়াতুল্লাহ কাজী'র ন্যায় পারস্য কবি হাফিযের কবিতার এ চরণ দুটি আওড়াতেন আর কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন :

চলে গেছে কাফেলা, তুমি নিদ্রায়, সামনে ধু ধু প্রান্তর

কখন যাবে তুমি, কি করবে, পথ জিজ্ঞাসিবে কার?!

দিনে দিনে তাঁর অবস্থার আরো অবনতি ঘটতে থাকলে তাঁকে পুনরায় কোমের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রায় সাত দিন হাসপাতালের বিছানায় শয্যাশায়ী থাকেন। ঐ শেষ বেলায় কেউ তাকে প্রশ্ন করেন : আপনি কোন স্থানে এখন?

তিনি বলেন : কথোপকথনের স্থানে।

প্রশ্নকারী বলেন : কার সাথে?

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন : হক (পরম সত্য) এর সাথে।

শেষ দিনটিতে তিনি পুরোপুরি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। অবশেষে ১৯৮১ সালের একটি শোকময় প্রভাতে এ মহান জ্ঞান তাপসের জীবনাবসান ঘটে। খসে পড়ে দূর আকাশের একটি দ্যুতিময় নক্ষত্র। কোম নগরীর হযরত মাসুমার রওযার বলাহার নামক স্থানে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

আল্লামা তাবাতাবাঈ'র অমর বাণী থেকে

□ আমাদের আত্মগঠনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ নেই।

□ যা অন্বেষণ কর, নিজের কাছেই চাও।

□ আমরা অবশেষে যা কিছু বাইরে খুঁজেছি, ভেতরেই পেয়েছি।

□ আমাদের সামনে অনন্তকাল, আছি তো আছিই।

□ যদি একটি খড় হাতে উঠাও তাহলে জগতে তার প্রভাব পড়ে; তাহলে পাপ করার কি প্রভাব জগতে পড়ে না!

□ দর্শন শিক্ষা সম্পর্কে : যদি (দর্শন) পড়তে চাও (পড়), তবে ততদূর, যাতে বিশেষজ্ঞ হতে পারো; কিন্তু, যদি সে ধৈর্য না থাকে এবং নিছক কিছু পরিভাষা শেখাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে পড়বে না।

পাদটীকাসমূহ :

[১]. Ṣadr ad-Dīn Muḥammad Shīrāzī also called Mulla Sadrā (c. 1571–1641) was a Persian Shia Islamic philosopher, theologian and 'Ālim who led the Iranian cultural renaissance in the 17th century.According to Oliver Leaman, Mulla Sadra is arguably the single most important and influential philosopher in the Muslim world in the last four hundred years- - **Leaman (2007), p.146**

[২]. *Al-Hikma al-muta'aliya fi-l-asfar al-'aqliyya al-arba'a* [The Transcendent Philosophy of the Four Journeys of the Intellect], a philosophical encyclopedia and a collection of important issues discussed in Islamic philosophy, enriched by the ideas of preceding philosophers, from Pythagoras to those living at the same time with Mulla Sadra, and containing the related responses on the basis of new and strong arguments. In four large volumes; also published several times in nine smaller volumes. He composed this book gradually, starting in about 1015 A.H. (1605 A.D.); its completion took almost 25 years, until some years after 1040 A.H. (1630 A.D.)

[৩]. আল কোরআন, ২১ ঃ ৮৩;

[৪]. 'আয়াতুল্লাহ' হলো ইরান ও ইরাকের ধর্মতত্ত্ব গবেষণা ইনিস্টিটিউটসমূহের শিক্ষাক্রমের সর্বোচ্চ খেতাব বিশেষ, যা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার 'পোষ্ট ডক্টরেট ডিগ্রী'র সমমান বা তার চেয়ে জ্যেষ্ঠতাসম্পন্ন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. দি ডেইলি হামশাহ্‌রী, ২৫ অক্টোবর, ২০০৫ ইং, খেরাদনামা পৃ : ১;

২. অভিনী, আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হুসাইন তাবাতাবাঈ'র জিন্দেগীনামা,

৩. মোতাহহারী, ড. মূর্তাজা, *মাজমুআয়ে আছার*, ষষ্ঠ খণ্ড, নবম মুদ্রণ, সাদরা পাবলিকেশন্স, তেহরান, ২০০৪ ইং;

৪. আইনায়ে পাজুহেশ সাময়িকি (তেহরান), সংখ্যা ১৪;

৫. নাসরি, আব্দুল্লাহ, অইনেহ্‌হায়ে ফিলসুফ, ড. গোলাম হোসাইন দেইনানির সাথে সংলাপ পর্ব, শুরুশ প্রকাশনী, তেহরান, ২০০৪, দ্বিতীয় মুদ্রণ।

৬. ওয়েবসাইট : http://www.tebyan-tabriz.ir

Dhaka University Institutional Repository

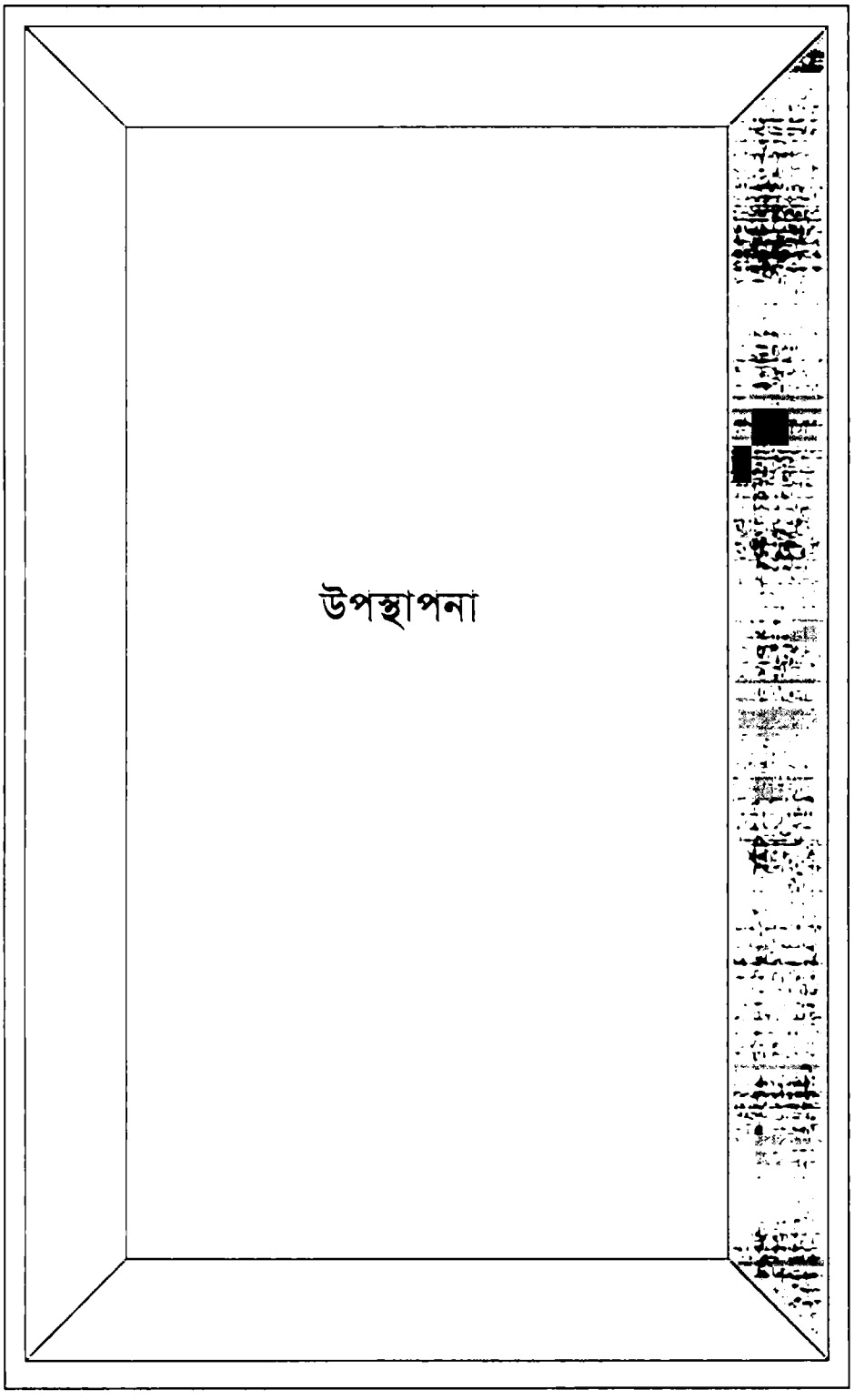

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপনা

প্রাকৃতিক জীবন

ভাবনার কাজটা মানুষেরই। জন্মের পর তার মায়ের কোলের নির্ভাবনার সময় কালটা মোটেও প্রলম্বিত হয় না। ইতরপ্রাণী শাবকের ন্যায় তাৎক্ষণিক না হলেও অচিরেই তাকে নিজের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে হয়। পারুক আর না পারুক তাকে সোজা হয়ে হাঁটতে হবে, মাড়ির মাংস ঠেলে দুধের দাঁত উঁকি দিতে না দিতেই শক্ত খাবার কাটতে হবে- আরও কতো ভাবনা। প্রথমে সরীসৃপের মতো বুকে ভর দিয়ে চলা, তারপর চতুষ্পদ প্রাণীর ন্যায় হামাগুড়ি, চেষ্টার এক পর্যায়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কদিন আগেও যার চারটি পা ছিল এবার সে হলো দ্বি-পদী। বাকি দুটি পা মুক্তি পেয়ে গেল, লাভ করলো হাতের গৌরব। যেন বেকার হয়ে পড়লো সামনের এ অঙ্গদু'টি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়[১] বলতে হয়, মানুষের কল্পনাবৃত্তি এ সুযোগে হাতকে পেয়ে বসলো। দেহের জরুরি কাজগুলো সেরে দিয়েই সে লেগে গেল নানা বাজে কাজে। যেগুলোকে নিতান্ত শৈশবের দুষ্টুমির খেলা বলে উপেক্ষা করে সবাই। কিন্তু মনে তার ভাবনার অন্ত নেই। চতুষ্পদ প্রাণীর ন্যায় ন্যুব্জ হয়ে চললে তার ভাবনার বোঝাটা হয়তো হালকা হতো। কেননা, সেক্ষেত্রে শুধু তার তলবর্তী ভূমিদেশের চেয়ে বেশিদূর দৃষ্টি প্রসারিত হতে পারতো না। কিন্তু ঋজু হয়ে দাঁড়ানোর কারণে তার দৃষ্টি প্রসারিত হলো দূরের আকাশ পর্যন্ত। ফলে জীবন আর চারপাশের জগৎ সম্পর্কে তার কৌতূহল নাছোড়বান্দার মতো তাকে তাড়া করে ফেরে। আকাশটা কতদূর, পাতাল কত নিচে, সাগরের অতলে কি, মাটি ফুঁড়ে ওপাশ দিয়ে বের হওয়া যায় না কেনো- এসব সহস্র ভাবনার যে মানব শিশু, সেই হতে পারে মনুষ্য জীবন দর্শনের শুরু এবং শেষ। তার অনিবারণীয় কৌতূহল আর তার ক্রমে বেড়ে ওঠার মধ্যে অতিপ্রাকৃতিক সকল দর্শনের সূত্রমূল লুক্কায়িত রয়েছে। কিন্তু এতো কিছু ভেবে ওঠার আগেই সে পদার্পণ করে যৌবনে। খেলা থেকে প্রস্থান করে কর্মক্ষেত্রে। এতদিনের পরনির্ভর জীবন থেকে ঢুকে পড়ে আত্মবিশ্বাসের মধ্যে। যদিও খানিকটা শৃঙ্খলার অভাব, কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক। কারণ, সদ্যই তো মুক্ত হলো স্বজনের স্নেহের বন্ধন আর সার্বক্ষণিক দৃষ্টির গণ্ডি থেকে। যৌবনের জীবনটা হলো বর্তমানের। এখানে তার নেই কোনো অতীতের আফসোস, তেমনি নেই কোনো ভবিষ্যতের শঙ্কা। সতেজতার সমস্ত অনুভব দিয়ে শুধু টিলা বেয়ে ওপরেই ওঠে, তাকে যে চূড়ায় আরোহণ করতেই হবে, স্বচক্ষে দেখতে হবে পাহাড়ের ওপাশের ঢালটা। বেশিরভাগ মানুষের মতে এই যৌবনের কালটাই হলো আসল জীবনের সময়। কখন জীবনকে আচ্ছন্ন করে তার জীবনে জেগে ওঠে প্রেমভক্তির কোমল অনুভূতি। যুবতী সহসাই শান্তপ্রকৃতি ধারণ করে,

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তায় মগ্ন হয়, যেন জীবনের ঢেউ তার মধ্যে সৃষ্টির অনুভূতি জাগায়। আর যুবক আসক্তিপূর্ণ এবং অশান্ত প্রকৃতির হয়ে ওঠে।

উইল ডুরান্টের ভাষায় :

> 'যদি যৌবনের সাথে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সংযোগ থাকতো তাহলে প্রেমকে অন্য সবকিছুর চাইতে বেশি মর্যাদা দিত। প্রেমকে ধারণ করার নিমিত্ত দেহ ও মনকে পাক সাফ করে রাখতো। আর প্রেমময় দিনগুলোকে বাগদানের মাসগুলোর মাধ্যমে প্রলম্বিত করতো এবং রীতি-প্রথার আনুষ্ঠিকতাপূর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠানের দ্বারা এর নিশ্চয়তা বিধান করতো। যদি প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি যুবক হতো তাহলে প্রেমকে সম্মান জানাতো, নিষ্ঠার সাথে এর পরিপুষ্টি ঘটাতো, আত্মত্যাগের মাধ্যমে এর গভীরতা বৃদ্ধি করতো এবং সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে একে প্রাণবন্ত ও জীবন্ত করতো। আর সবকিছুকেই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুগামী করে তুলতো।'[২]

এরপর আসে মধ্যবয়স। বিবাহ সম্পন্নের মাধ্যমেই এর শুরু। কথায় বলে, মানুষ যখন বিবাহ করে, আগের দিনের চেয়ে পাঁচ বছর বেশি বয়সী হয়ে যায়। নারীও তা-ই। অর্থনীতির জগতে নিজের একটা জায়গা খুঁজে পাওয়ার সাথে সাথে যৌবনের উন্মত্ততা শিথিল হতে থাকে, যেন শক্ত মাটিতে পা গাড়ার পর আর ভূমিকম্প চায় না। জীবন চল্লিশ বছর ছুঁয়ে যায়। অধিকাংশ মানুষের এ বয়স কেবল স্মৃতি বৈ আর কিছু নয়। যেন অবশিষ্ট থেকে যাওয়া কিছু ছাইভস্ম যা একসময় ছিল লেলিহান অগ্নিশিখা। প্রাকৃতিক জীবনে সবচেয়ে দুঃখজনক কথাটি হলো এখানে, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা এমন সময় ঘাটে তরী ভিড়ায় যখন যৌবন প্রস্থান করে। মধ্যবয়স ধাতস্ত হতেই একজন মানুষ লক্ষ্য করে সূর্যটা তার একেবারে মাথার ওপরে, আর সে দাঁড়িয়ে আছে জীবনটিলার সর্বশীর্ষে। ওপরে আরোহণ করার আর জায়গা নেই। সামনে এবার শুরু হয়েছে ঢালু উপত্যকা। আচমকা দৃষ্টিতে ভেসে আসে খাদের গভীর থেকে মৃত্যুর হাতছানি। এতদিন মৃত্যুর সম্পর্কে যা কিছু তার কাছে কেবল তত্ত্বকথা মনে হয়েছে, এবার সে স্বচক্ষে তার রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারে। দুনিয়াটা তার সামনে আড়ষ্টতায় জড়াতে থাকে। জীবনের চলচ্চিত্র যেন একটি স্থির বিলবোর্ডের রূপ ধারণ করে। প্রথমে বিশ্বাস না হলেও পরক্ষণেই লক্ষ্য করে যে, জীবনী শক্তি যেটা ক্ষয় হচ্ছে তা আর পূরণ হচ্ছে না। জীবনের পুঁজি থেকেই এখন খরচ করছে, লভ্যাংশ থেকে নয়। তাই শুরু হয় সতর্ক পথ চলা। কিছু অর্থপূর্ণ কাজ করার দিকে আগ্রহ বাড়ে তার। সযত্নে সন্তান লালনে মনোযোগী হয়। জীবনে ভারসাম্য আসতে থাকে। বার্ধক্য উঁকি দেয়। ফেলে আসা পেছনের দিকে আশাহত নেত্রে তাকিয়ে কষ্ট বাড়ে। যৌবনের স্বভাব নতুন ভাবনার প্রতি অতিশয় আগ্রহ। বার্ধক্যের স্বভাব নির্মমভাবে নতুনত্ব কামনার বিরোধিতা করা। আর মধ্যবয়সের কাজ নতুন ভাবনাকে ভারসাম্যপূর্ণ করা। যৌবন প্রস্তাব করে, বার্ধক্য নাকচ করে আর মধ্যবয়স তা পর্যালোচনা ও বিবেচনা করে। বার্ধক্যের ক্ষয় সর্বগ্রাসী হতে থাকে। জীবনের শেষে মৃত্যুর অমোঘ নিয়ম

Dhaka University Institutional Repository

আর মৃত্যুর পরে মাটিতে মিশে যাওয়া। যদি জীবন আমাদেরকে ছেড়েই যাবে তাহলে তার আর প্রশংসা কেনো! আর যদি প্রশংসাই করি তাহলে এ আশায় যে, পুনর্বার আরো উত্তমরূপে এর দেখা পাব।

এ হলো মানুষের প্রাকৃতিক জীবনের স্বরূপ। এ প্রাকৃতিক জীবনের উৎপত্তিভাবনায় মোট তিনটি মতবাদের সন্ধান মেলে। যথা : ১. আকস্মিক সৃষ্টিবাদ, ২. ক্রমবিবর্তনবাদ এবং ৩. লক্ষ্য তথা উদ্দেশ্যবাদ। আকস্মিক সৃষ্টিবাদ অনেক প্রাচীন মতবাদ। প্রাচ্যে যেমন পাশ্চাত্যেও তেমনি এর শিকড়ের সন্ধান মেলে। পারস্যের নওরোয কালচার সম্পর্কে এক প্রবন্ধে জনৈক ইরানী গবেষক[৩] লিখেছেন :

> 'ফারভারদিন (সৌরবর্ষের প্রথম মাস) -এর প্রথম দিনটি সম্মানিত হওয়ার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা এদিনেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আর প্রজ্ঞাবান সাত নক্ষত্রকেও যা প্রাচীন মনীষীদের দৃষ্টিতে 'সাত আসমানী পিতা' নামে বিখ্যাত এ দিনেই সৃষ্টি করেছেন। উম্মাহাতে আরবাআ বা চার মূল উপাদানের (পানি, আগুন, মাটি ও বাতাস) এর ওপর ঐ সাত বাবার বা নক্ষত্রের প্রভাবে তিন সন্তান জন্ম নেয়। ওরা হচ্ছে জড়, বৃক্ষ, প্রাণীকুল। এদের সৃষ্টির মাধ্যমে জগতে জীবনের স্পন্দন জাগে। প্রথম মানব হযরত আদম (আ.)ও বসন্তের এ প্রথম দিনেই সৃষ্টি হন।'

আকস্মিক সৃষ্টিরাদের ধারণা বদলে দিয়ে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক নতুন বার্তা নিয়ে উনিশ শতকে আগমন ঘটে বিবর্তনবাদের। মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত মত ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এ যেন এক বিরাট বিপ্লব। এ মতের প্রবক্তারা একের পর এক হাজির করেন বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং ঘোষণা করেন : বিশ্বজগৎ ও জীবনকুলের আবির্ভাব কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। এখানকার সবকিছুই ক্রমবিকাশের ফল। এ গতিময় ধারায় নিয়ত অগ্রসর হচ্ছে জগৎ-জীবন-সমাজ তথা গোটা বিশ্বজগৎ। এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক : এই যে বিশাল বিবর্তন ক্রিয়া তার চালিকা শক্তি কি? এর মূলে কোনো অদৃশ্য ঐশ্বরিক শক্তির ভূমিকা আছে কি? উত্তরে কেউ কেউ বলেন, 'না'। বিবর্তনের পেছনে কোনো ঐশ্বরিক শক্তির পরিচালনা নেই। কোনো ঐশ্বরিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যও তাতে কার্যকর নয়। বিবর্তন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল অনেকটা যন্ত্রের মতো। সব ঘটনাই ঘটে চলেছে আপনা-আপনি। জড়, গতি ও শক্তির স্বাভাবিক নিয়মে। এ মতের নাম যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ। এর দুই শক্তিশালী প্রবক্তা হার্বার্ট স্পেনসার ও চার্লস ডারউইন। এই একই বিবর্তনবাদকে ভিন্ন আঙ্গিকে দেখেছেন উনিশ-বিশ শতকের অপর এক ব্রিটিশ দার্শনিক স্যামুয়েল আলেকজান্ডার। তাঁর মতবাদটির নাম 'উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ'। তিনি মূলত অনুপ্রাণিত তাঁরই সমসাময়িক বিবর্তনবাদী লয়েড মর্গান দ্বারা। এরা উভয়েই স্পেনসার, ডারউইন প্রমুখের যান্ত্রিক বিবর্তনের মূল ধারার বিরোধী। মর্গান সমগ্র বিবর্তন প্রক্রিয়াকে একটি পিরামিড হিসাবে কল্পনা করেছেন। এ পিরামিডের সর্বনিম্নে রয়েছে ভৌত ঘটনাবলী ও জড় পদার্থ। এর পরবর্তী পর্যায়ে ভৌত ঘটনাবলী এমনভাবে মিশ্রিত ও সমন্বিত হয় যে, সে সব থেকে উন্মেষ ঘটে প্রাণের।

Dhaka University Institutional Repository

তার পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ে ঘটনাবলীর মধ্যে সূচিত হয় এক নতুন সম্বন্ধ। ফলে উদ্ভব ঘটে চেতনা বা মনের। আমরা যাকে মন (মনুষ্যজীবন) বলি, তা বিবর্তন পিরামিডের উচ্চতম শৃঙ্গস্বরূপ।

জড়বস্তু ও জড়জগতের বাস্তবতা অনস্বীকার্য। কিন্তু জড়, গতি ও পদার্থ শক্তির মধ্যেই জগতের সবকিছু সীমাবদ্ধ এবং জড়াতীত অতীন্দ্রিয় সত্তা বলে কিছু নেই– জড়বাদীদের এ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না। জড় বস্তু পরমসত্তা নয়, বরং এ বস্তুজগতের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে পরমসত্তার ঐশ্বরিক ইচ্ছা। এ সমগ্র জগৎ এক সুদূরপ্রসারী ঐশ্বরিক ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'মহাবিশ্বের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থেকে সৃষ্টি প্রবাহকে তার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই শ্রেণীর দার্শনিক মত উদ্দেশ্যবাদ নামে পরিচিত।[৪] উদ্দেশ্যবাদে সৃজনবাদ ও ক্রমবিবর্তন বা উন্মেষবাদের এক সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এ মতে, জাগতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়েই আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছেন এবং সৃষ্টি প্রবাহকে তাঁর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবায়ী[৫] মানবের উৎপত্তিভাবনা সমাধানে যে কোরআন সমর্থিত আলোচনার অবতারণা করেছেন সেখানে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন যা উপরোল্লিখিত মতবাদগুলো থেকে আলাদা। প্রথমত তিনি মনুষ্যজীবনকে তিনটি পর্বে উপস্থাপন করেছেন। যথা : ১. দুনিয়া-পূর্ব মানুষ ২. দুনিয়ায় মানুষ এবং ৩. দুনিয়া-উত্তর মানুষ। এ মুহূর্তে তাঁর প্রথম পর্বের আলোচনাটি প্রাসঙ্গিক। কোরআনের এ তত্ত্বকথাকে তিনি 'খাল্‌ক ও আম্‌র' শিরোনাম দিয়েছেন। এ একই শিরোনামে আলোচনা করেছেন ড. মুহাম্মাদ ইকবাল লাহোরীও।[৬] 'খাল্‌ক' হলো সৃষ্টি (Creation) আর 'আমর' হলো নির্দেশ (Direction). এরশাদ হচ্ছে : 'জেনে রাখো, খাল্‌ক তাঁরই কাজ, আমরও তাঁরই কাজ'।[৭] এ কথার অর্থ হচ্ছে আত্মার (জীবনের) মৌলিক প্রকৃতি হলো নির্দেশাত্মক। কেননা, আত্মা আসছে আল্লাহর নির্দেশমূলক স্পৃহা থেকে।

আমর হলো যা ('কুন'-আরবী ভাষায় যার অর্থ 'হও') দ্বারা উৎপত্তি হয় চোখের পলকে। 'আমার আদেশ তো এক কথায় চোখের পলকের মতো।'[৮] আর খাল্‌ক হলো ক্রমিক। আল কোরআনে এসেছে :

> 'আমি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্র হতে, তারপর রক্তপিণ্ড হতে, তারপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট অথবা অসম্পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড হতে। তোমাদের নিকট আমার শক্তির পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত করার জন্য আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে রেখে দেই, তারপর আমি তোমাদের শিশুরূপে বের করি, পরে তোমরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটে এবং'...।[৯]

সুতরাং খাল্‌কের জগৎ ক্রমিক (বিবর্তনশীল) আর আমরের জগৎ আকস্মিক। মানুষের দৈহিক সত্তা ও তার অনুষঙ্গ দিকটি ক্রমিকভাবে গঠন লাভ করে ঠিকই; কিন্তু তার অপর দিকটি ক্রমিক নয়, আকস্মিক। আল কোরআনে এসেছে :

Dhaka University Institutional Repository

'যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উত্তমরূপে সৃজন করেছেন এবং মাটি হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে তার বংশ উৎপন্ন করেন। পরে তিনি ওকে সুঠাম করেছেন এবং তাঁর নিকট হতে ওতে জীবন সঞ্চার করেছেন'... ।[১০]

এই শেষের ধাপটি (অর্থাৎ 'ওতে জীবন সঞ্চার করেছেন') আর ক্রমিক নয়, আকস্মিক। কারণ, তা খালক নয়, বরং আমর-এর অন্তর্ভুক্ত। আল কোরআনে এসেছে:

'তোমাকে ওরা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, রূহ আমার প্রতিপালকের আমর (তথা আদেশ ঘটিত) ।'[১১]

সুতরাং, খালক জগৎ আমর জগৎ থেকে উন্মেষিত। অর্থাৎ কোরআনের দৃষ্টিতে জীবন জড় থেকে উন্মেষিত নয়।

লক্ষ্যচ্যুত জীবন

মনুষ্যজীবনের দু'টি দিক : দৈহিক ও আত্মিক। একটি জৈবিক ও জাগতিক আর অন্যটি অজৈবিক, অজাগতিক। মানবজীবন সম্পর্কিত বিশারদরা এ দু'টি দিকের সমন্বয় সাধনের ভাবনায় বিভিন্ন পথে অগ্রসর হয়েছেন। এগুলোকে মোটামুটি ছয়টি মতবাদে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় :

১. বে-খেয়ালী এবং ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাহীন জীবন : এ প্রকারের জীবনে শুধু সেটুকুই প্রয়োজন হয় যতটুকু প্রাকৃতিক জীবনের জন্য দরকার। যথা : বংশ প্রজনন, ক্ষুন্নিবৃত্তিসহ প্রকৃতির নিয়ম-নিয়ামকের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলা। এ জীবনে মানুষ একটিবারও থমকে দাঁড়িয়ে তার জীবনের অর্থ খুঁজতে যায় না। আধ্যাত্মিক ভাবনা তো মোটেও না। যারা এ জীবনপন্থা বেছে নেয় তাদের নিজের থেকে আসলে কোনো স্বাধীনতাও নেই। কেবল প্রকৃতির জীবনধারার ক্ষণকালীন প্রবাহেই নির্দ্বিধায় আত্মসমর্পণ, তার বেশি কিছু নয়।

২. নিছক পৃথিবীর জন্যই পার্থিব জীবন : এ প্রকারের জীবনযাপনকারীরা কেবল দৈহিক ও পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত। নিজের জন্য বস্তুজগৎ সম্পর্কিত জীবনের বাইরে আর কিছুরই প্রতি তারা মনোযোগ দেয় না। জগতের কিছু নিয়মের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল। প্রকৃতি ও তার ব্যাপারসমূহকে তারা রসিকতা বলে উড়িয়ে দেয় না। পার্থিব বস্তুগত জীবনই তাদেরকে সন্তুষ্ট করেছে। এর বাইরে জীবনের উৎকৃষ্ট অনুভূতিগুলো তাদেরকে আন্দোলিত করে না। বিশ্বজগতে তাদের আসল স্থানটি কী সে ব্যাপারে তারা ভাবে না। তাই জীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলো অর্থাৎ কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাব আর কোথায় বা আছি- এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাও করে না।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আত্মার **উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং পরকালের** জন্য আধ্যাত্মিক **জীবন :** এ জীবনে ব্যক্তি নিজের জৈবিক ও প্রাকৃতিক চাহিদা **এবং** অনুভূতিগুলোকে অবদমন কাজে **লিপ্ত**। **কিছু সংখ্যক** সন্ন্যাসী আত্মার সূক্ষ্ম ও অজড় দিকগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করাই জীবনের **উৎকৃষ্ট** ব্রত বলে মনে করেন। **এরা** স্বীয় আত্মার **পরিপুষ্টির** জন্য অন্যদের নিয়ে একবারও ভাবেন না। কেবলই নিজের আত্মার মুক্তির ভাবনায় বুঁদ হয়ে থাকেন।

৪. জীবনের পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় **উপাদানের প্রতি মনোযোগী জীবন : এরা** জীবনের **পার্থিব** ও বস্তুগত দিকের প্রতি যেমন যত্নবান, পারলৌকিক জীবনের ব্যাপারেও **তদ্রূপ** যত্নবান। **এরা** পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনকে **একে** অপরের বিরুদ্ধে **উত্থাপন** করে **না**, একটার সাথে আরেকটিকে **মিশিয়ে** ফেলে না। এরা জানে না যে, মনুষ্যজীবন একটি অখণ্ড প্রপঞ্চের নাম। যদিও তার বিভিন্ন দিক তথা মাত্রা রয়েছে। **এরা** পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের নিরবচ্ছিন্নতা **এবং অভিন্ন** লক্ষ্য সম্পর্কে বেখবর।

৫. **বস্তুগত** জীবনের জন্য **আধ্যাত্মিক** ছদ্মবেশী আর পার্থিব **জীবনের** জন্য পারলৌকিক **ছদ্মবেশী জীবন : এরা** জীবনের অন্তর্নিহিত **সত্য উপলব্ধি** করতে **অপারগ**, কপটাশ্রয়ী। **এরা** একটা বিষয়ে বেখেয়াল যে, **কপটাচারের** মাধ্যমে **ক্ষণকালের** জন্য **কতিপয়** সরল লোককে প্রতারিত করা যায়। কিন্তু অন্যদের প্রতারিত করার **আগে আত্মপ্রতারণার** শিকার তারা নিজেরাই। বাস্তবিকপক্ষে তাদের এ পথ আত্মহননের পথ। এদের বাহ্য ব্যক্তিত্ব আধ্যাত্মিকতা সম্বলিত কিন্তু অভ্যন্তরটা কূটবুদ্ধিতে ভরা।

৬. পারলৌকিক জীবনের পথে চালিত পার্থিব **জীবন :** এ জীবন **ঐশীপুরুষদের** লক্ষ্য। জীবনকে তাঁরা **একটি উৎকৃষ্ট** ও **মর্যাদাপূর্ণ** সারসত্য বিষয় হিসাবে পরিচিত করেছেন এবং এ **পূর্ণতার** পথে অগ্রসর হবার **লক্ষ্যে** একদিকে ইল্‌ম বা জ্ঞান **এবং** অপরদিকে **আমল** বা কর্মকে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছেন। বস্তুজীবনে জাগতিক কর্মাদি **সাধনেই** মানুষের **পূর্ণতা** আসে। যদিও এসব কর্মের বস্তুরূপ **চোখে** পড়ে বেশি, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য পরকালকে ছুঁয়ে যেতে পারে। জীবনের এই যে রূপ, যার অভ্যন্তর দিকটা পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ আর বাহ্যরূপটা জাগতিক ও পার্থিব- এ জীবন কখনোই মানুষকে নিশ্চল ও নিষ্ফল করে না। জীবনেব শত বাধা ও তিক্ততা সত্ত্বেও এখানে জীবন স্বচ্ছ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়।[১২]

মূল আলোচনায় ফিরে যাই। খুব বেশি অতীতের দিকে না তাকিয়ে একবার বর্তমান মনুষ্যজীবনকে নিয়ে ভেবে দেখি। বর্তমান বিশ্বে 'ক্রমবিববর্তনবাদ' মানবজীবনে আশা ও উদ্যম আনার পরিবর্তে এনেছে হতাশা আর উৎকণ্ঠা। কেননা, আধুনিক বিবর্তনবাদীরা অকারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, মানুষের বর্তমান শারীরিক ও মানসিক গঠন জৈব **বিকাশের** চরম ফল এবং মৃত্যুতেই শেষ। তারপর আর কিছু নেই। মানুষ

Dhaka University Institutional Repository

পছন্দ করে প্রশংসা আর পূর্ব পুরুষদের গৌরবকথা। পূর্বপুরুষদের নিন্দা শুনতেও তার অনাগ্রহ। অথচ বিবর্তনবাদ অবলীলায় জানিয়ে দিল– মানুষ! তোমার পূর্ব পুরুষ ছিল বানর।[১৩] যে বানরকে দিয়ে মানুষ মানুষকে গালি দেয় সেই বানরই হলো তার অতীত পরিচয়। ফলে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়ার প্রথম বীজ বোনা হলো তার মনে। ড. মুহাম্মাদ ইকবাল তাই বলেন :

> 'বিবর্তনবাদ ইউরোপে আরো সুসংবদ্ধ হয়ে এ বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে যে, মানুষের এতো সমৃদ্ধ জীবন, মৃত্যুর সঙ্গেই এর শেষ। আধুনিক মানুষের নৈরাশ্য এমনিভাবে বৈজ্ঞানিক কথার মারপ্যাঁচের ভেতর লুকিয়ে আছে। নীটশে অবশ্য বলেছেন যে, বিবর্তনবাদ মানুষের পরজীবনকে অসম্ভব মনে করে না। কিন্তু তাঁর একথাও নৈরাশ্যবাদেরই নামান্তর। কারণ, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতিআগ্রহেও এর বেশি বলতে পারেননি যে, মানুষ অনন্তকাল পর্যন্ত পুনর্জন্ম গ্রহণ করবে। এ চিরন্তন পৌনঃপুনিকতাবাদ হতাশার বাণী– সৃষ্টিধর্মের অমরত্বের বাণী নয়।'[১৪]

আধুনিক মানুষ তার বুদ্ধির আবিষ্কার ও উপলব্ধির দ্বারা এতদূর সমাচ্ছান্ন হয়ে পড়েছে যে, আধ্যাত্মিকতার আবেদন তার জীবনে নেই বললেই চলে। নিজ অন্তরের সাথেই তার যোগ নেই। চিন্তা জগতে যেমন তার নিজের সাথে দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক জীবনেও তেমনি অপরের সাথে দ্বন্দ্ব। আত্মসর্বস্বতা, অফুরন্ত ঐশ্বর্যপিপাসা তাকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে, অপরপক্ষে তার লাভ হয়েছে জীবনব্যাপী অবসাদ। উইলিয়াম জেমস আজকের জীবন সভ্যতার চেহারা এঁকেছেন এভাবে :

> 'আধুনিক বিশ্বের দৃষ্টিতে দুনিয়া হলো পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত যৌগ বিশেষ যেগুলো কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়াই একত্রে মিশে কিছু একটা গঠন করে। অতঃপর কোনো অভীষ্ট লক্ষ্য ছাড়াই আবার একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং গঠনকৃত জিনিসের বিনাশ ঘটায়। তার কার্যকলাপের ধরনে এমন কোনো কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না যে, মানুষের প্রতি তার বিন্দুমাত্র সহমর্মিতা বা প্রীতি রয়েছে।'[১৫]

এখানে একটা কথা অবশ্য অনেকে তুলে ধরতে চান।[১৬] সেটা হলো এ জীবন নিয়েই মানুষের সন্তুষ্টিবোধ। যখন সবাই এ যান্ত্রিক সভ্যতার সুখের জীবন নিয়ে মজা পাচ্ছে, সবাই রাজি এবং খুশি, তাহলে কী দরকার তাদের সামনে জীবনের তত্ত্ব-দর্শনের ভাবনা তুলে তাদের এ জীবনে ব্যাঘাত ঘটানোর? তারা তাদের আত্মিক বা আধ্যাত্মিক দিকটা ভুলেও যদি সচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করতে পারে তাহলে ক্ষতি কি? উত্তরে মাওলানা রুমীর উপমাটাই সবচেয়ে আগে উল্লেখ করতে হয়। রুমী তাঁর মাসনাভীতে এ ধরনের লক্ষ্যচ্যুত জীবন নিয়ে যারা বেখেয়ালে বয়স কাটিয়ে দেয় তাদেরকে বলেছেন, এদের হাতে রয়েছে একটি মহামূল্য দিকনির্দেশক পুস্তক। আর এরা জানে যে, এটা বালিশ নয়, কিন্তু বই কী জিনিস বোঝে না বলে একবারও সেটা না খুলে বরং বালিশের স্থলে মাথার নিচে রেখে আরামে নিদ্রা যাচ্ছে। তারপর হাই তুলে বলছে কী সুখনিদ্রাই না দিলাম! তাহলে এদের কাছে জীবন-বইয়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার বলতে সুখনিদ্রাই

Dhaka University Institutional Repository

বুঝায়। কেউ বা আবার বলেন, এ জীবনটাই তাদের কাছে এমন সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এর বাইরে কিছু বলা মানে পাগল আখ্যা পাওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না। কী দরকার তার?

কিন্তু এটাও কোনো ভাবুক মানুষের কথা হলো না। এটা ঠিক যে, মানুষের মধ্যে যে অসামান্য উপযোগিতা ও শক্তিশালী জীবনক্ষমতা নিহিত তা দ্বারা সে যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে অভিযোজিত করে নিতে সক্ষম। সে যেমন গোটা জীবনটা ভোগের মধ্যে বুঁদ হয়ে পার করতে পারে, আদৌ উপলব্ধি করবে না যে, দুনিয়ার ভাল কী আর মন্দ কী, বৈধ কী আর অবৈধই বা কী? সে এটা পারে। কারণ, স্রষ্টার সূক্ষ্ম প্রজ্ঞায় মানুষের জীবনীশক্তিতে সে ক্ষমতা রয়েছে। এমনকি কৃত্রিম ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সে নিজেকে চলনসই করে ফেলে। কিন্তু তখন সে আর মানুষ থাকে না। ইতিহাসে আমরা এমন অনেকের সাক্ষাৎ পাই যারা সহস্রাধিক বরং লক্ষাধিক মানুষের রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। তারপর এমনকি কাক-শকুনও যাতে ভাগ বসাতে না পারে তার আগেই সেগুলো টুকরো টুকরো করে আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দিয়েছে। অথচ মানুষ তো এমনটা নাও হতে পারে। একজন মানুষের মৃত্যুতেই সে ক্রন্দন ও আহাজারি করতে পারতো লক্ষ মানুষকে নিধন করার পরিবর্তে। তাই আমরা মানুষের এ অবৈধ কৃত্রিম জীবন গড়ে তোলার অদ্ভুত শক্তিকে অস্বীকার করি না। হোক না সেকারণে তারা আমাদেরকেই পাগল বলে উপহাস করুক। যেসময়ে দাসপ্রথা চালু ছিল তখনও তো মানুষ এহেন নিকৃষ্ট জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল। সে সময়েও যদি কেউ বলতে চাইতো দাসপ্রথা আবার কি? দাসপ্রথা বৈধ হলো কিভাবে? মানুষ কি মায়ের পেট থেকে দাস হয়ে আসে নাকি? তাহলে সেসময়েও হয়তো নির্ঘাত সকলে বিদ্রূপ করেই বলতো- কোত্থেকে জুটলো এ পাগলটা?! আবার কেউ বা আরেকটু দয়াপরবশ হয়ে আপনাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তির সুপরামর্শ দিত। কেননা, তাদের বিশ্বাস, কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ একথা বলতে পারে না। অথচ আজ আমরা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করছি যে, দাসত্বের যুগে মানুষ নিতান্তই অমানবিক জীবনযাপন করেছে।

তদ্রূপ আজ আধুনিক শিল্প-সভ্যতার যাঁতাকলে পিষ্ট জীবন যে কতটা অমানবিক এবং মনুষ্য জীবনের লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়েছে, সেটা বুঁদ হয়ে থাকা মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। Alexis Carrel বলেন :

> 'এ আধুনিক সভ্যতা এবং এ নিত্য-নৈমিত্তিক শিল্প উদ্ভাবন আমাদের জীবনের প্রকৃতির সাথে এবং আমাদের শারীরিক অবকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এ কারণেই প্রতিদিন এবং প্রতিবছর রোগ-ব্যাধি ও জীবনের ঝুঁকির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। অথচ আমরা যারা নিজেদেরকে আধুনিক সভ্যতার স্রষ্টা বলে গণ্য করি, তারা এ থেকে উত্তরণ বা উপশমের পথ বের করতে পারছি না।'[১৭]

কাজেই জীবনটাকে মানুষের সন্তুষ্টির মাপকাঠি দ্বারা পরিমাপ করা ঠিক হবে না। মানুষ সভ্যতার নামে যে পথে অগ্রসর হয়েছে যদি তা থেকে একটিবারও থমকে দাঁড়ায় তাহলে তার চোখে এমনসব বাস্তবতা ধরা পড়বে যা জীবনের গতি বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তাই বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

'We shall have to consider why men have hitherto used their intelligence to make a world that only a few could enjoy and that to most involved a life much more miserable than that of wild animals?'[১৮]

মানুষের এ অবস্থা ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছে? কি হলো যে মানুষ এতোটা আত্মভোলা ভোগবাদের সাগরে ডুব দিল? কিভাবে তারা আত্মমর্যাদা বিস্মৃত হয়ে যন্ত্রকে নিজের কাঁধে চেপে বসার সুযোগ দিল আর সেই যন্ত্রের বেসামাল গতিবেগের সামনে নিজেকে অসহায় অনিয়ন্ত্রিত করে সঁপে দিল? যদি সিদ্ধান্ত হয় আগামীকালই মানুষের জীবন থেকে সভ্যতার এ সমস্ত মোহনীয় আবেশ অপসারণ করা হবে এবং তাকে শুধু জীবনটাকে হাতে নিয়ে পথ চলতে হবে- সে কি তা পারবে? কিন্তু এটাই এখন দরকার। জীবনের সবটুকুই যদি সম্পদের পাহাড়ে চাপা দিলাম তাহলে মানবতা, ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, মমতা, দয়া, ক্ষমা, আত্মত্যাগ, বদান্যতা, উদারতা, দানশীলতা, পরার্থপরতা, পরোপকার, সদাচার, বিনয়, সৌজন্য, শিষ্টাচার, সততা, সততা, সহযোগিতা, সমবেদনা, সান্ত্বনা, সহমর্মিতা ইত্যাদি হাজারো সদগুণের জায়গাটা কোথায়?

Alexis Carrel বলেন :

'যদি সত্য কথাটা বলতে চাই তাহলে এই কৃত্রিম মানুষ যা আধুনিক সভ্যতার হাতে নির্মিত হয়েছে, তা আসলে পুরোপুরি সেসব সুরম্য রাজপ্রাসাদের সাথেই তুলনীয় যা আর্ট পেপারের ওপর অংকন করা হয়েছে। আর তার চেয়েও বেশি কৃত্রিম মানুষ হলো সে, যে মার্কস ও লেনিনের উদ্ভ্রান্ত ও কাবিয়াল কাল্পনিক তত্ত্বকথার ওপর ভিত্তি করে দুনিয়ায় ভবিষ্যৎ সমাজ গড়ে তুলতে চায়।'

মহাসমারোহের এই যে জৌলুসময় বিশ্ব- পদার্থবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং অজস্র বস্তুবাদী বিজ্ঞানীর চিন্তার ফসল হিসাবে নির্মাণ করা হয়েছে তা ঝলমলে বটে, কিন্তু তিমিরাশ্রয়ী এবং সারসত্যশূন্য। বাহ্যিক সৌন্দর্যপূর্ণ হয়েও মানুষের জীবনের জন্য তা খুবই সংকীর্ণ, শ্বাসরুদ্ধকর এবং শ্রান্তিকর হয়ে উঠেছে। নিজের জীবন উদ্ধারে এখন সময় এসেছে ছিড়েফুটে হলেও বস্তুজগৎ থেকে নিজেকে মুক্ত করার। সবকিছুকে তার বাইরে দাঁড়িয়ে অভ্যন্তরকে বিচার করার পরিবর্তে জীবনের ব্যাপারগুলোকে সত্যের দৃষ্টি থেকে বিচার করার অভ্যাস চাই। এর জন্য কোনো সুশৃঙ্খল কর্মপরিকল্পনার অপেক্ষায় থাকার দরকার নেই; বরং যত কষ্টের বিনিময়েই হোক না কেন বস্তুজগৎ থেকে বের হতেই হবে। একটা কথা সবারই জানলে মন্দ হয় না যে, পূর্ণাত্মায় পরিণত মনুষ্যজীবনের জন্য জীবনোপকরণের প্রাচুর্য থাকা আবশ্যক নয়- এটা মহাপুরুষগণের জীবন থেকে সহজেই প্রমাণযোগ্য। মানুষ দিনে ২৪ ঘণ্টা নয় যদি একটা ঘণ্টাও ভাবে, আমি কোথেকে এলাম, এখানেই বা কেন আর শেষ পরিণতি কী?- তাহলে তখনও কি বস্তু জাগতিক জীবন নিয়েই সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে? কেন তবে সে ভাবনা মানুষকে আন্দোলিত করে না? নাকি আধুনিক সভ্যতার স্রষ্টাদের কারসাজিই হলো ভোগের সুখে মানুষকে বুঁদ করে রাখা যাতে জীবন নিয়ে ভাবনার অবকাশটুকুও না মেলে।

Dhaka University Institutional Repository

আর এভাবেই চরিতার্থ হবে তাদের কায়েমী স্বার্থ। ঠিক এ বিপদের সংকেতই বেজে উঠেছিল ১৯৮৯ সালের ভ্যানকুভার ঘোষণায়। সেদিনের বিবৃতিতে বলা হয় : 'মানুষ কি সক্ষম হবে একবিংশ শতাব্দীতে তার জীবন অব্যাহত রাখতে?'[১৯]

বলা বাহুল্য, এহেন ঘোষণার অর্থ হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দিকটা, তা থেকে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে অগ্রসর হলে একপর্যায়ে সংঘবদ্ধভাবে আত্মহণনের পথ বেছে নেওয়া ছাড়া গতি থাকবে না। তাই এ ঘোষণায় রাষ্ট্রসমূহের পণ্ডিতবর্গের কাছে জোরালো আহ্বান জানানো হয় যে, ঘটনা বেশিদূর গড়ানোর আগেই যেন এ বিষয়ে ভেবে দেখা হয়। ভোগসর্বস্ব বস্তুজীবন মনুষ্য প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটানোর আগেই যেন মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনকে তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

লক্ষ্যাভিমুখী পরিণত জীবন

মনুষ্যজীবন কি এক প্রস্তর খণ্ডসম যা কালের ক্ষয়িষ্ণু ধারায় ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে একসময় পর্বতশীর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অধঃগতির নিয়মে উপত্যকায় আছড়ে পড়ে। অতঃপর দু'একবার গড়িয়ে চলার পর সমতলে এসে নিশ্চল হয়ে যায়। আর এতেই সবকিছু শেষ। ইংরেজী একটি অব্যয় পদ (is) এর ওপর হাত রাখা যাক। এটি যদি পূর্বাপর কোনো শব্দের সাথে যুক্ত না থাকে তাহলে কি এর কোন অর্থ আছে? (is) অব্যয়টি নিজেও কি জানে এখানে কেন সে? কোন্ উদ্দেশ্য ও বিধেয় এর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য তার উপস্থিতি? এভাবে অনেক জিনিস রয়েছে যেগুলো পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে একাকী কোনো অর্থ দেয় না। একটি অবান্তর ও নিষ্ফল জিনিসে পরিণত হয়। মনুষ্যজীবনও একটি নিষ্ফল জন্মের নাম হয়ে যদি তাকে আগে ও পরের সাথে সংযুক্ত না করে বিচ্ছিন্নরূপে দেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ Man is Mortal বাক্যের মাঝে অবস্থান গ্রহণের ফলে এখন (is) যেমন অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তদ্রূপ মনুষ্যজীবনও অর্থপূর্ণ হবে যদি পার্থিব জীবনকে এর পূর্বাপর জীবনের সাথে সংযুক্ত করে দেখা হয় (অর্থাৎ পৃথিবীপূর্ব জীবন– পার্থিব জীবন– পারলৌকিক জীবন)। এখানে জীবনের ধারা চলমান। মৃত্যুতে শেষ নয়। ড. বাহোনার-[২০] এর ভাষায় : পার্থিব জীবনটার সাথে অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে মাতৃগর্ভের জীবনের। একটা সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার অবস্থান। তাকে সেখান থেকে প্রস্থান করতেই হবে। এ সময়কালে তার ফুরসত শুধু নিজেকে এমন উপযোগী করে তোলার যেন পরবর্তী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ জগতে যখন সে পদার্পণ করবে সেখানকার সমুদয় সামর্থ্য ও শক্তি তার মধ্যে অর্জিত হয়ে থাকে। ঠিক একই কথা পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের বেলায়ও প্রযোজ্য। যে পারলৌকিক জীবনের সংবাদ ঐশীপুরুষগণ প্রদান করেছেন তার বিস্তৃতি ও প্রসারতা পার্থিব জগতের তুলনায় এতই সাদৃশ্যহীন, যতটা না মাতৃগর্ভের সাথে এ জগতের তুলনা করা যায়। এখন যদি পারলৌকিক জীবনের কথা শুনে কেউ ভ্রূ-কুঁচকায় তাহলে এর অর্থ হলো মাতৃগর্ভের সন্তান যেন পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হওয়ার কথা শুনে ভ্রূ-কুঁচকালো। কিন্তু তার ভ্রূ-কুঁচকানোতে পৃথিবীতে আসা আটকে

Dhaka University Institutional Repository

থাকেনি। পৃথিবীর একজন মানুষকে যখন বলা হয় : এটা তোমার থাকার জায়গা নয়, তোমাকে প্রস্থান করতেই হবে, তোমার গন্তব্য সেখানেই- তখন যদি সে ভ্রূ-কুঁচকায় এতে কিন্তু তার প্রস্থান রহিত হবে না। 'বলুন, নিশ্চয় মৃত্যু যা থেকে তোমরা পলায়ন করো অনিবার্যই তা তোমাদেরকে সাক্ষাৎ করবে। অতঃপর তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নিকট এবং তোমাদের দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।'[২১] কোরআনের অন্যত্র এসেছে : 'পরকালের বিপরীতে পার্থিব জীবনোপকরণ তুচ্ছ বৈ কিছু নয়।'[২২]

পবিত্র কোরআনে জীবনের আলোচনা তিন পর্বে উল্লিখিত হয়েছে। জীবনের সাথে কোনো বিশেষণ যুক্ত না করে এক প্রকারের জীবনের কথা রয়েছে। আর জীবনের সাথে 'পার্থিব' বিশেষণ যুক্ত করে 'হায়াতুদ্দুনিয়া' তথা 'পার্থিব জীবন' বলে আরেক প্রকারের জীবনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম প্রকারের জীবন সম্পর্কে কোরআনে মোট চারটি আয়াত এসেছে।[২৩] আর পার্থিব জীবন সম্পর্কে মোট আয়াত সংখ্যা ৬৯। তন্মধ্যে একটি আয়াতে পার্থিব জীবনের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে এভাবে :

> 'পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির ন্যায় যা আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি এবং যা দিয়ে ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়, যা হতে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করে থাকে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারীরা মনে করে তা তাদের অধীন, তখন দিনে অথবা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে ও আমি তা এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন ইতোপূর্বে তার অস্তিত্বই ছিল না। এভাবে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করি।'[২৪]

আর পরিশেষে আরেক ধরনের জীবনের বর্ণনা এসেছে সূরা আনকাবুত এর ৬৪ নং আয়াতে। বলা হচ্ছে : 'নিশ্চয় পরকালই জীবন'। এ আয়াতের তাফসীতে আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হুসাইন তাবাতাবাঈ বলেন : 'পার্থিব জীবনের সাথে পারলৌকিক জগতের তুলনা করলে পৃথিবীর জীবনোপকরণ থেকে নিয়ে এখানকার সবকিছুই মনে হবে মরীচিকাময়। এখানকার সহায়-সম্পত্তি নিজের হয়েও নিজের না, এখানে এক বিষয়ে মনোনিবেশ করলে অন্যদিকে খেয়াল থাকে না। মনে হয় চিরকালই আছি কিন্তু মুহূর্তেই সবকিছু বিলীন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত জীবন। কারণ, সেখানে চিরন্তনতার মধ্যে কোনো বিলোপ নেই, সেখানকার সুখানুভূতির মধ্যে কোনো দুঃখ-বেদনার সংশ্রব নেই, সত্যিকার জীবন যার পেছনে কোনো মৃত্যু নেই।'[২৫] এভাবে জীবন পরিণত ও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ জীবন তখন অর্থ খুঁজে পায়, লক্ষ্যপানে ছুটে চলে। এ ধরনের জীবনের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা : এখানে জীবনের মূল্য জানা থাকে, কখনই শূন্যতাবোধ এসে জীবনকে গ্লানিতে ভরে তুলতে পারে না। বিশ্বজগতে নিজের স্থান স্বচ্ছভাবে অবগত থাকে বলে জীবনের উদ্দীপনায় প্রতিশ্রুতিশীলতার কোনো কমতি থাকে না। নিজ সত্তার প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল, অপরের প্রতিও তদ্রূপ। কেননা, সবাই তো একই পথের যাত্রী। এ জীবন সার্বক্ষণিক ঐশ্বরিক

Dhaka University Institutional Repository

কৃপার কাছে কৃতজ্ঞ। আত্মবন্দনার কোনো উপাদানই নিজের মধ্যে খুঁজে পায় না। ফলে বিনয়ী হয়। এখানে জীবনের লক্ষ্যের সাথে উপকরণের একটি যৌক্তিক সামঞ্জস্য রক্ষা করে। অর্থাৎ যেকোনো উপকরণকেই গ্রহণ করে না। যা লক্ষ্য পথে সহায়ক হবে শুধু সেগুলোই আঁকড়ে ধরে। পার্থিব অনেক কিছুই যে তারা বর্জন করে সেটা অযৌক্তিকভাবে নয়; বরং এই যুক্তির ভিত্তিতে। এ জীবন যেহেতু দেখে সময় সীমিত কিন্তু পথ অধিক, এ কারণে প্রচণ্ড কর্মিৎকর্মা হয়। এখানে স্বাধীনতার বড়ই কার্যকারিতা। তাই যত শীঘ্র সম্ভব আত্মনিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নিতে হয় প্রবৃত্তির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এখানে জীবনই মূল কথা। বাদবাকি সব জীবনের ছায়া। বস্তুজগতকে তারা জীবনের ছায়া হিসাবেই দেখে, জীবন মনে করে ভুল করে না।

পরিণত জীবনেরও বেশ কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে। তবে সেগুলোকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রকৃতির মধ্যকার পরিণত জীবন আর অতিপ্রাকৃতিক পরিণত জীবন। প্রথম প্রকারের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের সমকালীন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, সমাজবিদ, দার্শনিক উইল ড্যুরান্ট-এর দৃষ্টিভঙ্গী উল্লেখ করা যায়। মানুষের আকাশে উড্ডয়নের প্রাচীন স্বপ্নটি তিন সহস্রাধিক কাল ধরে কীভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে লালিত হয়ে অবশেষে বাস্তবরূপ লাভ করে তার ইতিহাস তুলে ধরে তিনি মন্তব্য করেন :

> 'জীবন হলো সেই জিনিস যা তিন হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করে, কিন্তু মাথা নোয়ায় না। ব্যক্তি পরাস্ত হয় কিন্তু জীবন জয়ী হয়। ব্যক্তির মৃত্যু হয়, কিন্তু জীবন ক্লান্ত হয় না, নিরাশ হয় না, তার পথে এগিয়ে চলে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়, আসক্তিতে ফেটে পড়ে, পরিকল্পনা তৈরি করে, নিরলস প্রয়াস চালায়, ঊর্ধ্বে আরোহণ করে এবং গন্তব্যে পৌঁছে যায়। তখন আবার কোনো বাসনা নিয়ে লিপ্ত হয় নতুনভাবে।'[২৬]

এ বক্তব্য হিন্দু ধর্মের জন্মান্তরবাদের নতুন ব্যাখ্যা কিনা বলা কঠিন। তবে জন্মান্তরবাদ একই আত্মার পুনরাবির্ভাবের ধারণা দেয়; আর এখানে প্রজন্ম ধারায় নতুন আত্মার পূর্ণতর হয়ে ওঠার কথা বলা হয়েছে। এতো গেল প্রাকৃতিক সীমানার মধ্যে পরিণত জীবনের সন্ধান। কিন্তু যে জীবন প্রকৃতিকে পেরিয়ে অতি প্রকৃতিতে সঞ্চরণশীল তার হদীস কোথায় মিলবে? মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী হয়তো সে উত্তরই দেওয়ার চেষ্টা করেছেন নিচের এ কবিতায় :

> 'ভূ-গর্ভের গভীর প্রদেশে
> খনি এবং পাথরের রাজ্যে কতকাল বিরাজ করেছি,
> তারপর হেসেছি আমি ফুলের বিচিত্র রঙে;
> কালের দুরন্ত-উদ্দাম প্রবাহের সাথে
> অন্তরীক্ষে, মৃত্তিকায় এবং সমুদ্রে বিচরণ করে
> নবতর জীবনে
> গভীর জলে আমি সন্তরণ করেছি.

Dhaka University Institutional Repository

অসীম আকাশে আমি ডানা মেলেছি,
কঠিন মৃত্তিকায় আমি হামা টেনেছি, ছুটেছি;
আমার মর্মের সর্ব রহস্য কেন্দ্রীভূত হয়ে
দেখা দিল মানুষ রূপে।
তারপর, আমার গন্তব্য-
মেঘমালার ঊর্ধ্বে, তারকারাজির সীমা পেরিয়ে,
যেখানে নেই পরিবর্তন, নেই মৃত্যু-
ফেরেশতার রূপে-তারপর আরও অসীমে
রাত্রি-দিবার সীমা পেরিয়ে
দৃশ্য-অদৃশ্যের সীমা পেরিয়ে
যেখানে যা আছে, অনন্ত কাল ধরে আছে
-একক-সম্পূর্ণ?'[২৭]...

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা ও তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *মানুষের ধর্ম*, বুক ক্লাব, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩; পৃ : ১৩;

২. **Will Durant** : *The pleasure of Philosophy;* Published by Washington Square Press, a division of Simon & Schuster Inc. 1927, Translated into Persian by Abbas Zaryab, Tehran 1994.

৩. **Bashiri, Dr. Mahmud.** Ex Iramnian Visiting Professor to DU; ইরান কালচার সেন্টার থেকে প্রকাশিত দ্বিমাসিক নিউজ লেটারে প্রকাশিত 'ইরানের নওরোয উৎসব' শিরোনামে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪. **Sri Arvindo** : *The life Divine;* Publisher: Sri Arvindo Binding: Paperback, Co-author/s: Sri Aurobindo

৫. **Allamah Tabatabaee** : *Human Being from beginning to end,* 2nd Edition, Allama Tabatabaee Publication, Tehran, 1991.

৬. **Iqbal, Dr. Mohammad** : 'Reconstruction of Religious Thought in Islam.;

৭. আল কোরআন, ৭ ঃ ৫৪;

৮. আল কোরআন, ৫৪ ঃ ৫০;

৯. আল কোরআন, ২২ঃ ৫;

১০. আল কোরআন, ৩২ ঃ ৭-৮;

১১. আল কোরআন, ১৭ঃ ৮৫;

১২. হাকিমী, প্রফেসর মোহাম্মাদ রেযা : *আল্লামা মোহাম্মদ তাকী জা'ফারীর-র চিন্তা ও দর্শন*, রিসার্চ সেন্টার ফর ইসলামিক থট এণ্ড কালচার, তেহরান, ১৯৯৮, পৃ: ২২৮-২৩০

১৩. "কারো কারো মতে, মানুষের উৎপত্তি বানর থেকে- এটা বিবর্তন তত্ত্বের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। ডারউইন কখনো একথা বলেননি। তাঁর অভিমত ছিল, মানুষ ও বানর উভয়েই প্রাগৈতিহাসিক জীবন থেকে বিবর্তিত হয়েছে। বানর কোনোভাবেই আমাদের পূর্বপুরুষ নয়।" *(দ্র : দৈনিক আমার দেশ, ৭ মে ২০১০ সংখ্যা, পৃ ১০, ক ৬)*

১৪. **Iqbal, Dr. Mohammad** : *'Reconstruction of Islamic Thought'*

১৫. **William James** : *'The Varities of Religious Experiences'* (New York)

১৬. **Professor Mach** from France

১৭. **Alexis Carrel** (1873 – 1944 was a French surgeon, biologist and eugenicist, who was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1912.): *L'Homme, cet inconnu (Man, The Unknown)*: ফরাসি অনুবাদের পৃ. ২৭৫;

১৮. **Bertrand Russell** : *Human society in ethics and politics*, P. 158;

১৯ The Vancouver Statement, 1989;

২০. **Dr. Shahid Bahonar**, *Former Iranian Chief Minister & Scholar*;

২১. আল-কুরআন, ৬৩ ঃ ৮;

২২. আল-কোরআন, ৯ ঃ ৩৮;

২৩. আল কোরআন, ২ ঃ ৯৬ ও ১৭৯; ২০ ঃ ৯৭; ১৭ ঃ ৭৫;

২৪. আল-কোরআন, ১০ ঃ ২৪;

২৫. তাবাতাবাঈ, আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন, *তাফসীর আল-মীযান*, ১৬ ঃ. ২৩৭;

২৬. **Will Durant** : *'The Pleasure of Philosophy,'* 469 (Persian Translation);

২৭. অনুবাদ : কামালউদ্দীন খান, এম.এস.সি. ('ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন' বই থেকে উদ্ধৃত)।

Dhaka University Institutional Repository

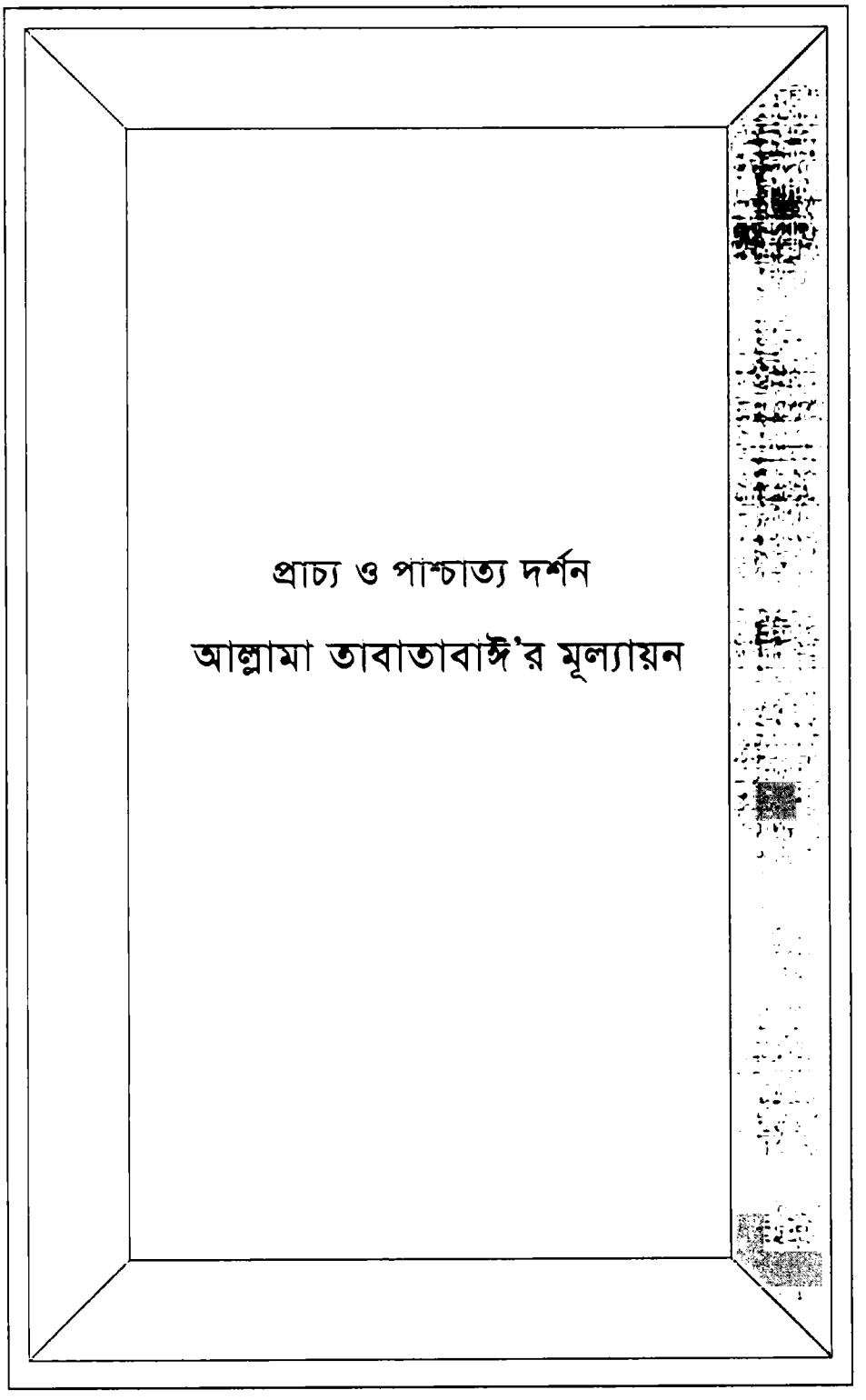

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন

আল্লামা তাবাতাবাঈ'র মূল্যায়ন

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন ঃ আল্লামা তাবাতাবাঈ'র মূল্যায়ন

মানবের সকল পবিত্র বিষয়ের মধ্যে 'জ্ঞান' হল একমাত্র ও অদ্বিতীয় জিনিস যা বংশ, গোত্র, মত ও পথ নির্বিশেষে সকলে পবিত্র বলে গণ্য করে থাকে। আর অকুণ্ঠে এর মহিমা, পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে থাকে। এমনকি মূর্খ লোকটিও জ্ঞানকে তুচ্ছ গণ্য করে না।

জ্ঞানের এ সর্বজনপ্রিয়তা ও মর্যাদা কেবল এ কারণে নয় যে, এটা জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট হাতিয়ার এবং জীবন সংগ্রামে মানুষকে শক্তি যোগায়, সক্ষমতা বয়ে আনে এবং প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। যদি কথা এটাই হত, তাহলে মানুষের উচিত ছিল অন্যান্য জীবনোপকরণকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, জ্ঞানকেও সে দৃষ্টিতে দেখা।

মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস সে অশেষ কষ্ট-ক্লেশ, বঞ্চনা আর দুঃখ দ্বারা কন্টকাকীর্ণ, যা জ্ঞান সাধনাকারী পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীরা এ পথে বরণ করেছেন এবং বস্তুগত জীবনকে নিজেদের জন্য তিক্ত করে ফেলেছেন। আর যদি জ্ঞানের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ শুধু এ কারণে হয়ে থাকে যে, তা জীবনের বস্তুগত চাহিদা মেটাবার হাতিয়ার, তাহলে জ্ঞানের পথে এতসব ত্যাগ-তিতিক্ষা ও জীবনের সুখ-শান্তি বর্জন করার কী অর্থ থাকে?

আসলে মানবাত্মার সাথে জ্ঞানের সম্পর্কের বন্ধন এসব তুচ্ছ ও হীন বন্ধনের অনেক উর্ধ্বে, যেগুলো প্রাথমিকভাবে কল্পনা করা হয়ে থাকে। জ্ঞান যত বেশি নিশ্চিত এবং সংশয়, সন্দেহ ও অজ্ঞতা বিদূরণকারী হবে, যত বেশি সর্বব্যাপী এবং বৃহৎ থেকে বৃহত্তর পর্দা উন্মোচনকারী হবে, তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও কাঙ্খিত হবে।

মানুষের অজানার বিশাল জগতের মধ্যে কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো জানার আগ্রহ তুলনামূলকভাবে বেশি। গুরত্বের দিক দিয়েও সেগুলোর স্থান তালিকার শীর্ষে। এ বিষয়গুলো হল জগৎ সম্পর্কিত সামগ্রিক বিষয়ের রহস্য উদ্ঘাটন। মানুষ সফল হোক আর না হোক, এ বিশ্বের উৎপত্তি ও পরিণতি, সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আদি-অনাদি, একত্ব-বহুত্ব, সসীম-অসীম, কার্যকারণ, স্রষ্টা-সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান ও চিন্তা-অনুধ্যান না করে পারে না। আর মানুষের এ সহজাত স্পৃহাই 'দর্শন'-কে মানুষের জন্য উপহার হিসাবে এনেছে। দর্শন, জগতের আপাদমস্তক মানুষের চিন্তার অঙ্গনে হাজির করে, মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাকে নিজ ডানার ওপর বসিয়ে মানুষের আকাঙ্খার শেষ সীমানায় ভ্রমণ করায়, এমন সব জগতে যেখানে পরিভ্রমণ করা মানুষের পরম লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

দর্শনের ইতিহাস মানুষের চিন্তার ইতিহাসের সাথে একসূত্রে গাঁথা। তাই দর্শনের উৎপত্তি কোন্ যুগে হয়েছে কিম্বা কোন্ ভূখণ্ডে এর সূচনা সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। মানব তার সহজাত আকাঙ্খার বশে যখনই এবং যেখানেই চিন্তার অবকাশ পেয়েছে, সেখানেই জগতের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে মতামত প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করেনি। ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত যেমন মিশর, ইরান, ভারত, চীন ও গ্রীসে বিখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক মতাদর্শসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁদের সেসব রচনার অনেকাংশই এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। এসব প্রাচীন রচনার মধ্যে গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের সংখ্যাই বেশি, যা আজ থেকে প্রায় দু'হাজার ছয়শ' বছর আগে সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক মহা বিপ্লবের মতই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

চিন্তা ও দর্শনের এই যে বিপ্লব এশিয়া মাইনরের গা ঘেঁষে এবং গ্রীসে সূচিত হয়েছিল, তা আলেকজান্দ্রিয়ায় অব্যাহত থাকে। অতঃপর যখন আলেকজান্দ্রিয়া ও এথেন্সের জ্ঞানকেন্দ্র ধ্বংস ও পুরোপুরি বিলীন হয়ে যাবার উপক্রম হয় এবং পূর্ব রোমান সম্রাট জাস্টিনিন ৫২৯ খ্রিস্টাব্দে এথেন্স ও আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্যাপিঠসমূহে তালা লাগিয়ে দেবার নির্দেশ জারী করেন, আর ভীত-সন্ত্রস্ত পণ্ডিতবর্গ আত্মগোপন করেন ও জ্ঞানকেন্দ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায়, তখন পৃথিবীর আরেক প্রান্তে ইসলামের আলোকোজ্জ্বল সূর্যের উদয়ের মাধ্যমে আরেকটি বিপ্লবের সূচনা ঘটে এবং নবতর ও গভীরতর আরেকটি সভ্যতার দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ইসলামের মহান নবী (সা.) ও মহান ওয়ালীগণের পক্ষ থেকে যেভাবে জ্ঞানের মর্যাদা এবং জ্ঞান অন্বেষণকারীদের প্রশংসা ও উৎসাহ যোগানো হয়েছে, তাতে জ্ঞান অন্বেষার অদম্য আকাঙ্খা পুনর্বার অন্তরে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। এভাবে বিশাল ইসলামী সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ওপর মৌলিক গ্রন্থাবলী রচিত ও লিপিবদ্ধ হয়। বিভিন্ন ভাষার, বিশেষ করে গ্রীক ভাষার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী অনূদিত হয়, বৃহত্তর বিদ্যাপিঠ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয়, অসংখ্য গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে, ইসলামী ভূখণ্ডের বৃহৎ নগরীসমূহ জ্ঞানচর্চার লালনভূমিতে পরিণত হয় এবং সেসব স্থান আজকের ইউরোপসহ দেশী-বিদেশী অগণিত জ্ঞান-পিপাসুর পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে। এভাবে কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পর ইউরোপে নতুন এক বিপ্লবের উন্মেষ ঘটে। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে সাধিত হয় এক অভূতপূর্ব বিবর্তন।

তবে যে বিষয়টি ইতিহাসের দৃষ্টিতে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য, তা হল প্রাচীন গ্রীসও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎসসমূহ প্রাচ্য থেকেই পেয়েছিল। গ্রীসের বিখ্যাত পণ্ডিতগণ অনেকবার প্রাচ্য ভ্রমণ করেন এবং প্রাচ্যের পণ্ডিতদের সাধনালব্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে অবলীলায় গ্রহণ করেন। অতঃপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে উক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ছড়িয়ে দেন। সে যুগে গ্রীকরা প্রাচ্যের জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে কতটুকু গ্রহণ করেছিলেন কিম্বা বিগত এক হাজার বছর পূর্বে আজকের ইউরোপ ইসলামী সভ্যতার বিজ্ঞান ও দর্শনের ভাণ্ডার থেকে কতটুকু উপকৃত হয়েছিল কিম্বা মুসলমানরা গ্রীক দর্শনকে কীভাবে গ্রহণ করে এবং তাতে কতটা সংযোজন করে ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে স্বতন্ত্র গবেষণার দাবি রাখে। তবে এখানে শুধু বিগত সাড়ে তিনশ' বছরের ইসলামী দর্শনের একটি ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা হল, যে কথা অনেকেরই জানা নেই। অন্য কথায়, যে বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দুঃখজনকভাবে খুব কমই আলোচনা করা হয়। বিশ্বে, বিশেষ করে

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষিত মুসলিম যুবশ্রেণী, যারা ইউরোপীয় সূত্রসমূহ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্যাবলী গ্রহণ করে থাকে, তাদের কাছে এ ইতিহাস যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়নি।

ইসলামী এ দর্শন যা 'হিকমাতে মুতাআলিয়া'[১] (Transcendent Theosophy) নামে প্রসিদ্ধ, তা সাদরুল মুতাআল্লেহীন শিরাজী ওরফে মোল্লা সাদরার মাধ্যমে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীকালে পারস্যের দর্শন চর্চা এ দর্শন শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই অগ্রসর হয়, যার মূল ভিত রচিত হয়েছিল হিকমাতে মুতাআলিয়া দর্শনে।

মোল্লা সাদরার গবেষণা বেশিরভাগই 'উচ্চতর দর্শন' ও 'ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা' সম্পর্কিত। এ ক্ষেত্রে মোল্লা সাদরা প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকবৃন্দ, বিশেষ করে প্ল্যাটো ও অ্যারিস্টটল থেকে যা কিছু পাওয়া গিয়েছিল এবং ফারাবী, ইবনে সিনা, শেখ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ মুসলিম হাকিমগণ এ মর্মে যে ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা উপস্থাপন কিম্বা সংযোজন করেছিলেন, আর অধ্যাত্মবাদী মরমী সাধকবৃন্দ স্ব স্ব সাধনায় যে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন সে সমস্তই উত্তমভাবে আয়ত্ত করেছিলেন এবং নতুনভাবে একটি দার্শনিক ভিত্তির গোড়াপত্তন করেছিলেন এবং একে অকাট্য ও অখণ্ডনীয় মৌলনীতিমালা (principles) দ্বারা সুরক্ষিত করেছিলেন। তিনি যুক্তি-প্রমাণের দিক থেকে দর্শনের সমস্যাবলীকে গাণিতিক সূত্রের ওপর দাঁড় করান, যেগুলোর একটি অপরটি থেকে নিঃসৃত ও প্রমাণিত হয়। এভাবে তিনি দর্শনকে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার পন্থাগুলোকে বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে বের করে আনেন।

অ্যারিস্টটল, যিনি স্বীয় দর্শনের গুরু অর্থাৎ প্ল্যাটোর মতবাদসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তাঁর সময় থেকেই দর্শনের দু'টি ধারা সর্বদা একে অপরের সামন্তরালে এগিয়ে চলে, যে ধারা দু'টির প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন স্বয়ং প্ল্যাটো এবং অ্যারিস্টটল। প্রতিটি যুগেই এ দু'টি দার্শনিক ধারার অনুসারী বিদ্যমান ছিল। মুসলমানদের মধ্যেও এ দু'টি ধারা 'ইশরাকী' (Illumination) এবং 'মাশশায়ী' (Peripatetion) নামে প্রসিদ্ধ। বিগত দু'হাজার বছর ধরে গ্রীস ও আলেকজান্দ্রিয়ায় যেমনভাবে, তেমনি মুসলমানদের মাঝে এবং মধ্যযুগে ইউরোপে এ ধারাদ্বয়ের মধ্যে দার্শনিক বিতর্ক অব্যাহত থাকে। কিন্তু সাদরুল মুতাআল্লেহীন যে নতুনভাবে একটি বুনিয়াদ গড়ে তোলেন, তাতে দু'হাজার বছর ধরে চলমান এ বিবাদের অবসান ঘটে। তিনি বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন যার ফলে তাঁর পরবর্তীকালে ইশরাকী ও মাশশায়ী ধারাদ্বয়ের একে অপরের মোকাবেলার কোন অর্থ হয় না। আর যাঁরা তাঁর উত্তরকালে আবির্ভূত হয়েছেন ও তাঁর এ দর্শনের সাথে পরিচয় লাভ করেছেন, তাঁরা এ ধারাদ্বয়ের মধ্যে চলে আসা দু'হাজার বছরের বিতর্ক মীমাংসিত অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন।

সাদরুল মুতাআল্লেহীনের দর্শন কোন কোন দিক থেকে যেমন অভিনব, অপরদিকে তেমনি তা ছিল মহান গবেষকদের সুদীর্ঘ আটশ' বছরের চেষ্টা-সাধনার ফসল, যাঁরা প্রত্যেকেই দর্শনের ঝাণ্ডাকে এগিয়ে নিতে অবদান রেখেছেন। কিন্তু এত কিছুর পরও প্রাচ্যবিদদের সাক্ষ্য অনুযায়ী দুঃখজনকভাবে আজ চারশ' বছরের অধিক কাল পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত ইউরোপে এ দর্শন সম্পর্কে এমনকি প্রাথমিক পরিচিতিটুকুও তুলে

Dhaka University Institutional Repository

ধরা হয়নি। Prof. Edward Brawn একজন বিখ্যাত ইংরেজ প্রাচ্যবিদ (মৃ: ১৯২৫)। তিনি আজীবন পারস্য ও পারসিক ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি History of Iranian Literature গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে বলেন : 'ইরানে মোল্লা সাদরার দর্শনের প্রসিদ্ধি ও প্রচলন থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর দর্শনের কেবল দু'টি সাধারণ ও অসম্পূর্ণ সংকলন ইউরোপীয় ভাষায় দেখেছি।' Cont Gobino মোল্লা সাদরার দর্শন-চিন্তা সম্পর্কে কয়েক পৃষ্ঠা লিখেছেন। কিন্তু দৃশ্যত তাঁর সবটুকুই তিনি সংগ্রহ করেছেন ইরানে তাঁর শিক্ষকবৃন্দের মৌখিক ভাষ্য থেকে। উপরন্তু খোদ শিক্ষকবৃন্দেরই মোল্লা সাদরার দর্শন চিন্তা সম্পর্কে সম্যক অবগতি ছিল না বলে প্রতীয়মান হয়। Gobino মোল্লা সাদরা সম্বন্ধে যে বিবরণ লিখেছেন তার উপসংহারে বলেন : 'মোল্লা সাদরার দর্শন পন্থা হুবহু ইবনে সিনা থেকে গৃহীত।' অথচ রওযাতুল জান্নাত গ্রন্থের লেখক মোল্লা সাদরা সম্পর্কে লিখেছেন : 'মোল্লা সাদরা ছিলেন ইশরাকী দর্শনের চরম সমালোচনাকারী। আর মাশশায়ী দর্শনের দোষত্রুটির দরজা উন্মোচনকারী।' মোল্লা সাদরা সম্পর্কে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সত্যিকার ও সঠিক মূল্যায়ন করেছেন আল্লামা ইকবাল।

Prof. Edward Brawn তাঁর বইয়ে আরও লিখেছেন, 'মোল্লা সাদরার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল 'আসফারে আরবাআ'[২] ও 'শাওয়াহিদুর রুবুবিয়্যাহ'[৩]।' অতঃপর পাদটীকায় বলেছেন, Cont Gobino 'আসফার' কথাটির ভুল অর্থ করেছেন। আসফার কথাটি 'সিফ্‌র' এর বহুবচন, যার অর্থ হল 'কিতাব'। কিন্তু তিনি এর অর্থ করেছেন 'সফর' এর বহুবচন ধরে। এ কারণে তিনি তাঁর 'মধ্য এশিয়ার মাযহাবসমূহ ও দর্শন' শীর্ষক বইয়ের ৮১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 'মোল্লা সাদরা সফর বা ভ্রমণ বিষয়ক আরও কিছু বই লিখেছেন!'

আল্লামা ইকবাল লাহোরী ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সময় 'ইসলামে হিকমাত (দর্শন)-এর বিকাশ' শিরোনামে যে বইটি প্রকাশ করেন তা হস্তগত করা যায়নি। কিন্তু এটুকু নিশ্চিত যে, সেটা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত।

এ দু'জন (Prof. Edward Brawn ও Cont Gobino) ছিলেন প্রাচ্যবিদদের অন্যতম। মরহুম শেখ মুহাম্মাদ খান কাযভীনী, যিনি প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ইউরোপের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন ও গবেষণা চালিয়েছেন এবং সেখানকার অনেক প্রাচ্যবিদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, তিনি একবার বার্লিন থেকে প্রকাশিত 'ইরানশাহর' নামক পত্রিকায় Edward Brawn এর মৃত্যু উপলক্ষে একটি নিবন্ধে তাঁকে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রাচ্যবিদদের মধ্যে ইরানের সাহিত্য, দর্শন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-ভাণ্ডারের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আন্তরিক ও কঠোর অধ্যবসায়ী বলে উল্লেখ করেছেন। ঐ একই নিবন্ধে তিনি Cont Gobino সম্পর্কে লেখেন যে, তিনি ফ্রান্সের অত্যন্ত খ্যাতিমান একজন লেখক এবং দর্শন, সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে বহু গ্রন্থের প্রণেতা। Philosophy of History সম্পর্কে তিনি Gobinism খ্যাত বিশেষ এক মতবাদের প্রবর্তন করেন, যার অনেক অনুসারী জার্মানীতে রয়েছে।

মোটকথা, এত কিছুর পরও এ দু'জন প্রাচ্যবিদের একজন সাদরুল মুতাআল্লেহীনকে মাশশায়ী পন্থী, আর অন্যজন তাঁর বক্তব্য খণ্ডন করে 'রওযাতুল জান্নাত' গ্রন্থের (যা ছিল মূলত একটি ইতিহাস ও

Dhaka University Institutional Repository

জীবনীমূলক গ্রন্থ) লেখাকে সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। একজনের মতে, আসফার হল সফরনামা। আরেকজনের মতে, আসফার হল সিফ্‌র বা কিতাব এর বহুবচন। অথচ এ দু'জনই যদি আসফার গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়তেন তাহলে দেখতে পেতেন যে, আসফার 'সিফ্‌র' এর বহুবচনও নয়, কোন সফরনামাও নয়। আর Edward Brawn যে শিক্ষকের মৌখিক ভাষ্যের কথা বলেছেন যিনি ইরানে Gobino কে মোল্লা সাদরার দর্শন শিক্ষা দিতেন, তিনি ছিলেন একজন ইয়াহুদী, মোল্লা লালেযার নামী। এ শিক্ষকেরই সহযোগিতায় তিনি ডেকার্টের ভাষ্য (Verses of Descartes)কে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন।

Gobino তাঁর ঐ গ্রন্থে সাদরুল মুতাআল্লেহীনের জীবনচরিত বর্ণনা প্রসঙ্গে দর্শনের মহামতি মীর মুহাম্মাদ বাকের দামাদকে একজন Dialectician (দ্বান্দ্বিক মতবাদের অনুসারী) বলে উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি মীর দামাদের ক্লাসে মোল্লা সাদরার অংশগ্রহণ শেখ বাহায়ীর ইশারায় হয়েছিল বলে উল্লেখ করার পর মীর দামাদের নিকট মোল্লা সাদরার শিক্ষাগ্রহণের ফলাফলকে এভাবে তুলে ধরেছেন : 'এবং কয়েক বছর পরে তাঁর ভাষার যে বিশুদ্ধতা ও আলঙ্কারিক দক্ষতার কথা আমরা জানি, তা অর্জন করেন।'

এখানে প্রাচ্যবিদদের নীতির সমালোচনা করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, এটা অমূলক যে, বিজাতীয় লোকদের নিকট থেকে আমরা আশা করব যাতে তাঁরা এসে আমাদের দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, ইতিহাস কিম্বা সাহিত্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেবেন ও বিশ্বের সামনে এ সবের পরিচয় তুলে ধরবেন! আরবি ভাষায় একটি প্রবাদ রয়েছে যে, 'তোমার আঙ্গুলের নখের মত আর কিছুই তোমার পিঠ চুলকে দেয় না।' যদি কোন জনগোষ্ঠী বিশ্ববাসীর সামনে নিজেকে ও নিজের ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম, কিম্বা দর্শনকে পরিচিত করাতে চায়, তাহলে তার একমাত্র উপায় হল এ কাজ তাদের নিজেদের দ্বারাই সম্পন্ন হওয়া। বিজাতীয়রা যদি সম্পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথেও তা করতে যায় তবুও শেষ পর্যন্ত তাদের নিজেদেরই সম্পূর্ণ পরিচিতি না থাকার কারণে বৃহত্তর ভ্রান্তির কবলে পড়তে পারেন। যেখানে ইতিহাস ও কৃষ্টি-কালচারের মত সামান্য ব্যাপারেই এরূপ অনেক ঘটনা ঘটেছে, সেখানে দর্শনের ক্ষেত্রে তো বলার অপেক্ষাই রাখে না, যা অনুধাবন করা বিশেষজ্ঞদের কাজ। শুধু ভাষা জানা কিম্বা কতেক বই-কিতাব সংগ্রহ করাই যথেষ্ট নয়। খোদ ইরান যেখানে ইবনে সিনা ও সাদরুল মুতাআল্লেহীনের মত মহান দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের প্রতিপালন ভূমি ছিল, সেখানেই প্রতি যুগে যেসব জ্ঞানপ্রেমী তাঁদের সেসব উচ্চতর চিন্তা-দর্শনের সাথে পূর্ণাঙ্গভাবে পরিচিত হতে চাইতেন তাঁরা জীবনের অনেকগুলো বছর এ কাজে ব্যয় করতেন। অবশেষে এরূপ হাজারও জ্ঞানতাপসের মধ্য থেকে হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র এ কাজে সফল হতে পারতেন। কাজেই আমরা কীভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে, দশ শতাব্দীকাল পূর্বে ইসলামী দর্শন, উদাহরণস্বরূপ ইবনে সিনার চিন্তাসমূহ যেভাবে তাঁর শিষ্যদের বোধগম্য হত, তাঁদের অনুবাদকর্মের ঠিক সেরূপ প্রতিফলিত হয়েছে।

যে সময়ে সাদরুল মুতাআল্লেহীন ইরানে দর্শনকে ঢেলে সাজানো এবং নতুন এক দার্শনিক কাঠামো গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত ছিলেন (খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক), ঠিক সে সময়ে ইউরোপেও বিজ্ঞান ও দর্শনে এক মহা আলোড়ন সূচিত হয়, যার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল আরও কয়েশ' বছর আগে থেকে। সাদরুল

Dhaka University Institutional Repository

মুতাআল্লেহীন নির্জন গৃহকোণে বসে চিন্তা ও গণিত চর্চায় নিমগ্ন হন এবং কিছুকালের জন্য কোম নগরীকে এ কাজের জন্য বেছে নেন যাতে স্বীয় সুবিস্তৃত চিন্তার ফসলকে উত্তমরূপে কাগজে লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হন। আর ইউরোপে ডেকার্ট সে সময় নতুন এক মুক্তির ডাক দেন এবং প্রাচীনদের অনুসরণের শিকল খুলে ফেলেন। রচিত হয় নতুন এক পথ চলা। তিনিও হল্যান্ডের এক প্রান্তে কয়েক বছরের জন্য নির্জনবাস বেছে নেন এবং দৈনন্দিন জীবনের ঝামেলামুক্ত হয়ে স্বীয় অবসরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পেছনে উৎসর্গ করেন। ডেকার্টের পর থেকে ইউরোপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের পথে অবিশ্বাস্য গতিতে অগ্রসর হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় গবেষণার পদ্ধতি বদলে যায় এবং নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে যেমন অগণিত বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটে, তদ্রূপ একাদিক্রমে বড় বড় দার্শনিকও আবির্ভূত হন এবং দর্শন একটি নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে।

মধ্যযুগীয় দর্শনে যেসব বিষয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া হত, ইউরোপের আধুনিক দর্শনে সেগুলোর প্রতি কমই দৃষ্টি দেওয়া হয়। তদপরিবর্তে এক শ্রেণীর নতুন বিষয় যেগুলোর প্রতি প্রাচীন দার্শনিকরা কম মনোযোগ দিতেন সেগুলো বেশি বেশি উল্লিখিত হয়।

ইউরোপে ডেকার্টের সময় থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। প্রত্যেক দলই একটি বিশেষ মতবাদের অনুসারী হয়েছেন, কেউ বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শনে মগ্ন হয়েছেন, কেউ আবার ব্যবহারিক বিজ্ঞানের (অভিজ্ঞতাবাদী) চোখ দিয়ে দর্শনকে দেখেছেন। আবার কেউ কেউ উচ্চতর দর্শন তথা ঈশ্বরতত্ত্বকে আলোচনা ও গবেষণার যোগ্য বলে মনে করেছেন এবং এ সম্পর্কে স্ব স্ব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করেছেন। আর কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, মূলগতভাবে মানুষ এসব বিষয় উপলব্ধি করতে অপারগ এবং এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে পক্ষে-বিপক্ষে যা কিছুই বলা হয়েছে তার সবই বিনা প্রমাণে বলা হয়েছে। তবু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একদল ঈশ্বরবাদী হয়েছেন, আরেকদল হয়েছেন বস্তুবাদী। মোটকথা, যে শাস্ত্র প্রাচীনকাল থেকে real philosophy তথা উচ্চতর বিদ্যা বলে পরিচিত হয়ে এসেছে (অর্থাৎ জগতের সামগ্রিক ব্যবস্থা এবং বৈশ্বিক শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করার জন্য গবেষণা করা হয় যে বিদ্যায়) তা ইউরোপে মধ্যযুগে যেমন, আধুনিক যুগেও তেমনি উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি লাভ করেনি এবং দর্শনকে বিক্ষিপ্ততা ও বিভক্তি থেকে রক্ষা করতে পারে– এমন কোন শক্তিশালী ও সন্তোষজনক ব্যবস্থা দাঁড় করাতে সক্ষম হয়নি। এর ফলে ইউরোপে দর্শনের মধ্যে সাংঘর্ষিক মতবাদ সৃষ্টির কারণ হয়েছে। আর ইউরোপের গবেষণার যেটুকু উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় এবং যা দার্শনিক বিষয়াবলি নামে প্রসিদ্ধ, তা আসলে দর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং গণিত, পদার্থবিজ্ঞান কিম্বা মনোবিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট।

আর ন্যায়ত বলতে হয় যে, মুসলিম দার্শনিকরা এ বিদ্যার গবেষণায় যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাতে তাঁরা সফলভাবেই অগ্রসর হয়েছেন এবং আধা সমাপ্ত গ্রীক দর্শনকে যথেষ্ট এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন। যদিও মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশের সময় গ্রীক দর্শনে সর্বসাকুল্যে দু'শটির বেশি 'বিষয়' ছিল না। কিন্তু মুসলিম দর্শনে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাতশ'রও বেশি। তাছাড়া যুক্তি-প্রমাণের মৌলনীতি (principles) ও প্রেক্ষিত-পদ্ধতিসমূহ, এমনকি গ্রীসের প্রাথমিক বিষয়াবলির ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণরূপে বদলে

Dhaka University Institutional Repository

গেছে এবং দার্শনিক বিষয়াবলি প্রায় গাণিতিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে। এ বৈশিষ্ট্য মোল্লা সাদরার দর্শনে পুরোপুরিভাবে দৃশ্যমান। এদিক থেকে তিনি মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রবর্তী।

এ মন্তব্যগুলো যে নিছক দাবি নয়; বরং এটাই বাস্তব, তা স্পষ্ট করার জন্য আমাদের আরও গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে।

যে সময়কালে ইউরোপীয় দর্শনের ঢেউ ইরানে এসে পৌঁছায় সে সময় স্বল্প-বিস্তর দার্শনিক রচনা ইউরোপীয় ভাষাসমূহ থেকে ফারসিতে অনূদিত হয়। সম্ভবত ফারসি ভাষায় আধুনিক দর্শনের সর্বপ্রথম প্রকাশনা হল Verses of Descartes এর অনুবাদ, যা এক শতাধিক কাল পূর্বে কতিপয় সহযোগীর সহযোগিতা নিয়ে Cont Gobino এর মাধ্যমে অনূদিত হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই তোপধ্বনি তোলে, ততই পশ্চিমা দার্শনিক ও পণ্ডিতদের নাম মুখে মুখে ফিরতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে আরও বেশি গ্রন্থ ফারসি ভাষায় প্রকাশিত হয়।[৪] আর যদিও কিছুকাল ধরে বিদগ্ধ অনেকের মনোযোগ এ দিকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে যে, আধুনিক দর্শনের মতবাদ ও বিশ্বাসসমূহ প্রাচীন দর্শনে অনুপ্রবেশ করুক এবং আধুনিক মতবাদসমূহের ও মুসলিম দার্শনিকবৃন্দের মতামতসমূহের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা হোক, কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, অদ্যাবধি এ আকাঙ্খা বাস্তবে রূপ লাভ করেনি। আর সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত যত দার্শনিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো হয় নেহায়েত প্রাচীনদের পন্থায় রচিত (কখনও কখনও প্রকৃতি ও মহাকাশ সম্পর্কিত বিষয়াদির ওপরেও ছিল, আধুনিক মতবাদসমূহ যার ঘোর বিরোধী। উপরন্তু সেগুলোতে যেসব নীতি ও পন্থা অনুসরণ করা হয়েছিল, তাও ছিল প্রাচীন ধারার), নচেৎ শুধু মতবাদসমূহের অনুবাদ ও বিবরণসর্বস্ব ছিল। অপরদিকে আধুনিক দার্শনিকদের গবেষণায় 'প্রবেশ' ও 'বের হওয়া'র পদ্ধতি প্রাচীন দার্শনিকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া ছাড়াও যেসব বিষয় প্রাচীন দর্শনে বিশেষ করে সাদরুল মুতাআল্লেহীনের দর্শনে প্রধান ভূমিকা রাখত, সেগুলো আধুনিক দর্শনে তাচ্ছিল্যের শিকার হওয়া কিম্বা আদৌ সেগুলোর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করার ফলে এ দু'ধারার বই-পুস্তক পাঠ করে জ্ঞানপিপাসুদের যে লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। তাই আমরা যখন মুসলিম দর্শনের হাজার বছরের গবেষণা অধ্যয়ন করব তখন পাশ্চাত্যের আধুনিক দর্শনের দিকপালদের গবেষণাকর্মের প্রতিও পুরোপুরি লক্ষ্য রাখব। কিন্তু আমাদের উচিত হবে দর্শনের সীমানাকে সুরক্ষিত রাখা, যেন বিভিন্ন বিজ্ঞানের সাথে এর সংমিশ্রণ না ঘটে। দর্শনের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক আছে বটে। কিন্তু প্রকৃত দর্শনে প্রকৃতিবিজ্ঞান ও মহাকাশীয় বিজ্ঞানের সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক। প্রয়োজন হলে আধুনিক বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক অর্জন থেকে উপকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ'র The Principles of Philosophy and the Method of Realism [৫] পাঁচ খণ্ডের একটি দর্শন গ্রন্থ। আল্লামা তাবাতাবাঈ জীবনের সুদীর্ঘ সময় ধরে দর্শনের ওপর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন এবং ফারাবী, ইবনে সিনা, শেখ সোহরাওয়ার্দী, সাদরুল মুতাআল্লেহীন প্রমুখের ন্যায় বড় বড় মুসলিম দার্শনিকের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতসমূহ বিচক্ষণতার সাথে আত্মস্থ করেন। পাশাপাশি ইউরোপের গবেষক দার্শনিকদের চিন্তাধারাকেও ভালভাবে রপ্ত করেন। ইরানের জ্ঞান-নগরী কোমে তিনি ফেকাহ, তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যাপনা করা

Dhaka University Institutional Repository

ছাড়াও দর্শন (হিকমত) শাস্ত্রের একক ও অনন্য শিক্ষাগুরুতে পরিণত হন। দর্শনের ওপর এরূপ পাণ্ডিত্য অর্জনের পর তিনি প্রত্যয় গ্রহণ করেন যে, বৃহত্তর কলেবরে একটি দর্শনের গ্রন্থ রচনা করবেন যা একদিকে মুসলিম দর্শনের হাজার বছরের মূল্যবান গবেষণাকে লিপিবদ্ধ করবেন, অপরদিকে এতে আধুনিক দর্শনের সকল মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ থাকবে; আর প্রাথমিক দৃষ্টিতে প্রাচীন ও আধুনিক দর্শনের মতবাদসমূহের মধ্যে যে বিস্তর পার্থক্য চোখে পড়ে এবং এ দু'টিকে আলাদা ও সম্পর্কহীন শাস্ত্র হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়, তা যেন বিদূরিত হয়ে যায়। পরিশেষে দর্শনের এমন এক রূপ প্রকাশ পায় যা এ যুগের চিন্তাগত চাহিদার সাথে উত্তমভাবে খাপ খায়। বিশেষ করে ঈশ্বরবাদী দর্শনের মূল্য (যার অগ্রপথিকরা ছিলেন মুসলিম পণ্ডিতবর্গ এবং বস্তুবাদী দর্শনের প্রোপাগাণ্ডার ডামাডোলের আড়ালে যে দর্শনের যুগ শেষ হয়ে গেছে বলে প্রচারণা রয়েছে) যেন স্বমহিমায় ফুটে ওঠে।

একদিকে ইউরোপীয় দার্শনিকদের দর্শন-চিন্তা ও মতবাদগুলো ব্যাপকভাবে অনূদিত হয়ে কিম্বা হুবহু মূল রচনাবলি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রকাশিত হওয়া এবং বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত যুবকদের সেদিকে ঝুঁকে পড়া (যা প্রকৃতপক্ষে তাদের কৌতূহলী মনোবৃত্তিরই পরিচয় বহন করে), অপরদিকে আধুনিক বস্তুবাদী দর্শনের (Dialectic Materialism) সুসংগঠিত ও বেপরোয়া রাজনৈতিক ও দলীয় প্রচারণা আল্লামাকে স্বীয় প্রত্যয়ে আরও দৃঢ় করে তোলে। প্রথম পদক্ষেপে তিনি সহকর্মী ও নির্বাচিত শিষ্যবৃন্দের সমন্বয়ে একটি 'Council of Philosophy' গড়ে তোলেন। আল্লামার নেতৃত্বে এ কাউন্সিল দর্শন চর্চায় যে অভাবনীয় অবদান রাখে তা দর্শনকে ইরানে নতুন এক যুগে প্রবেশ করায়। ইতিপূর্বে দর্শন চর্চাকারীদের জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ ছিল কেবল সাধারণ বই-কিতাবে লিপিবদ্ধ বিষয়াবলীর মধ্যে। কিন্তু আল্লামা তাবাতাবাঈ'র এ সৃজনশীল উদ্যোগের সুবাদে অচিরেই দর্শন চর্চাকারীদের জ্ঞানের পরিধি সীমানা অতিক্রম করে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। এখন তাঁরা বস্তুবাদী দর্শনের তত্ত্বগুলো সম্পর্কে অনেক বেশি পরিচিত এবং সেগুলোর দোষত্রুটি সম্পর্কে সম্যক অবগত।

The Principles of Philosophy and the Method of Realism গ্রন্থে আল্লামা তাবাতাবাঈ প্রাচীন ও আধুনিক যুগের ঈশ্বরবাদী ও জড়বাদী নির্বিশেষে বহু সংখ্যক দার্শনিকের মতামত ও মতবাদ পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করেছেন। তাছাড়া বিশেষ এক কারণে তিনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রতি কিছু বেশি মনোযোগী হয়েছেন এবং এ মতবাদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। প্রাচীনকাল থেকেই 'আদি কারণ' কিম্বা সৃষ্টির উদ্দেশ্য থাকা নাকচ করা অথবা আত্মার অমরত্ব ও অজড়ত্বকে নাকচ করা সংক্রান্ত বস্তুবাদী মতবাদ ও ধ্যান-ধারণাসমূহ দর্শনের বই-পুস্তকে উত্থাপিত হয়। কিন্তু যে বিষয়টি সর্বসম্মত, তা হল প্রাচীনদের মধ্যে কখনও অধিবিদ্যাকে সামগ্রিকভাবে অস্বীকার করবে এবং অস্তিত্বের কথা বলতেই জড়বস্তু অর্থাৎ অস্তিত্ব = জড়বস্তু বলে মনে করবে এহেন কোন বস্তুবাদী মতবাদের উৎপত্তি ঘটেনি। সে সুদূর অতীত, যখন দার্শনিক আলোচনার চর্চা হত, তখন থেকেই অধিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক জগতের উর্দ্ধে এক পরাপ্রকৃতির আলোচনা ছিল। তবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এসব আলোচনা প্রথম দিকে খুবই সরল ও সাধারণ স্তরের ছিল। পরবর্তীকালে তা ক্রমান্বয়ে যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা পায় এবং অধিকতর বিস্তার লাভ

Dhaka University Institutional Repository

করে। প্রাচীন দার্শনিকদের থেকে বর্ণিত ভাষ্য অনুযায়ী দেখা যায়, সর্বপ্রথম যে দার্শনিক আলোচনাগুলো একটি দার্শনিক মতবাদের রূপ লাভ করে তা Hermes কর্তৃক গোড়াপত্তন কৃত। Balinas এর The wise on the causes বই থেকে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে দর্শন 'বস্তুসমূহের কারণ' নামে আখ্যায়িত হত। এ মতবাদের অনুসারীরা প্রাকৃতিক জগতের অতিবর্তী আরেকটি জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন।

আল্লামা তাবাতাবাঈ তাঁর মূল্যায়নে মত প্রকাশ করে বলেন : এ সময়ের পরে দর্শনে মাইলেসীয়দের যুগ শুরু হয়। এ যুগে বিভিন্ন রকমের দার্শনিক মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে। মূলত এ অধ্যায়কে দর্শনের 'দ্বিতীয় অধ্যায়' বলা যায়। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের বর্ণনামতে এবং তাদের মতামত ও বিশ্বাস সম্বলিত দর্শনের বই-পুস্তক থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় যে, এ যুগেও প্রকৃতি জগতের অতিবর্তী পরাপ্রাকৃতিক জগতের আলোচনা ছিল। তদ্রূপ, মাইলেসীয়দের সমসাময়িক কিম্বা তারও পরবর্তী যুগের গ্রীকগণ সক্রেটিসের সময় পর্যন্ত এ চর্চা অব্যাহত রাখেন। এ দিকে মাইলেসীয়দের (খ্রিস্টপূর্ব ৬ শতক) সমসাময়িক ভারতীয় ও চীনা দার্শনিকদের থেকে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, সেটাও প্রায় এরূপই। মোটকথা, প্রাচীনদের মধ্যে এমন কোন নির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদ পাওয়া যাবে না যা পরাপ্রকৃতিকে সামগ্রিকভাবে নাকচ করে থাকবে। আর বেশিরভাগ যুগে বস্তুবাদী তথা প্রকৃতিবাদী হিসাবে যে কতিপয় ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তারা আসলে সংশয়গ্রস্ত ও দিশেহারা লোকজন। তারা দাবি করত যে, ঈশ্বরবাদীদের যুক্তি-প্রমাণ তাদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

এ মূল্যায়নের আলোকে আল্লামা তাবাতাবাঈ সিদ্ধান্তে আসেন যে, 'সুতরাং বস্তুবাদী দর্শনের জন্য কোন ইতিহাস দাঁড় করানো যায় না। কেবল অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে ইউরোপে কতিপয় কারণে একটি শোরগোল পরিদৃষ্ট হয় যা নিজেকে একটি দার্শনিক রূপ দেয় এবং অপরাপর দার্শনিক মতবাদের বিপরীতে অতিকায় দেহাবয়ব নিয়ে জাহির হয়, আর শক্তির প্রকাশ ঘটায়। কিন্তু অচিরেই বিংশ শতাব্দীতে তা পরাভূত হয় এবং স্বীয় জৌলুস ও দাপট হারিয়ে ফেলে। কাজেই, বস্তুবাদী দর্শনের প্রকৃত ইতিহাস শুরু হয় অষ্টাদশ শতক থেকে।'

কিন্তু বস্তুবাদীরা প্রাণান্তকর চেষ্টা চালায় তাদের মতবাদকে একটি ঐতিহ্যপূর্ণ ও ইতিহাসসমৃদ্ধ মতবাদ বলে প্রতিষ্ঠা করতে এবং বিশ্বের বড় বড় দার্শনিকদের তাদের মতোই বস্তুবাদী ঘরানার বলে প্রতিপন্ন করতে। সর্বোপরি বস্তুগত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝাণ্ডাবাহী হিসাবে বস্তুবাদী দার্শনিকদেরই অগ্রসারিতে প্রতিষ্ঠিত করতে। এমনকি অ্যারিস্টটল সম্পর্কেও তারা বলতে দ্বিধা করেনি যে, তিনি বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। আর কোন কোন লেখনিতে তারা ইবনে সিনাকেও বস্তুবাদী বলে আখ্যায়িত করে থাকে। বস্তুবাদীরা তাদের রচনাবলীতে মাইলেসীয় থেলিস (Thales) থেকে সক্রেটিস পর্যন্ত সকল দার্শনিককে বস্তুবাদী আখ্যা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত জার্মান বস্তুবাদী Buckner ডারউইনের মতবাদের ওপরে যে ব্যাখ্যা লিখেছেন, তার পঞ্চম প্রবন্ধে অ্যানাক্সিম্যান্ডার (Anaximander), অ্যানাক্সিমিনিস (Anaximienes), জেনোফ্যানিস (Xanophanes), হিরাক্লিটাস (Heraclitus), অ্যাম্পিডক্লিস (Empedocles) ও ডেমোক্রিটাস (Democritus) প্রমুখ দার্শনিককে বস্তুবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতা হল এ সকল অবিস্মরণীয় দার্শনিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে কাউকে পরাপ্রকৃতি অস্বীকারকারী অর্থে যে বস্তুবাদ, সেরূপ বস্তুবাদী বলা যায় না। যদিও এ সকল ব্যক্তিকে দর্শনের ইতিহাসের পরিভাষায় প্রকৃতিবাদী তথা বস্তুবাদী বলে আখ্যায়িত করা হয় (পিথাগোরীয় গণিতবাদীদর বিপরীতে, যাঁরা জগতের মৌলিক দ্রব্য 'সংখ্যা' থেকে বলে উদ্ভূত বলে বিশ্বাস করতেন এবং সোফিস্টদের বিপরীতে, যাঁরা external world তথা বহির্জগৎ এর অস্তিত্ব অস্বীকার করতেন) এ হিসাবে যে, তাঁরা প্রকৃতির মৌলিক দ্রব্য একটি 'পদার্থ' বলে মনে করতেন। যেমন থেলিস মনে করতেন, জগতের সমুদয় বস্তু পানি থেকে সৃষ্ট। আবার অ্যানাক্সিম্যান্ডারের মতে, পৃথিবীর সমুদয় বস্তু একটি মাত্র মৌলিক দ্রব্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ মৌলিক দ্রব্য থেলিসের 'পানি' নয়। এ মৌলিক দ্রব্য আমাদের জ্ঞাত অন্য কোন দ্রব্যও নয়। তাঁর মতে, এ মৌলিক দ্রব্য শাশ্বত ও সীমাহীন নয় এবং এ মৌলিক দ্রব্য পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যের মূলে বিদ্যমান। আর অ্যানাক্সিমিনিসের মতে, মৌলিক দ্রব্য হচ্ছে বায়ু। হিরাক্লিটাসের মতে, আগুন; আর ডেমোক্রিটাসের মতে পরমাণু। এ দার্শনিকবৃন্দ সকলেই প্রকৃতির ঘটনাপ্রবাহকে প্রাকৃতিক কারণাবলি দ্বারা ব্যাখ্যা করতেন ঠিকই, কিন্তু এমন কোন প্রমাণ নেই যে, তাঁরা পরাপ্রকৃতিকে অস্বীকার করতেন। প্লাটো ও অ্যারিস্টটল স্ব স্ব লেখনীতে এ সকল ব্যক্তির নাম অনেকবার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোথাও তাঁদেরকে পরাপ্রকৃতি অস্বীকারকারী বলে আখ্যায়িত করেননি।

আল্লামা তাবাতাবাঈ লক্ষ্য করেন যে, বস্তুবাদীরা যে বিষয়কে তাদের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করেন (যা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে), তার সাথে পরাপ্রকৃতিকে নাকচ করার কোন সম্পর্ক নেই। আর যদি কথা এমনই হয় যে, যাঁরাই মৌলিক দ্রব্যের কথা বলবেন এবং প্রকৃতির ঘটনাবলিকে প্রাকৃতিক কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করবেন, তাঁদেরকেই বস্তুবাদী বলা হবে, তাহলে সকল ঈশ্বরবাদীকেও বস্তুবাদী বলতে হয় যাঁদের মধ্যে সক্রেটিস, প্লাটো, অ্যারিস্টটল, ফারাবী, ইবনে সিনা, সাদরুল মুতাআল্লেহীন ও ডেকার্টও রয়েছেন। শুধু তা-ই না, নবী-রাসূল ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরাও বাদ থাকেন না। অথচ দার্শনিকদের বই-পুস্তকে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের পরাপ্রকৃতি সম্পর্কিত মতামত উল্লিখিত হয়েছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরবাদী ছিলেন। যেমন ঈশ্বরের 'জ্ঞান' বিষয়ক থেলিস ও অ্যানাক্সিমিনিসের বিশ্বাস।

আশ্চর্যের বিষয় হল স্বয়ং Buckner এমন কিছু বর্ণনা করেন যা তাঁর নিজ দাবির পরিপন্থী। যেমন হিরাক্লিটাস সম্পর্কে তিনি বলেন : 'হিরাক্লিটাসের বিশ্বাস অনুযায়ী মানব আত্মা হল আগুনের শিখা, যা ঐশ্বরিক নিত্যতা থেকে উৎসারিত হয়েছে।'

আর অ্যাম্পিডক্লিস যাঁকে ডারউইনী মতবাদের জনক বলেন এবং স্বীকার করেন যে, তিনিই সর্বপ্রথম evolution and natural selection তত্ত্বকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা দেন, তাঁর সম্পর্কে বলেন : 'তিনি আত্মার বিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাস করতেন এবং একে একটি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যজনিত বলে মনে করতেন, যে লক্ষ্যে আত্মা আরাম, আসক্তি ও প্রেমের প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে।'

তবে এখানে যে কথাটি বলা যেতে পারে সেটা হল এই যে, সক্রেটিসের আগের দার্শনিকরা অধিকাংশই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে এক ধরনের অংশীবাদী (Polytheist or Dualist) বিশ্বাস

Dhaka University Institutional Repository

আশ্চর্যের বিষয় হল স্বয়ং Buckner এমন কিছু বর্ণনা করেন যা তাঁর নিজ দাবির পরিপন্থী। যেমন হিরাক্লিটাস সম্পর্কে তিনি বলেন : 'হিরাক্লিটাসের বিশ্বাস অনুযায়ী মানব আত্মা হল আগুনের শিখা, যা ঐশ্বরিক নিত্যতা থেকে উৎসারিত হয়েছে।'

আর অ্যাম্পিডক্লিস যাঁকে ডারউইনী মতবাদের জনক বলেন এবং স্বীকার করেন যে, তিনিই সর্বপ্রথম evolution and natural selection তত্ত্বকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা দেন, তাঁর সম্পর্কে বলেন : 'তিনি আত্মার বিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাস করতেন এবং একে একটি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যজনিত বলে মনে করতেন, যে লক্ষ্যে আত্মা আরাম, আসক্তি ও প্রেমের প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে।'

তবে এখানে যে কথাটি বলা যেতে পারে সেটা হল এই যে, সক্রেটিসের আগের দার্শনিকরা অধিকাংশই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে এক ধরনের অংশীবাদী (Polytheist or Dualist) বিশ্বাস পোষণ করতেন। Buckner হিরাক্লিটাস সম্পর্কে এক বর্ণনায় বলেন: 'জগতের মূল হল আগুন, যা কখনও শিখাময় হয়, আবার কখনও নিভু নিভু হয়ে আসে। আর এটা হল একটি খেলা মাত্র, যা Jupiter সর্বদা নিজে নিজে খেলে থাকেন।' অবশ্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এ সকল দার্শনিকের কথা রহস্য ও সংকেতমুক্ত নয়। তাই এটাই তাঁর আসল কথা বলে ধরা যায় না। সাদরুল মুতাআল্লেহীন তাঁর আসফার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে থেলিস, অ্যানাক্সিমিনিস, অ্যানাক্সগোরাস, অ্যাম্পিডক্লিস, প্লাটো, ডেমোক্রিটাস, অ্যাপিকিওর প্রমুখের নিকট থেকে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এবং দাবি করেছেন যে, পূর্ববর্তী দার্শনিকদের এসব কথা রহস্যপূর্ণ ও সংকেতময় ছিল, কিন্তু বর্ণনাকারীরা তাঁদের সে আসল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারেননি। অতঃপর সাদরুল মুতাআল্লেহীন তাঁদের সেসব বক্তব্যকে স্বীয় দাবি অনুযায়ী 'substantial motion'[৬] ও 'জগতের সৃষ্টি' অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রাচীন ও তদপরবর্তী যুগের কোন কোন দার্শনিককে বস্তুবাদী প্রতিপন্ন করার সপক্ষে যেসব যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয় সেগুলো এমন সব বিষয়, যা এ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। যেমন মৌলিক দ্রব্য ও মূল উপাদানে বিশ্বাস করা, প্রকৃতির ঘটনাবলিকে প্রাকৃতিক কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা, জাগতিক নিয়মকে একটি অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবী নিয়ম মনে করা, অনস্তিত্ব থেকে কোন কিছু অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না বলে মনে করা, কিম্বা প্রকৃতির বিষয়াবলি অনুসন্ধানে প্রায়োগিক যুক্তিবিদ্যার প্রতি গুরত্বারোপ করা ইত্যাদি।

বস্তুবাদীরা ঐশ্বরিক বিষয়াদিতে জ্ঞানের গভীরতার অভাবহেতু নিজেদের কাছে মনে করে থাকে যে, উপরিউক্ত বিষয়গুলো প্রকৃতি জগতের অতিবর্তী এক পরাপ্রকৃতির প্রতি বিশ্বাসের পরিপন্থী। আর এ কারণে যে কেউ এ বিষয়গুলোর কোন একটির প্রবক্তা ও বিশ্বাসী হয়েছেন, তাঁকেই বস্তুবাদী বলে চিহ্নিত করেছে। এমনকি সে নিজে এর বিপরীতে তার অবস্থান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করার পরও বস্তুবাদীরা ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। অবশ্য বস্তুবাদী নন এমন কিছু সংখ্যক দর্শনের ইতিহাস লেখক এবং encyclopedia -র লেখকও একই ভুল করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

Buckner এর বর্ণনা অনুযায়ী কেবল আঠারো শতকেই কতিপয় দার্শনিক আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন। Baron d'Holbach ১৭৭০ সালে The system of Nature গ্রন্থটি লেখেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ধর্মকে অস্বীকার করেন। আঠারো দশকে একদল লেখক একটি encyclopedia রচনায় লিপ্ত হন। এদের মধ্যে বড় বড় কয়েকজন, যেমন Holbach, Didero এবং Dalamber প্রমুখ বস্তুবাদী ছিলেন। তবে Dalamber এর অবস্থানটা ছিল অধিকতর দ্বিধাদ্বন্দ্বপূর্ণ ও দিশেহারার মত। Buckner বলেন : "Dalamber একাধিকবার স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, পরাপ্রকৃতি সম্পর্কিত বিষয়াবলিতে 'জানি না' উত্তরটাই উৎকৃষ্ট উপায়।" Didero থেকেও বর্ণিত আছে যে, শেষাবধি তিনিও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যেই ছিলেন।

উনিশ শতকে বস্তুবাদী দর্শন আরও বেশি সমর্থক খুঁজে পায়। আর এর শেষার্ধে (১৮৫৯ খ্রি.) ডারউইনী বিবর্তনবাদ প্রচারিত হয়। বস্তুবাদীরা এ বিবর্তনবাদকে তাদের বস্তুবাদী দর্শনের প্রসারের জন্য মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে লুফে নেয়। ডারউইন বস্তুবাদী ছিলেন না। তিনি কেবল Biological দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁর মত উপস্থাপন করেন। কিন্তু তাঁর সময়ের বস্তুবাদীরা এ মতবাদকে তাদের বস্তুবাদী দর্শনের স্বার্থে ব্যবহার করেন। ড. শিবলী শুমাইল একজন বিখ্যাত Materialist, তিনিই প্রথম ডারউইনের মতবাদকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। অতঃপর এর সাথে আরও কিছু অধ্যায় যোগ করে 'ফালসাফাতুল নুশু ওয়াল ইর্তিকা' (উৎপত্তি ও বিবর্তনের দর্শন) শিরোনামে মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন। বইয়ের ভূমিকায় তিনি স্বীকার করেন যে, ডারউইন কেবল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে (দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়) বিবর্তন মতবাদকে (যা শুধু প্রাণীকুলের জন্য স্বতন্ত্র) ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর একদল বস্তুবাদী দার্শনিক, যেমন Haksil, Buckner প্রমুখ একে জড়বাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের সনদ হিসাবে গ্রহণ করেন। এ বইয়ে তিনি বলেন : 'এর চেয়েও আশ্চর্যজনক হল যে, ডারউইন এ মতবাদের মূল প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, কিন্তু এর থেকে যত ফলাফল গ্রহণ করা উচিত ছিল তিনি তা করেননি।'[৮]

Buckner এর ব্যাখ্যার প্রথম নিবন্ধে স্বয়ং ডারউইনের এ উক্তিটি উল্লেখ করা হয়েছে : 'এ পর্যন্ত যা কিছু আমার কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে সে অনুযায়ী পৃথিবী পৃষ্ঠে যত প্রাণীই সৃষ্টি হয়েছে তা সবই একটি মূল থেকে উৎসারিত। আর পৃথিবী পৃষ্ঠে সর্বপ্রথম যে জীবিত প্রাণী সৃষ্টি হয়, স্রষ্টা তার মধ্যে প্রাণ (আত্মা) ফুঁকে দেন।'

উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ডারউইনবাদের ধারা দর্শনের বাজার সরগরম করে তুলেছিল। এছাড়াও আরেকটি বিশেষ ধারা উৎপত্তি লাভ করে বস্তুবাদকে নতুন এক রূপ দান করে। ফলে নতুন এক মতবাদের জন্ম হয় যা Dialectic Materialism বা 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' নামে পরিচিত। আল্লামা তাবাতাবাঈ'র The Principles of Philosophy and the Method of Realism এর ব্যাখ্যাতা ড. মূর্তাজা মুতাহ্হারী বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

"এ মতবাদের দু'জন বিখ্যাত প্রবক্তা কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রেডরিক এ্যাঙ্গেল্‌স (১৮২০-১৮৯৫), যাঁরা অন্যসব কিছুর চাইতে বেশি বিপ্লবী চিন্তা-চেতনা ও উগ্র সামাজিক ভাবাবেগের অধিকারী ছিলেন। এ মতবাদের একটি পরিচয় হল এই যে, এটি বিশেষ Dialectical logoc অনুসরণ করে থাকে। এ মতবাদের আসল প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস অল্প কিছুদিনের জন্য বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর কাছ থেকেই দ্বান্দিক যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা নেন। হেগেল দার্শনিক চিন্তায় বস্তুবাদী ছিলেন না। কিন্তু কার্ল মার্কস বস্তুবাদী দর্শনকেই পছন্দ করলেন এবং সেটা তাঁর শিক্ষকের কাছ থেকে শেখা Dialectical logoc এর ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আর এ থেকেই Dialectic Materialism বা দ্বান্দিক বস্তুবাদ জন্ম নেয়।

এ মতবাদের আরেকটি পরিচয় হল এ পর্যন্ত বিশ্বে আবির্ভূত হওয়া অপরাপর দার্শনিক স্টিস্টেমগুলোর বিপরীতে এর জন্ম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দার্শনিক বিষয়াবলীর গবেষণা নয়; বরং মূল লক্ষ্য হল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশেষ মতাদর্শ ও চিন্তাধারাসমূহের ভিত্তিমূল ও প্রেক্ষিতসমূহ খুঁজে বের করা। এ মতবাদের ঝাণ্ডাধারীরা অন্যান্য দার্শনিক ও চিন্তাবিদের ন্যায় স্বীয় আয়ুষ্কালকে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গুঢ় রহস্যাবলি ভেদ করার লক্ষ্যে গবেষণা ও অনুসন্ধানে নিয়োগ করার পরিবর্তে রাজনৈতিক দল গঠন ও রাজনৈতিক সংগ্রাম করে কাটিয়েছেন।"[১০]

১৯৪৬ সালে ইরানে প্রকাশিত এ মতবাদের পত্রিকা Internationalist এ লেখা হয় যে, কার্ল মার্কস ২৪ বছর বয়সে যখন তাঁর পিএইচডি'র থিসিস সমাপ্ত করেন, তখন রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এবং ৩১ বছর বয়সে প্যারিস থেকে নির্বাসিত হয়ে লণ্ডনে পাড়ি জমান। তিনি অনবরত সংগ্রাম, টানাপড়েন ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হন এবং নির্বাসিত জীবন কাটান। কখনো জার্মানীতে, কখনো ব্রুকসেল-এ অবস্থান করেন। আর এসব টানাপড়েনের মধ্যে কম্যুনিষ্ট সংঘের পক্ষ থেকে ব্রুকসেল-এ কম্যুনিস্ট পার্টির সনদ প্রণয়ন করার দায়িত্ব লাভ করেন। এ সূত্রে তিনি Manifesto'র রচনা করেন। লেনিনের ভাষায় যা ছিল Historical materialism ও Dialectical materialism এর প্রকাশ এবং মার্কসীয় মতবাদের শ্রেণীগত সংগ্রাম তত্ত্ব, আর সামাজিক ও অর্থনৈতিক শিক্ষাসমূহের সনদ।

মার্কস ১৮৫১ সাল থেকে লণ্ডনে সামাজিক সংগ্রামে ব্যস্ত থাকার পাশাপাশি নিজের অবসরকে Capital পুস্তকটি রচনায় ব্যাপৃত করেন, যা ছিল political economy এর ওপরে একটি মার্কসীয় তত্ত্ব।

আর উক্ত পত্রিকার লেখা অনুযায়ী এ্যাঙ্গেলেস ১৮ বছর বয়সে স্কুল ত্যাগ করেন এবং ২১ বছর বয়সে বার্লিনে পাড়ি জমান। সেখানে তিনি সেনাবাহিনীতে নাম লেখান এবং সরকারী কর্তব্য পালনের পাশাপাশি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্সসমূহে অংশগ্রহণ করেন। তিনি উকাত শহরে হেগেলীয় মতবাদের বামপন্থীদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ২৪ বছর বয়সে প্রথমবারের মত মার্কসের সাথে তাঁর দেখা হয়। সেখান থেকেই তাদের জোটবদ্ধ সংগ্রাম শুরু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ ঘটনার পর বস্তুবাদী দর্শনের প্রসার রাজনৈতিক দলের অভিলাষ পূরণের অনুবর্তী হয়ে পড়ে। আর কম্যুনিষ্ট পার্টি যে পরিসরে বিশ্বে বিস্তার লাভ করে, Dialectic materialism নামের এ নতুন মতবাদকে সেই পরিসরে সাথে করে নিয়ে যায়। এ কারণে বিগত বছরগুলোতে যেসব দেশে কম্যুনিজমের পদচারণা রয়েছে, সেসব দেশে Dialectic materialism শিরোনামে অনেক প্রবন্ধ ও রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এসব প্রকাশনা রাজনৈতিক দলের সাথে সংযুক্ত হওয়ার কারণে একটি দলীয় মুখপত্র হিসাবে প্রচার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, কোন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রকাশনা হিসাবে নয়। দলীয় পত্রিকায় মূল লক্ষ্য থাকে রাজনৈতিক পথকে নিষ্কন্টক করা এবং সকল প্রতিবন্ধক অপসারণ করা, আর তা করতে যে কোন উপকরণ বা মাধ্যম ব্যবহার করাকে বৈধ গণ্য করে থাকে (কেননা, দলীয় মূলনীতি অনুসারে 'লক্ষ্য মাধ্যমকে বৈধত দান করে')। দলীয় মূলনীতি কখনও সত্যকে 'ঠিক যেভাবে বিদ্যমান' সেভাবেই প্রতিফলিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়; বরং এ ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, সত্যকে সেভাবেই প্রতিফলিত করতে হবে যাতে লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রচনাবলিতে যেহেতু সাধারণত মূল উদ্দেশ্য থাকে সত্য অনুসন্ধানের সহজাত প্রবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষাকে পরিতুষ্ট করা, কাজেই উপরোক্ত পন্থা পরিহার করা হয়।

নতুন শতাব্দীর বস্তুবাদীদের সামগ্রিকভাবে এ প্রতীতি জন্মেছে যে, ব্যবহারিক ও ফলিত বিজ্ঞান বস্তুবাদের অনুকূলেই এগিয়ে চলেছে। কিন্তু Dialectical materialism এর পক্ষাবলম্বীরা এমন বাড়াবাড়ির পথ বেছে নেয় যে, বস্তুবাদকে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ জাতক এবং অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবী ফল বলে মনে করে। এমনকি যে সকল বৈজ্ঞানিক এসব বিজ্ঞানের জনক ছিলেন তাঁরা কেন বস্তুবাদী ছিলেন না– এ নিয়ে তারা বিস্ময় প্রকাশ করেন।

এ মতবাদের পক্ষাবলম্বনকারীরা স্পষ্টতই দাবি করে যে, হয় ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার অনুসারী হতে হবে, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মানতে হবে এবং সকল বিজ্ঞান, শিল্প ও আবিষ্কারকে অস্বীকার করতে হবে, নয়ত এগুলোকে গ্রহণ করতে হবে– আর ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার ওপর পদাঘাত করতে হবে!

আল্লামা তাবাতাবাঈ'র এ মূল্যায়ন থেকে যে কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলো : দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সমর্থকদের দাবির পরও বিজ্ঞানের সাথে বস্তুবাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং এর সবগুলো মূলনীতিই (principles) হল এক ধরনের বিকৃতি ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত যা কিছু সংখ্যক লোক নিজস্ব রুচি থেকে গ্রহণ করেছেন। এ সকল লোক তাদের প্রপাগাণ্ডায় যেসব যুক্তি উপস্থাপন করেন, সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিটি হল, নতুন শতাব্দীতে ব্যবহারিক ও ইন্দ্রিয়নির্ভর বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে ইউরোপের বস্তুবাদী দর্শনও জম-জমাট হয়ে ওঠে। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে, সাম্প্রতিক কালে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে চিন্তা-চেতনার ওপরে যে কঠিন ধাক্কা দেওয়া হয়েছে এবং মহাজগৎ ও প্রকৃতি সম্পর্কিত হাজার বছরের প্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণাগুলোকে বাতিল করে দিয়ে চিন্তার মধ্যে যে আজব ধরনের আতঙ্ক, উৎকণ্ঠা আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছে তার প্রভাবে। যদিও এসব উত্থান-পতনগুলো ঘটেছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা অনুমাননির্ভর বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে, কিন্তু অনিবার্যভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক বিষয়াবলী এবং একইভাবে ধর্মীয় বিষয়াবলীকেও সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন করে। আর এরই ফলে ইউরোপে জন্ম নেয় ভিন্ন ভিন্ন ও

Dhaka University Institutional Repository

পরস্পর বিরোধী দার্শনিক মতবাদ। প্রতিটি মতবাদই এক একটি পথ অবলম্বন করে। যেমন একদল বস্তুবাদী হয়েছে, তদ্রূপ সোফিজমও দীর্ঘ দু'হাজার বছর ধরে নিষ্প্রভ থাকার পর পুনরায় দ্বিগুণ বেগে প্রচলন লাভ করেছে। তাই যদি আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের সময়কালে উৎপত্তি হওয়া মতবাদগুলোর ঐ বিজ্ঞানের সাথে সঠিক ও যৌক্তিক সম্পর্কের প্রমাণ বলে ধরা হয়, তাহলে সোফিজম ও ভাববাদকেও আধুনিক বিজ্ঞানের সরাসরি ফল ও তারই অবিচ্ছেদ্য গুণ বলতে হবে।

তবে ইউরোপে বিভিন্ন মতবাদ জন্ম নেওয়ার পেছনে আরেকটি কারণ রয়েছে। সেটা হল একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন বিদ্যমান না থাকা, যা বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিশীল হতে পারে। বিশেষ করে 'ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা' (হেকমতে এলাহী)-এর নামে তৎকালীন ইউরোপে বিদ্যমান একশ্রেণীর ফালতু আকীদা-বিশ্বাসই অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি বস্তুবাদীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। আমরা যদি বই-পুস্তক খুলে দেখি তাহলে লক্ষ্য করব যে, এরা কোন্ শ্রেণীর বিশ্বাসকে কঠিন আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে থাকে। এমনকি ইউরোপের একদল আধুনিক বিজ্ঞানী যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, তাঁরাও উক্ত ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার বিষয়বস্তু নিয়ে অনুযোগ করেছেন।

বিখ্যাত ঈশ্বরবাদী জ্যোতির্বিদ Flammarion তাঁর God in Nature বইতে লিখেছেন: 'সূক্ষ্মবিচারী ও সত্যদর্শী ব্যক্তি মাত্রই আজ মানবের চিন্তাশীল সমাজে দু'টি ভিন্ন ধরনের প্রবণতা অবলোকন করতে পারে, যেদুটি প্রবণতা প্রত্যেকেই একদল লোককে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করেছে এবং তাদের ওপরে জেঁকে বসেছে। একদিক থেকে রসায়ন বিদ্যার বিজ্ঞানীরা তাঁদের পরীক্ষাগারে রাসায়নিক উপাদানসমূহের ক্রিয়া-বিক্রিয়া ও আধুনিক বিজ্ঞানের জড় অংশ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এবং পদার্থের যৌগ গঠনকারী উপাদানসমূহকে উদ্ঘাটন করে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে উদ্ঘাটিত এসব যৌগে কখনই ঈশ্বরের উপস্থিতি বা অস্তিত্ব প্রত্যক্ষণ ও ইন্দ্রিয়ানুভব করা যায় না। অপরদিকে, ঈশ্বরবাদী হাকিম তথা দার্শনিকরা ধুলোর আস্তরণে ঢাকা পড়া প্রজন্মান্তরে উত্তারধিকারসূত্রে পাওয়া প্রাচীন কিতাবাদি ও পাণ্ডুলিপির স্তূপের মধ্যে বসে কৌতূহল ও আগ্রহ সহকারে সেগুলোর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা, গবেষণা, অনুবাদ, কপি সংগ্রহ এবং এক শ্রেণীর ধর্মীয় আয়াত ও ভিন্ন ভিন্ন হাদীসের বিশ্লেষণ ও বর্ণনায় নিমগ্ন থেকেছেন। আর স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী রাফাঈল ফেরেশতার কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে ঘোষণা দিয়েছেন যে, চিরন্তন জনকের ডান চোখের মণি থেকে বাম চোখের মণির মাঝে ব্যবধান ছয় হাজার ফারসাখ।'

টমাস অ্যাকুনাস-এর Summa Contra Gentiles গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর কিছু অংশে 'কয়েকজন ফেরেশতা কি সূচের অগ্রভাগে একত্রে অবস্থান করতে পারে?' শিরোনামে আলোচনা রয়েছে।[১১]

ডক্টর শিবলী শুমাইল 'মাজমুআতু ফালাসাফাতুন নুশু ওয়াল ইরতিকা' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'আল-কুরআন ওয়াল ইমরান' শিরোনামে একটি প্রবন্ধের মধ্যে লিখেছেন : 'দর্শন, মুসলমানদের মাঝে এর প্রথম আন্দোলনেই উচ্চতর মাত্রায় উৎকর্ষ লাভ করে। কিন্তু খ্রিস্টানদের মাঝে প্রথম সাক্ষাতেই ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যায় এবং তার গোটা আলোচ্য বিষয় নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে।'[১২]

Dhaka University Institutional Repository

হাকিম তথা দার্শনিকরা ধুলোর আস্তরণে ঢাকা পড়া প্রজন্মান্তরে উত্তারধিকারসূত্রে পাওয়া প্রাচীন কিতাবাদি ও পাণ্ডুলিপির স্তুপের মধ্যে বসে কৌতুহল ও আগ্রহ সহকারে সেগুলোর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা, গবেষণা, অনুবাদ, কপি সংগ্রহ এবং এক শ্রেণীর ধর্মীয় আয়াত ও ভিন্ন ভিন্ন হাদীসের বিশ্লেষণ ও বর্ণনায় নিমগ্ন থেকেছেন। আর স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী রাফাঈল ফেরেশতার কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে ঘোষণা দিয়েছেন যে, চিরন্তন জনকের ডান চোখের মণি থেকে বাম চোখের মণির মাঝে ব্যবধান ছয় হাজার ফারসাখ।'

টমাস অ্যাকুনাস-এর Summa Contra Gentiles গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর কিছু অংশে 'কয়েকজন ফেরেশতা কি সূঁচের অগ্রভাগে একত্রে অবস্থান করতে পারে?' শিরোনামে আলোচনা রয়েছে।[১১]

ডক্টর শিবলী শুমাইল 'মাজমুআতু ফালাসাফাতুন নুশু ওয়াল ইরতিকা' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'আল-কুরআন ওয়াল ইমরান' শিরোনামে একটি প্রবন্ধের মধ্যে লিখেছেন : 'দর্শন, মুসলমানদের মাঝে এর প্রথম আন্দোলনেই উচ্চতর মাত্রায় উৎকর্ষ লাভ করে। কিন্তু খ্রিস্টানদের মাঝে প্রথম সাক্ষাতেই ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যায় এবং তার গোটা আলোচ্য বিষয় নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে।'[১২]

আধুনিক যুগে ডেকার্ট ও তাঁর অনুসারীদের মত কতিপয় বড় বড় ঈশ্বরবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু এ সকল দার্শনিকও একটি শক্তিশালী ও সন্তোষজনক ঈশ্বরবাদী দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি।

নিঃসন্দেহে ঈশ্বরবাদী দর্শন যদি মুসলমানদের মাঝে যেভাবে উৎকর্ষ লাভ করেছে, ইউরোপেও সেভাবে উৎকর্ষ লাভ করত, তাহলে এতসব বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন দর্শনের উৎপত্তি ঘটত না। তদ্রূপ সংশয়বাদীদের (sceptic) জন্য অলীক কল্পনার জাল বুনা কিম্বা বস্তুবাদীদের এত অহঙ্কারী আত্মপ্রচারেরও সুযোগ মিলত না। সর্বোপরি, না ভাববাদের জন্ম হত, আর না বস্তুবাদের।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা ও তথ্যসূত্রঃ

১ *al-hikmah al-muta'liyah*. (Transcendent Theosophy)

২. *Al-Hikma al-muta'aliya fi-l-asfar al-'aqliyya al-arba'a* [The Transcendent Philosophy of the Four Journeys of the Intellect]

৩ *al-Shawahid al-rububiyyah*, a philosophical book, written in the Illuminationist style

৪. **বাংলাদেশের** ক্ষেত্রেও **একই** কথা প্রযোজ্য

৫ Iranian: *Usul-i-falsafeh va ravesh-i-ri'alism*

৬. Theory of "substantial motion" (Arabic:*al-harakat al-jawhariyyah*), which is "based on the premise that everything in the order of nature, including celestial spheres, undergoes substantial change and transformation as a result of the self-flow (*fayd*) and penetration of being (*sarayan al-wujud*) which gives every concrete individual entity its share of being. In contrast to Aristotle and Avicenna who had accepted change only in four categories, i.e., quantity (*kamm*), quality (*kayf*), position (*wad'*) and place (*'ayn*), Sadra defines change as an all-pervasive reality running through the entire cosmos including the category of substance (*jawhar*)."

৭. **Pietro Bembo** (20 May 1470 - either 11 January[1] or 18 January,[2] 1547) was a Venetian scholar, poet, literary theorist, and cardinal.

৮. ড. **শিবলী শুমাইল**, *'ফালসাফাতুল নুশু ওয়াল ইরতিকা*, পৃ ১৬;

৯ আরবি অনুবাদ

১০ ড. মূর্তাজা মোতাহহারী, *মাজমুআয়ে আছার. (ফার্সী ভাষায় রচিত)*, সদরা প্রকাশনী, তেহরান, ২০০৩, খ: ৬, পৃ: ৪৬-৪৭;

১১. **সেন্ট টমাস অ্যাকুনাস ছিলেন মধ্যযুগীয় ইউরোপের** শ্রেষ্ঠ **দার্শনিক এবং স্কলাস্টিক দর্শনের** পুরোধা । তাঁর গ্রন্থাবলি প্রায় **চারশ' বছর যাবৎ ইউরোপের** বিজ্ঞান ও **ধর্মীয়** শিক্ষা **কেন্দ্রসমূহে** আনুষ্ঠানিক **দর্শনের** পাঠ্য ছিল ।

১২. **কেবল** Christian divinity **এর** অধ্যায় বাদে ।

১৩. **ড. মূর্তাজা মোতাহহারী** : মাজমুআয়ে আছার, সপ্তম **মুদ্রণ**, সাদরা **প্রকাশনী**, তেহরান, ২০০৩, **ভলিউম** : ৬,

Dhaka University Institutional Repository

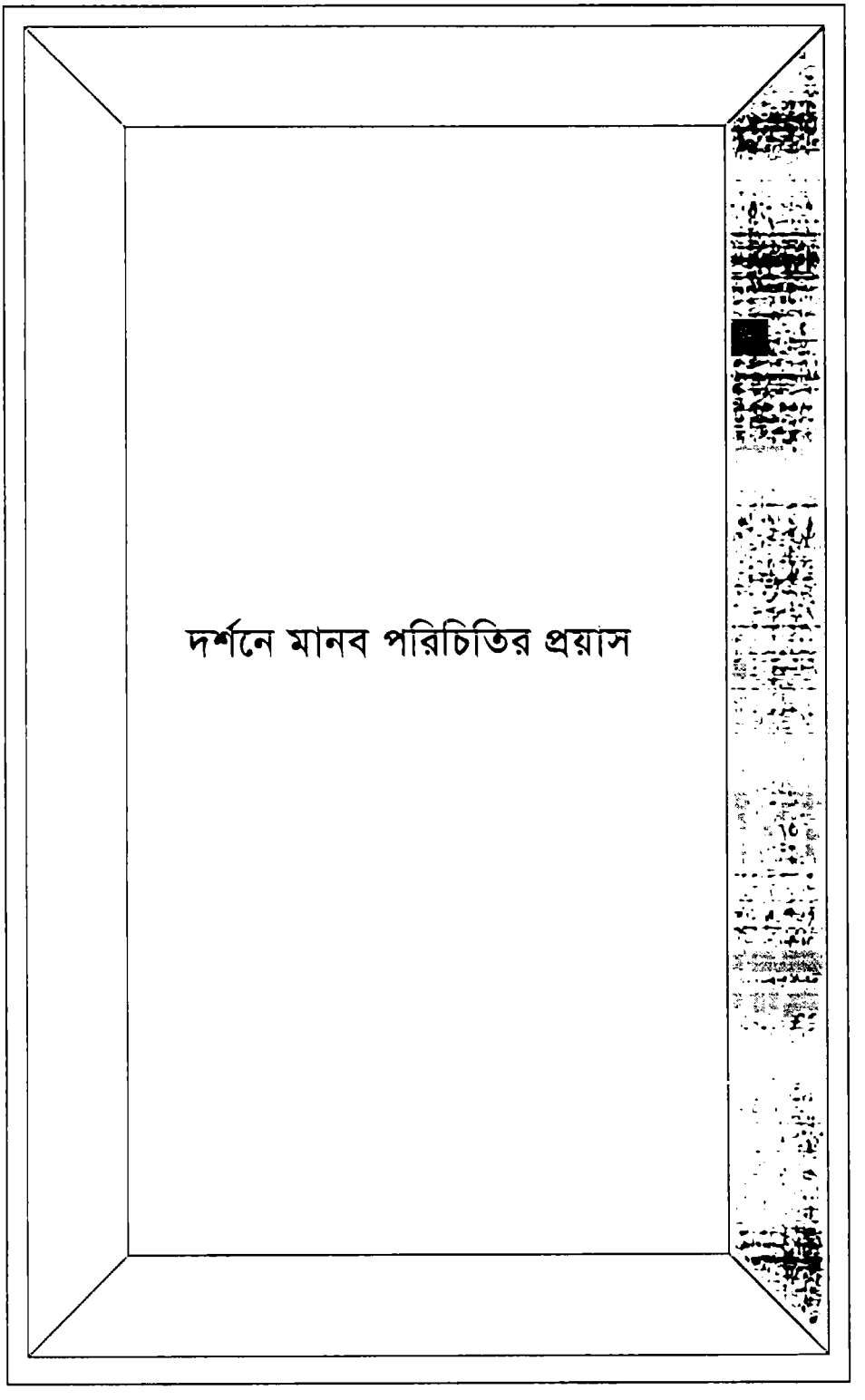

Dhaka University Institutional Repository

দর্শনে মানব পরিচিতির প্রয়াস

জ্ঞানের কিছু কিছু বিষয় এমন ভাগ্যবান যে, শুধুমাত্র জ্ঞান-গবেষণার মহলে ছাড়া সেগুলো চর্চা হয় না এবং জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তির যোগ্য হাত ছাড়া সেগুলোকে স্পর্শ করে না। কিন্তু কিছু কিছু বিষয় আবার এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। বরং সর্বমহলে সেগুলো নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলে। যোগ্য-অযোগ্য সকল হাতই তা স্পর্শ করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এরূপ জ্ঞানের বিষয়কে নিয়ে যতই হাতে কচলানো হবে ততই তার আসল রূপের বিকৃতি ঘটবে। ফলে অনুসন্ধিৎসু ও গবেষকদের জন্যে কাজ করা আরো দুরূহ হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, অনেক সময় গবেষণায় নেমে প্রথম পদক্ষেপেই তারা খেই হারিয়ে ফেলেন।

'আত্মা ও দেহ' এবং 'ঈশ্বর ও জগত'- এ দুটি জ্ঞানের বিষয়ও সেরূপ বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো উপরিউক্ত সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। এমন কোন লোক নেই যে এ বিষয় দুটিকে নিজের জন্যে উত্থাপন করেনি এবং এক প্রকারে নিজ চিন্তায় ও নিজ কল্পনায় এর উত্তর সমাধান করেনি। অবশ্য এর পেছনে কারণও রয়েছে। নিছক ভাগ্যক্রমের বা ঘটনাচক্রের ব্যাপার নয়।

কৌতূহল বা জানার আগ্রহ মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। তার কৌতূহলে প্রথম যে প্রশ্নটি উদয় হয় সেটা হলো 'কে আমি?' আর যে জগতে আমি রয়েছি 'কি সে জগত?' এহেন জিজ্ঞাসার সামনে মানুষ কোন না কোন একটি উত্তর বের করে নিজেকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা না করে পারে না। একারণে প্রত্যেকেই নিজের জন্যে এক ধরনের আত্ম-পরিচিতি ও এক প্রকারের বিশ্ব-পরিচিতি গড়ে তোলে।

'আত্মা ও দেহ' প্রসঙ্গটিও যেহেতু সর্ব হাতে টানা হেঁচড়া হওয়া একটি বিষয় এবং প্রত্যেকেই জীবনের শুরু থেকে শৈশবে নানী-দাদীর মুখে, পরবর্তীতে বক্তা-খতীবের মুখে কিম্বা আরো পরিণত বয়সে কবি-দার্শনিকের মুখে এ সম্পর্কে কিছু না কিছু শুনে থাকে। ফলে নিজে নিজে মস্তিষ্কের মধ্যে এ ব্যাপারে একটি পূর্ব-ধারণা গড়ে তোলে। প্রত্যেকের চিন্তা ভাবনা সেই পূর্ব-ধারণার আলোকেই আবর্তিত হয়। একারণে দেখা যায় অনেক লোক আত্মা ও দেহ সম্পর্কে কথা উঠতেই এ ব্যাপারে এমন সব কথা শোনার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকে ঃ যেমন, 'আত্মা হলো একটি অদৃশ্য ও রহস্যময় অস্তিত্ব, যে (কোন না কোন কল্যাণবশত) নিজেকে দেহের পর্দার আবরণে লুকিয়ে রেখেছে এবং স্বীয় অবয়বের ওপরে দেহের মুখোশ পরিধান করেছে। আর জিন ও দৈত্য সুলভ অলৌকিক ও অজাগতিক সব আচরণ ইন্দ্রিয়সর্বস্ব এ বস্তুগত দেহের পর্দার অন্তরাল থেকে পরিচালিত করে থাকে। আসলে দেহ নিছক একটি বাহ্যিক ও বানোয়াট এবং

Dhaka University Institutional Repository

ধারণকৃত আবরণ বৈ কিছু নয়। অদৃশ্য আত্মার হাতই এ বহিঃআবরণের অন্তরাল থেকে সমস্ত কাজ সম্পাদন করে থাকে।'

জ্বী, হয়তো অনেক লোকই আত্মা সম্পর্কে এ জাতীয় কথাই শুনতে নিজেকে প্রস্তুত করবে। হয়তো বা এতদিন কবিতা এবং কবিয়ালের ভাষায় যা কিছু শুনেছে সেগুলোই তৎক্ষণাৎ তাদের মস্তিষ্কে ভেসে ওঠে যে, আত্মা হলো একটি স্বর্গীয় পাখি বিশেষ; যার জন্যে বিশেষ কিছু কারণ বশতঃ শুধুমাত্র কয়েকদিনের জন্যে দেহ দ্বারা তৈরী করা হয়েছে একটি খাঁচা। যেন এক রাজা, যে দেহের দালানবাড়ীকে তার রাজত্বের রাজ-প্রাসাদ হিসাবে বেছে নিয়েছে এবং কদাচিৎ এ দালানবাড়ীর প্রতি তার নিজেরে চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং এর বহিঃদিকটা রেশমী কাপড়ে মুড়িয়ে দিলেও নিজেকে রাখে আলগা, সাজসজ্জামুক্ত। আত্মার সম্পর্কে গীতি-কাব্যে এমন বিবরণ থাকতেই পারে। কিন্তু দর্শনে তা নেই। কারণ, গীতি-কাব্যের ভাষা ও লক্ষ্য দর্শনের ভাষা ও লক্ষ্য থেকে আলাদা। এমনকি যে সব ব্যক্তি একাধারে কবি এবং দার্শনিক তাদেরও কবিতার ভাষা, দর্শনের ভাষা থেকে আলাদা হয়। উদাহরণ স্বরূপ : ইবনে সিনা 'আত্মা ও দেহ এবং এ দুয়ের মধ্যকার সম্পর্ক' প্রসঙ্গে তাঁর 'আশ শিফা' ও 'আল-ইশারাত ওয়াত তাম্বিহাত' গ্রন্থে যে ভাষায় কথা বলেছেন, এই একই প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আইনিয়া'র মধ্যে দেখা যায় অন্য ভাষা ব্যবহার করেছেন।

মোটকথা, আমাদেরকে দর্শন ও বিজ্ঞানের ভাষাকে অপরাপর ভাষা থেকে আলাদা করে দেখতে হবে। যাতে অনেক নাস্তিক্যবাদী ও বস্তুবাদীদের মতো মহা ভ্রান্তি ও শুধরানোর অযোগ্য ত্রুটির কবলে না পড়ি।

সত্যি বলতে কি, দার্শনিকদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কদাচিত এমন এমন মতবাদ দেখা যায় যা কবিতার ভাষার সাথে কমবেশি তুলনীয়। যেমন প্ল্যাটো'র বলে কথিত এ মতবাদে যেখানে তিনি বলেন : 'আত্মা হলো সেই আদি সারবস্তু যা দেহের পূর্বে বিদ্যমান। পরবর্তীতে যখন কোন দেহ প্রস্তুত হয়, তখন আত্মা স্বীয় স্থান থেকে অবতরণ করে এবং দেহের সাথে যুক্ত হয়।'

এ মতবাদটি শতভাগ একটি দ্বিত্বতা'র মতবাদ। কারণ, এতে আত্মা ও দেহকে দুটি ভিন্ন ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন সারবস্তু হিসাবে দেখা হয়েছে। আর এদের মধ্যকার সংযোগকে কৃত্রিম ও অপ্রকৃত বলে দেখা হয়েছে। পাখীর সাথে পাখীর বাসার সম্পর্ক যেমন কিম্বা সওয়ারের সাথে সওয়ারীর সম্পর্ক যেমন। কিন্তু এদের মধ্যে যে এক প্রকার ঐক্য ও সংযোগ এবং সত্তাগত সম্পর্কের নির্দেশ করবে এমন কোন সারবস্তুক ও প্রকৃত সম্পর্কের ইশারা এখানে নেই।

তবে আমরা যেমনটা জানি, অচিরেই প্লাটোর নিজের শিষ্য অ্যারিষ্টটল কর্তৃক এ মতবাদ খণ্ডন করা হয়। এরিষ্টটল এ বিষয়টি উপলব্ধি করলেন যে, প্ল্যাটো ও তাঁর পূর্ববর্তীরা বেশি বেশি আত্মিক বিষয়াদি ও নৈহিক বিষয়াদির মধ্যে দ্বিত্বতার দিকেই মনোযোগী হয়েছেন। আত্মা ও দেহের ঐক্য ও সম্পৃক্ততার দিকে মোটেও খেয়াল করেননি। অ্যারিষ্টটল অনুধাবন করলেন যে, আত্মা ও দেহের মধ্যকার সম্পর্ককে হালকা মনে করার অবকাশ নেই। এ সম্পর্ক পাখীর সাথে পাখীর বাসার মতো কিম্বা সওয়ারের সাথে সওয়ারীর সম্পর্কের মতো

Dhaka University Institutional Repository

নয়। অবশ্যই এ দুয়ের সম্পর্ক আরো গভীরতর এবং আরো প্রকৃততর। এরিষ্টটল আত্মা ও দেহের সম্পর্ককে (তাঁরই উদ্ভাবিত ' matter & form' মতবাদের) বস্তু ও তার আকৃতির মধ্যকার সম্পর্কের ন্যায় বলে মনে করেন। শুধু এটুকু পার্থক্য যে, 'বুদ্ধিশক্তি যেহেতু অপদার্থিক, কাজেই তা বস্তুর সাথেই একটি আকৃতি (form), বস্তুর মধ্যে নয়। এ বক্তব্যের সূত্র ধরে এরিষ্টটলের দর্শনে 'আত্মা' হলো আদি সারবস্তু এবং কার্যতঃ (বা actuality) বিদ্যমান' এ কথার কোন চিহ্ন আর নেই। আত্মা আদি নয়, সৃষ্ট। সূচনায় তা কেবলই এক (contingent predisposition) বা সম্ভাবনার প্রস্তুতি মাত্র। তার মধ্যে কোন রকম পূর্ব-জ্ঞানই অর্জিত নেই। তার সমস্ত জ্ঞান ও তথ্য এ জগতেই potentiality থেকে actuality তে পরিণত করে। ইবনে সিনার দর্শনেও কিছু পার্থক্যসহ এ অর্থই প্রতিফলন ঘটেছে। প্লাটোর দর্শনে ঐ যে দ্বিত্বতা, বিচ্ছিন্নতা ও পরস্পর অচেনা ভাব বিদ্যমান ছিল, এরিষ্টটল এবং ইবনে সিনার দর্শনে তা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। আর এ বক্তব্যের ভিত্তি গড়ে উঠেছে বিখ্যাত এরিষ্টটলীয় মতবাদ 'matter & form' এবং 'coming into being and passing away' এর ওপরে।

এ মতবাদ যদিও পূর্ববর্তী মতবাদের তুলনায় কিছুটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল এবং বিশেষ করে এখানে শুধুমাত্র আত্মা ও দেহের দ্বিত্বতার কথা বলা হয়নি; বরং এ দুয়ের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য ও অকৃত্রিম সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে- এদিক থেকে এ মতবাদটি খুবই আকর্ষণীয়। এতদসত্ত্বেও জটিল কিছু অস্পষ্টতা ও ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। ঐসব ত্রুটি হলো 'matter & form' এর মধ্যকার প্রকৃত সম্পর্কের বিশ্লেষণ সম্পর্কিত এবং 'coming into being and passing away' বিষয় সম্পর্কিত। এ কারণে বিজ্ঞান ও দর্শনের জগতে এ ধাঁধার সমাধান কল্পে আরো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক হয়ে পড়ে। অন্ততপক্ষে যেন বিষয়টি কল্পনা করা যুক্তিসাপেক্ষ ও গ্রহণীয় রূপ পরিগ্রহ করে।

ইউরোপে চিন্তা ও বিজ্ঞানের বিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো এবং পুরোদস্তুর একটি বিপ্লব সংঘটিত হলো। বিপ্লব কোনটা শুকনা, কোনটা ভিজা তা দেখে না। অতীতের সমুদয় ভিত্তিমূল (basement) একেবারে ধ্বসিয়ে দেয়। বিপ্লবীরা সবকিছুর বেলায় নতুন করে পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। 'আত্মা ও দেহ' প্রসঙ্গেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নিল। ফ্রান্সের বিখ্যাত দার্শনিক ডেকার্ট 'দ্বিত্ববাদ' এবং আত্মা ও দেহের দ্বিত্বতা প্রসঙ্গে বিশেষ থিওরী প্রদান করলেন, যা পরবর্তীতে প্রত্যাখ্যান, সংশোধন, গ্রহণ ইত্যাদি কাজেই সকলকে ব্যস্ত রাখে।

ডেকার্ট তাঁর চিন্তার পরিক্রমায় এখানে এসে উপনীত হন যে, নিজের জন্যে তিনটি সত্যকে স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যথা : ঈশ্বর, আত্মা এবং দেহ। তিনি এ বিচারে যে আত্মা যেহেতু চিন্তা ও চৈতন্যের অধিকারী, কিন্তু মাত্রা (Dimension)'র অধিকারী নয়। পক্ষান্তরে দেহের মাত্রা রয়েছে কিন্তু চিন্তা ও চৈতন্য নেই- একারণে বিশ্বাস করলেন যে, আত্মা ও দেহ দুটি আলাদা জিনিস।

Dhaka University Institutional Repository

ডেকার্টের এ দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে যে আপত্তি ন্যায়সঙ্গতভাবেই বর্তায় এবং প্রথমবার খোদ ইউরোপীয়দের থেকেই এ আপত্তি ওঠে, তাহলো তিনি কেবল দ্বিত্বতা কেন্দ্রিক এবং আত্মা ও দেহের মধ্যে পার্থক্য ও বৈপরিত্য নিয়েই চর্চা করেছেন। অথচ এ দুয়ের মধ্যে যে সংযোগ ও মিলন রয়েছে সে ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যাই প্রদান করেননি, যে কীভাবে হলো এ দুটি বস্তু স্বয়ং ডেকার্টের ভাষায় যাদের মধ্যে ভিন্নতা ও বৈপরীত্য চরম পর্যায়ে, অথচ পরস্পরে একত্রে মিলেছে। আত্মা ও দেহের অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো একদিকে দেহের মধ্যে এবং অপরদিকে আত্মা কিম্বা আত্মিক গুণাবলীর মধ্যে যে ঐক্য ও ঘনিষ্ঠতা তথা মিলন বিদ্যমান, তার ধরণ প্রকৃতির ব্যাখ্যা করা।

প্রকৃতপক্ষে এ অধ্যায়ে ডেকার্টের মতটি হলো এক প্রকার প্ল্যাটোর মতবাদের পশ্চাদগমন। ঠিক যেন পুনরায় আমাদেরকে সেই পক্ষী ও তার বাসার মধ্যকার সম্পর্কের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ডেকার্ট একদিকে যেহেতু সহজাত ও সত্তাগত চিন্তা-কল্পনায় বিশ্বাস করেন এবং সেই শুরু থেকেই নফস তথা আত্মার ব্যাপারটিকে বাস্তব ঘটিত[১] (Actual) বিষয়েরই অংশবিশেষ মনে করেন, সে কারণে তাঁর মতবাদ প্লাটোর মতবাদের নিকটবর্তী। অপরদিকে আত্মা ও দেহের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যায় তাঁর আলোচনা ততটাই সংক্ষিপ্ত যেমনটা প্ল্যাটোর আলোচনায়ও সংক্ষিপ্ত। এই পশ্চাদগামিতা ও প্রত্যাবর্তনের জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়। একদিক থেকে দেহের প্রাকৃতিক ও সহজাত সম্পর্ক এবং অপর দিক থেকে আত্মা ও আত্মিক গুণাবলীর সম্পর্ক - এটা এমন কোন জিনিস ছিল না যে, তা উপেক্ষা করা যায় এবং শুধু দেহ ও আত্মিক বিষয়গুলোর মধ্যকার পার্থক্য ও ভিন্নতা ব্যাখ্যা করেই তুষ্ট থাকা যায়। ফলে সতর্কবান যারা, তারা ডেকার্টের পরে লক্ষ্য করেন যে, এ দুয়ের মধ্যকার সম্পর্ক উদঘাটন করা জরুরী।

যে ব্যক্তি আধুনিক কালের দর্শনের ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুট পরিচিত, তিনি জানেন যে, আধুনিক দার্শনিকবৃন্দের চেষ্টা ও প্রয়াস কতটা পরিমাণে আত্মিক ও দৈহিক বিষয়াবলীর মধ্যকার সম্পর্কের ধরণ প্রকৃতি উদঘাটনে নিয়োজিত হয়েছে এবং কত রকম মতবাদের উৎপত্তি ঘটেছে। আর কতই না বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। অবস্থা এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে, একদল মানসিক কর্মসমূহ এবং আত্মিক বিষয়গুলোকে জড়বস্তুর ক্রিয়ার স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ফলাফল বলে মনে করেন এবং আত্মা ও দেহের মধ্যে যে কোন দ্বিত্বতাকে অস্বীকার করেন। এভাবে তারা আত্মা ও দেহের দ্বিত্বতাকে তাদের কল্পনা অনুযায়ী সম্পূর্ণ উধাও করে ফেলেছেন। আবার আরেকদল এতসব চেষ্টা প্রচেষ্টা থেকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে এধরনের আলোচনাকে মনুষ্য সামর্থ্যের অসাধ্য ও বহির্ভূত বলে মনে করেন।

যদিও আধুনিক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের আত্মিক বিষয়াবলীর স্বরূপ (essence) এবং দেহ ও আত্মার সম্পর্কের ধরন-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনার কোন সুরাহা হয়নি, তবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ যেমন বায়োলজি, বিশেষ করে ফিজিওলজি ও সাইকোলজির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা অনেক বড় বড় ও বিস্ময়কর সাফল্য বয়ে এনেছে, কখনো কখনো বিজ্ঞানীরা স্ব স্ব বিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মিক বিষয়াবলীর

Dhaka University Institutional Repository

স্বরূপ এবং দেহ ও আত্মার মধ্যকার সম্পর্কের ধরন সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য করেন নি। তবে এসব গবেষণা এতদবিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাবার ক্ষেত্রকে পুরোপুরি প্রস্তুত করে দিয়েছে।

ইতোপূর্বে অ্যারিষ্টটল ও ইবনে সিনার মতবাদের প্রতি সংক্ষেপে ইশারা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, এ মতবাদে প্ল্যাটোর 'দ্বিত্বতা' মতবাদের মাত্রা কিছুটা হ্রাস লাভ করেছে এবং আত্মা ও দেহের মধ্যকার সম্পর্ক ও বন্ধনের প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়েছে। এ বক্তব্যই এরিষ্টটলের মূলনীতি অনুযায়ী (matter & form) শিরোনামে আলোচিত হয়েছে। এখন দেখা যাক, এ বিষয়টি ইবনে সিনা পরবর্তী যুগে মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে কেমন ভাবে আলোচনায় এসেছে। আসলে ইবনে সিনা পরবর্তী যুগেও মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে এ বিষয়ের ওপরে নতুন কোন গবেষণা সম্পাদিত হয়নি। তবে, Philosophia Prima'র সবচেয়ে সার্বজনীন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অর্থাৎ (problems of existence) এর ক্ষেত্রে বিশাল অগ্রগতি ও বিবর্তন সাধিত হয়, যা পরোক্ষভাবে অধিকাংশ দর্শনের বিষয়াবলীর ওপরে, বিশেষ করে 'গতি' এবং 'দেহ ও আত্মার দ্বিত্বতা নাকি একত্ব' ইত্যাদি সমস্যাগুলোর ওপরে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

সংক্ষেপে যদি বলতে হয় তাহলে বলা যায় যে, অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিষয়ে যে বিরাট বিবর্তন ঘটে যায় এবং যার অগ্রনায়ক ছিলেন 'সাদরুল মুতাআল্লেহীন সিরাজী', তিনি যে নতুন, উন্নত ও শক্তিশালী মূলনীতি দাঁড় করান, সেখান থেকে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, জগতের বহিঃর্ভাগে যে দৃশ্যমান আরোপিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গতি বর্তমান, তার একই সমান্তরালে আরেকটি অতিন্দ্রীয় ও গভীরতর সারবস্তুক গতি (substantial motion) অন্তরভাগেও চলমান রয়েছে। আর ঐ অন্তরভাগের গতিই হলো বহিঃর্ভাগের এ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গতির (উৎস)মূল। যদি কোন বস্তু (matter) ও আকার (form)কে কল্পনা করতে হয়, তাহলে এ পথেই তা করতে হবে, অন্যপথে নয়। দৈহিক বিভিন্ন প্রজাতি (species)-র উৎপত্তি ও সৃষ্টি গতির নিয়মেই ঘটে। 'অস্তিত্ব ও বিনাশ' এর (coming into being and passing away) নিয়মে নয়।

মন এবং আত্মাও স্ব স্ব পর্যায়ে গতির এ নিয়মেরই ফসল। মনের গঠন সূত্রের মূল হলো দৈহিক (পদার্থিক) বস্তু। জড়বস্তুর এ সক্ষমতা রয়েছে যে, তার আঁচলে এমন এক জিনিসকে লালন পালন করবে, যা পরাপ্রকৃতির সাথে সমঞ্জস ও সঙ্গতিপূর্ণ হবে। আসলে প্রকৃতি ও পরাপ্রকৃতির মাঝে কোন দেয়াল বা পর্দা নেই। একটি জড়বস্তুও তার পূর্ণতার অগ্রযাত্রার ধারায় একটি অজড় বস্তুতে পরিণত হতে কোন বাধা নেই। মন পরিগঠনের উৎসমূল এবং এর সম্পর্কের ধরন সম্পর্কে প্লাটোর চিন্তা কোনক্রমেই সঠিক নয়।[২] এরিষ্টটলীয় চিন্তাও তদ্রুপ। জড় ও প্রাণের মধ্যকার সম্পর্কের ধরন এবং দেহ ও আত্মার মাঝে যে সংযোগ ও সম্পর্ক, তা এর চেয়ে অনেক বেশি সারবস্তুক (substantial)। অর্থাৎ এ সম্পর্ক হলো কোন জিনিসের তীব্রতা ও ক্ষীণতার (মাত্রাগত) সম্পর্কের মতো।

পূর্বোক্ত আলোচনাটুকুর দরকার ছিল একারণে যে, আমাদের জন্যে আত্মা ও দেহের সম্পর্কের স্বরূপ সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে তোলা সম্ভবপর হওয়ার পূর্বে আত্মা মৌলিক (Fundamental) নাকি মৌলিক

Dhaka University Institutional Repository

নয়, নাকি তা জড়বস্তুগত অংশ সমূহের সংমিশ্রণের গুণাগুণস্বরূপ কিনা?- এসব আলোচনা অবান্তরই। কিন্তু উক্ত ব্যাপারটি স্পষ্ট হওয়ার পরে আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারি যে, আত্মিক গুণাগুণগুলো কি জড়বস্তুগত উপাদানসমূহের ক্রিয়া-বিক্রিয়া ও মিশ্রণেরই ফলস্বরূপ। যেমন অন্যান্য গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো, যা জড়বস্তু এককভাবে কিম্বা অন্যের সাথে মিশে প্রকাশ ঘটায়। নাকি পদার্থিক জড়বস্তু যতক্ষণ পর্যন্ত পদার্থ ও জড়ের পরিমাত্রায় অবস্থান করবে ততক্ষণ তা এধরনের গুণ ও বৈশিষ্ট্য শূন্য থাকবে। আর এ গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো কেবল তখনই উৎপত্তি লাভ করবে, যখন জড়বস্তু তার বস্তুসত্তায় পরিপূর্ণতা অর্জন করবে এবং সে বস্তুসত্তায় এমন এক পর্যায়ের অস্তিত্ব লাভ করবে যার ফলে সে অজড় ও অপদার্থিক হয়ে ওঠে। আর আত্মিক গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো আসলে সেই পর্যায়ের অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত?

যখন এ পর্যায়ে পৌছাই তখন বরাবরের মতো আলোচনা মনুষ্য আত্মা ও মানুষের মনগত বহিঃপ্রকাশ সমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার কোন আবশ্যকতা থাকে না। আমরা আরো নীচ থেকে শুরু করতে পারি এবং আলোচনাকে জীবনের সমুদয় চিহ্ন ও বহিঃপ্রকাশের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত করতে পারি। এখানে মূল আলোচ্য হলো আত্মা জড়বস্তুর গুণ বা ফল নয়, বরং এক সারবস্তুক (substantial) উৎকর্ষতা, যা জড়বস্তুর মধ্যে অর্জিত হয়, তারই ফলশ্রুতিতে সে জড়বস্তুর চেয়ে আরো অধিকতর ও বিচিত্রতর গুণ ও প্রভাবের অধিকারী হয়। উল্লেখ্য, এব্যাপারটি কেবল মানবের বা পশুর আত্মার জন্যেই স্বতন্ত্র নয়। বরং, জীব ও প্রাণী মাত্রই সকলের জন্যেই প্রযোজ্য।

জীবনের বাস্তব স্বরূপ (reality) যাই হোক না কেন এবং তা উপলব্ধি করা আমাদের জন্যে সম্ভবপর হোক না কেন, এতটুকু অন্ততপক্ষে নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত যে, কিছু কিছু অস্তিত্ব, যাদেরকে আমরা জীবিত বলি, উদ্ভিদ ও প্রাণী নামে অভিহিতি করি, তাদের এক প্রকার কর্মচাঞ্চল্য (নড়াচড়া করার) গুণ রয়েছে, যে কর্মচাঞ্চল্য ও গুণ আরেকদল অস্তিত্ব, যারা জড়বস্তু ও নিস্প্রাণ, তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না।

এ প্রকারের অস্তিত্বগুলো 'আত্মরক্ষা' গুণের অধিকারী এবং নিজেকে পরিবেশের প্রভাব থেকে বাঁচায়। এর অর্থ হলো জীবন্ত জিনিস যারা, তারা যখন কোন পরিবেশে থাকে, তখন সম্পূর্ণভাবে একটি অভ্যন্তরীণ শক্তি দ্বারা নিজেকে ঐ পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্যে প্রস্তুত করে নেয় এবং নিজের অভ্যন্তরীণ উপকরণাদিকে এমনভাবে সজ্জিত করে ফেলে যাতে উক্ত পরিবেশের নিয়ামকসমূহের সাথে সংগ্রাম করতে সক্ষম হয় এবং সেখানে তার টিকে থাকার অনুকূলে তা প্রয়োগ করে।

যা কিছু জীবন্ত, তার মধ্যে অভিযোজন (পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর) গুণটি রয়েছে। এ গুণটি এক অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া থেকে উৎস লাভ করে। কিন্তু নিস্প্রাণ জিনিসগুলোর মধ্যে আদতেই এরূপ গুণ বিদ্যমান থাকে না। যদি কোন জড়বস্তু এমন কোন পরিবেশে রাখা হয়, যেখানে তার ধ্বংসের সব নিয়ামক প্রস্তুত রয়েছে, সেখানে সে নিজে থেকে নিজের রক্ষা ও টিকে থাকার জন্যে কোনই কর্মক্রিয়া প্রদর্শন করবে না। কার্যতই সে পরিবেশের নিয়ামকসমূহের সাথে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন জীবজন্তুরা 'স্বভাব' ও 'অভ্যাস' বিশিষ্ট হয়। যদি কোন জীব বাইরের থেকে বিঘ্নসৃষ্টিকারী কোন কারণের মুখোমুখি হয়, তাহলে প্রথমে খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং নিজ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে প্রতিকূল অবস্থাতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং বহিঃ নিয়ামকের বিপরীতে এক প্রকার আত্ম-সামর্থ অর্জন করে নেয়। এ সামর্থ তার অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার সূত্রে এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ার গুণ থেকেই আসে। ফলে যতটুকু পরিমাণ অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ তার জন্যে বিদ্যমান থাকে সেটুকুই গ্রহণ করে নেয়। একটি উদ্ভিদ কিম্বা কোন প্রাণীর দেহ, এমনকি কোন অঙ্গও যদি এমন কোন প্রতিকূল পরিবেশের বা বিরুদ্ধ নিয়ামকের মুখোমুখি হয়, যার ফলে তার জীবন হুমকিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তার টিকে থাকা ও ভারসাম্য বজায় রাখা দুস্কর হয়ে পড়ে, তখন ক্রমে ক্রমে সে নিজেকে এমন ভাবে অভিযোজিত করে ফেলে যার ফলে সহজেই ঐ বিরূপ পরিস্থিতিতে এবং সে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কারণের সামনে টিকে থাকতে সক্ষমতা লাভ করে। মানুষের হাত একদিকে যেমন নরম ও কোমল, প্রথমবার যখন কোন রুক্ষ ও শক্ত জিনিস বহন করে তখন টেকে না, কিন্তু একটি অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় অচিরেই তার অঙ্গের বুননে এমন উপযুক্ত পরিবর্তন সাধন করে ফেলে যে নতুন এ বিরূপ পরিস্থিতিতে সে এখন টিকতে পারে।

জীবের একটি বৈশিষ্ট্য হলো খাদ্যগ্রহণ। স্বতঃস্ফূর্ত ও অভ্যন্তরীণ এক উদ্দীপনায় প্রভাবিত হয়ে বাইরের থেকে খাদ্য গ্রহণ করে এবং পাচক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা ভেঙ্গে নিজের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো সংগ্রহ করে নেয়। কিন্তু প্রাণহীন জড়বস্তুর মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য নেই। প্রাণী ও জীবের যেখানেই জন্ম হোক না কেন, ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে এবং নতুন থেকে নতুনতর হয়ে পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। নিজ শক্তি সঞ্চয় করতে করতে এক পর্যায়ে গিয়ে প্রস্তুত হয় আপন বংশ রক্ষায়। নিজে নিঃশেষ হয়ে যায় কিন্তু তার রেখে যাওয়া প্রজন্মের মাধ্যমে তার বেঁচে থাকা অব্যাহত রাখে। প্রাণ ও জীবন যেখানেই উৎপত্তি ঘটুক না কেন তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করার শক্তি অর্জন করে নেয় এবং প্রকৃতির জড় উপাদানসমূহের ওপর স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করে। সেগুলোর গঠন বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন সাধন করত: সেগুলোকে নতুততর গড়ণ ও নতুনতর রসায়নে আবির্ভূত করে। জীবন হলো রূপ-পরিকল্পনাকারী, প্রকৌশলী ও চিত্রকর। তার মধ্যে পূর্ণতা ও অগ্রগতির গুণ বিদ্যমান। জীবন হলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত এবং নির্বাচন ক্ষমতা সম্পন্ন। নিজের পথ ও নিজের গন্তব্য সে চেনে। যে পথ সে লক্ষ কোটি বছর থেকে বেছে নিয়েছে, ক্রমে ক্রমে নির্দিষ্ট সে গন্তব্য পথ অতিক্রম করে চলেছে এবং অব্যাহত থাকবে এ যাত্রা। তার লক্ষ্য ও গন্তব্য আর কিছুই নয়, পরম পূর্ণতায় পৌছনো ছাড়া।

এ গুণগুলো সকল জীবরে মধ্যেই বিদ্যমান। অনুপস্থিত কেবল জড়বস্তুর মধ্যেই। বিখ্যাত আমেরিকান রসায়নবিদ Abraham Cressy Morrison (1884 - 1951) এর ভাষায় :

> 'জড়বস্তু নিজের থেকে কোন সৃজন সাধ্য রাখে না। জীবনই কেবল প্রতি ক্ষণে নতুন থেকে নতুনতর কোন সৃজনের প্রকাশ ঘটায়।'[৩]

Dhaka University Institutional Repository

এ থেকে আমরা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারি যে, জীবন স্বয়ং এক বিশেষ শক্তি এবং এক নিরঙ্কুশ পরিপূর্ণতা ও সংঘটিত বাস্তবত (Actuality)। যা উৎপত্তি লাভ করে জড়বস্তুর অতিরিক্ত এবং নিজস্ব কিছু বিচিত্র গুণ ও প্রভাব তথা কর্মক্রিয়া প্রকাশ করে।

ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা বায়োলজির ওপরে বিস্ময়কর সব গবেষণা পরিচালনা করেছেন, যা আত্মা ও দেহ সম্পর্কে দার্শনিক গবেষণার পথকে সম্পূর্ণ মসৃন করে দিয়েছে। যদিও বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য দার্শনিক গবেষণা ছিল না। সত্যি বলতে কি, জীবন ও প্রাণ এবং জীবনের গুণবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মূল্যবান সব গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। যা 'জীবনী শক্তির মৌলিকতা'র বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করে দিয়েছে। বহু সংখ্যক বিজ্ঞানী এ সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং তাদের গবেষণায় জীবনীশক্তির মৌলিকতার প্রতি ইশারা করেছেন। তারা জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, জীবনের শক্তি হলো এমন এক শক্তি, যা প্রকৃতির ধারায় জড়বস্তুর ওপরে বর্তায়। আর জীবনের যেসব লক্ষণ ও প্রভাব, সেগুলো এ শক্তিরই কার্য বা ফল। অর্থাৎ নিছক জড়বস্তুগত উপাদানসমূহের ক্রিয়া বিক্রিয়া ও সংমিশ্রণের ফল নয়। হ্যাঁ, জড়বস্তুগত উপাদানসমূহের ক্রিয়া বিক্রিয়া ও সংমিশ্রণ প্রক্রিয়াটি জীবন ও প্রাণের লক্ষণ ও গুণসমূহ আবির্ভূত হওয়ার আবশ্যক শর্ত বটে। কিন্তু সেটাই একমাত্র ও যথেষ্ট শর্ত নয়। ফরাসি বায়োলজিস্ট Lamarck[৪] বলেন :

> 'জীবন (প্রাণ) ফিজিক্যাল একটি রূপ বৈ কিছু নয়। জীবনের সকল ধরনই ফিজিক্যাল ও কেমিক্যাল ক্রিয়া-বিক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত (ফলস্বরূপ) এবং এদের উৎস হলো জীবের বস্তুগত কাঠামো।'

সম্ভবত: Lamarck মনে করেছেন যদি জীবনীশক্তি মৌলিক হয় তাহলে বুঝি ফিজিক্যাল ও কেমিক্যাল ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারবে না এবং বুঝি জীবের বস্তুগত কাঠামো থেকে উৎস লাভ করতে পারবে না।

অবশ্য ডেকার্টের দ্বিত্বতা মতবাদ এবং প্লাটোর মতবাদের প্রতি তার পশ্চাদগমনের জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। কারণ, এর ফলে বিজ্ঞানীরা যখনই জীবনীশক্তির মৌলিকতা সম্পর্কে চিন্তা করতে উদ্যোগী হতেন, তখন তাদেরকে দেহের সাথে জীবনের সত্তাগত সম্পর্ককে দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রাখতে প্রবৃত্ত করে; যাতে সবসময় তারা দুই বিপরীত প্রান্তিক চিন্তা করে। দেহের বৈশিষ্ট্য হলো তার দিক (মাত্রা) রয়েছে। পক্ষান্তরে আত্মার বৈশিষ্ট্য চিন্তা ও চৈতন্যের অধিকারী হওয়া। এই দ্বিত্বতা নিয়ে স্বয়ং ডেকার্টই যখন অগ্রসর হলেন এবং এ দুয়ের মাঝে বিস্তর ব্যবধানে বিশ্বাসী হলেন, তখন মানুষ ভিন্ন অন্যদের বেলায় জীবনকে একটি মৌলিক শক্তি হিসাবে অস্বীকার না করে তাঁর আর উপায় ছিল না। ফলশ্রুতিতে আজব হলেও সত্য যে, তিনি সকল জীবজন্তুর (মানুষ ব্যতীত) অবয়বকে নিছক একটি যান্ত্রিক অবকাঠামো বলে মনে করতেন এবং জীবজন্তুর ইন্দ্রিয় ও অনুভূতির কথা অস্বীকার করে দাবী করেন যে, পশুর কোন অনুভূতি নেই। আমরা যে দেখতে পাই নির্দিষ্ট সময়ে তারা চলাফেরা করে কিম্বা ডাক ছাড়ে, সেটা অনুভূতি ও ইচ্ছা থেকে নয়। এসব

Dhaka University Institutional Repository

যন্ত্রগুলো এমনভাবে স্থাপিত হয়েছে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সময় ক্ষণে এসব লক্ষণ প্রকাশ করে থাকে। আর আমরা মনে করি, অনুভূতি ও ইচ্ছা থেকে করছে!!

যা হোক, 'জীবনীশক্তির মৌলিকত্ব' হলো এমন একটি তত্ত্ব, যা আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় স্বীকৃত সত্য। বিশেষ করে 'বিবর্তনবাদ' যা আগের চেয়ে অনেক বেশি জীবনীশক্তি এবং বস্তু ও প্রকৃতির জড়ীয় শক্তিসমূহের ওপর এর কর্তৃত্ব ও শাসনকে প্রমাণ করেছে। ডারউইন, যিনি ছিলেন এ মতবাদের অগ্রনায়ক, যদিও তিনি জীবনীশক্তির মৌলিকত্ব প্রমাণে প্রয়াসী নন; বরং শুরুতে নিজ গবেষণাকে (Natural selection) থিওরীর ওপর দাঁড় করান এবং Natural selection এর প্রক্রিয়াটি স্রেফ প্রকৃতির লক্ষ্য উদ্দেশ্যহীন আকস্মিক পরিবর্তনের ফলস্বরূপ বলে মনে করেন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত অগ্রধারার রহস্য ও বিভিন্ন জীব-প্রজাতির সুশৃঙ্খল পূর্ণতার পথে প্রবৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রার সূক্ষ্ম ব্যাপার সম্পর্কে মনোযোগী হন। তখন তাঁর ভাষায়- 'জীবন্ত প্রকৃতির ব্যক্তি চরিত্র বিদ্যমান' বলে মেনে নিতে বাধ্য হন। ডারউইন জীবনীশক্তির মৌলিকতা নিয়ে অনুসন্ধানে ছিলেন না। কিন্তু আপনা থেকেই এ ফলাফলে উপনীত হন। যে কারণে তাঁর সময়ে অনেকেই তাঁকে বলেন : 'আপনি Natural selection এর ব্যাপারে একটি সক্রিয় ও অতি প্রাকৃতিক শক্তি হিসাবে কথা বলেছেন।'[৫]

যারা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দিক নিয়ে ষ্টাডি করেছেন, তারা মানুষের জীবনের মৌলিকতা খুঁজে বের করার পরিবর্তে এবং তাদের গবেষণা থেকে যে দার্শনিক ফলাফল বের হয়, সেদিকে খেয়াল না করেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

Psychoanalism এর প্রবক্তা বিখ্যাত মনোবিদ Freud মনোবিজ্ঞানের জগতে এক বিপ্লব সংঘটিত করেন। এ মনোবিদ তাঁর অধ্যয়ন, পরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতায় এ ফলাফলে উপণীত হন যে, শরীরতত্ত্ববিদদের বিশ্লেষণে আর মস্তিস্ক ও এর আকাবাকা গঠনের ব্যবচ্ছেদই স্নায়ুতান্ত্রিক রোগ-ব্যধির জন্যে যথেষ্ট নয়। তিনি একটি গোপন চেতন যন্ত্রের সন্ধান পেলেন যার সম্পর্কে মানুষের সাধারণ ও বাহ্যিক চেতনা ও আত্মজ্ঞান যেনতেনপ্রকারেণ মাত্র। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, মানসিক বৈষম্য ও বিদ্বেষ থেকে উৎসারিত আত্মিক (psychic) কারণসমূহ, স্বয়ং মৌলিকতার অধিকারী এবং স্ব স্ব প্রভাব দিয়ে রোগ ব্যধি সৃষ্টি করে। রোগীর চিকিৎসার পদ্ধতি হিসাবে আত্মিক (psychic methods) পন্থাসমূহ এবং ঐসব মানসিক বৈষম্য দূর করার মাধ্যমেই অগ্রসর হতে হয়ে, যাতে ক্ষেত্র বিশেষে রোগের দৈহিক প্রভাব (পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া)ও দূর হয়ে যায়।

অনেক মানসিক রোগের এবং এমনকি কিছু শারিরীক রোগেরও psychic পদ্ধতিতে চিকিৎসার বিষয়টি নতুন কোন আবিষ্কার নয়। মুহাম্মাদ বিন যাকারিয়া রাজি এবং ইবনে সিনার ন্যায় চিকিৎসাবিদরা এ পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু আজ এ বিদ্যার ব্যাপ্তি অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আসলেই অবাক হয়ে যেতে হয়।[৬] এ থেকে মানুষের মধ্যে জীবনের মৌলিকতা, বিশেষ করে আত্মার মৌলিকতার ব্যাপারটি পুরোপুরি প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কিন্তু, Freudism -এ যে জিনিসটি

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যণীয়, তাহলো অন্তস্থ চেতনার আবিষ্কার এবং এছাড়াও একশ্রেণীর 'মানসিক বৈকল্য ।' অতীতে চারিত্রিক ও মানসিক ব্যধিসমূহকে স্রেফ এক শ্রেণীর 'অভ্যাস' হিসাবে ব্যাখ্যা করা হতো এবং বলা হতো : অভ্যাস হলো জড়বস্তু সদৃশ একটি ধারা। যেমনভাবে একটি গাছের শাখাকে যদি বাকিয়ে এনে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে পূর্বের জায়গায় ফিরে আসে। এই একই কাজের যদি পুনরাবৃত্তি করা হয় তাহলে শাখাও পূর্বের জায়গায় ফিরে আসবে। কিন্তু আগের চেয়ে কম। এভাবে যদি পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে তাহলে শাখা ঐ বাকা অবস্থাতেই থেকে যাবে। বলা হয় মানুষের অভ্যাসও ঠিক তদ্রুপ। কোন কাজ পুনঃ পুনঃ পুনরাবৃত্তির ফলে মস্তিষ্কের খাঁজে তার স্থায়ী দাগ পড়ে যায়। আমরা তখন তার নাম দেই সচ্চরিত্র অথবা দুশ্চরিত্র। কিন্তু, 'অন্তস্থ চেতনা' থিওরী এবং 'মানসিক বৈকল্য' থিওরী প্রমাণ করে যে, চারিত্রিক (নৈতিক) ঘটনাপ্রবাহ গুলো একটি স্বাধীন ঘটনাপ্রবাহ।

ড. মূর্তাজা মোতাহহারী এক মূল্যায়নে বলেন :

> 'ফ্রয়েড চাননি তাঁর এ থিওরী থেকে 'জীবনীশক্তির মৌলিকতা' এবং জড়বস্তুর ওপরে জীবনের কর্তৃত্বক্ষমতা প্রমাণ করতে। বরং, যখন তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা (যেখানে তিনি তাঁর যোগ্যতার যথার্থ স্বাক্ষর রেখেছেন) দার্শনিক ফলাফল গ্রহণের পর্যায়ে প্রবেশ করে (যেখানে তাঁর যোগ্যতা নেই), তখন তিনি (আনাড়ির মতো) অনাকাঙ্খিতভাবে এমনসব ধারণা গঠণ করেন যা এ বিজ্ঞানীর সমুচিত নয়। তদসত্ত্বেও এ বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল্য যা, সেটা তো যথাস্থানেই সংরক্ষিত।'[৭]

তাঁর কিছুসংখ্যক শিষ্য যেমন Yung মনোবৈজ্ঞানিক থিওরীসমূহ থেকে দার্শনিক সিদ্ধান্ত বের করার পদ্ধতির ব্যাপারে পুরোপুরি তাদের গুরুর বিরোধী অবস্থান নেন। তারা অনেকটাই এসব থিওরীর মধ্যে জীবনীশক্তির মৌলিকতার বিষয়টি স্পষ্ট করেন। এভাবে বলা যায় যে, তারা ফ্রয়েডের মতবাদকে একটি পরাপ্রাকৃতিক রূপ দান করেন।

যেমনটা ইতিপূর্বে উল্লখ করা হয়েছে, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হলো দেহ, প্রাণ, জড় ও জীবনের পার্থক্যের দিকগুলো নয়। জীবনীশক্তির মৌলিকতার সমর্থনে ইউরোপীয় গবেষকদের পক্ষ থেকে এতসব স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করার আগেও ঐ সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকেও এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেয়া যেত। আরেকটি বড় সমস্যা হলো দেহ ও প্রাণের সম্পর্কের স্বরূপ তুলে ধরার ধরণ ও পদ্ধতিটা। এ স্বরূপ চিত্রণের ত্রুটিই অনেক বিজ্ঞানীর জীবনীশক্তির মৌলিকতায় বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকার কারণ হয়েছে। তবে সাদরুল মুতাআল্লেহীন সিরাজীর দর্শনে এবং তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হোসাইন তাবাতাবাঈ'র দর্শনে উত্তম পন্থায় এর সমাধান হয়েছে।

জীবনীশক্তির মৌলিকতার বিষয়টির একটি পরাপ্রাকৃতিক দিক রয়েছে। জীবন যদি হতো জড়বস্তুর গুণ ও ক্রিয়াবিশেষ, তাহলে এর কোন পরাপ্রাকৃতিক দিক থাকতো না। কারণ, সেক্ষেত্রে জীবন ও প্রাণ হতো

Dhaka University Institutional Repository

জড়বস্তুর ভিতরে নিহিত ও লুক্কায়িত এক শক্তি, স্বতন্ত্র অবস্থায় হোক আর সংমিশ্রিত অবস্থায় হোক। তাই যখন কোন কোন জীবন্ত সত্তার উৎপত্তি ঘটে, তখন আসলে কিছুই সৃষ্টি হয়না এবং জড়বস্তুর মধ্যে কোন পূর্ণতা (পরিণত হওয়া ও উৎকৃষ্টতা অর্জন করা) সাধন হয় না। কিন্তু জীবনীশক্তির মৌলিকতার থিওরী অনুযায়ী, জড়বস্তুর নিজ সত্তায় কোন প্রাণ তথা জীবন নেই। বরং যখন জড়বস্তুতে ক্ষেত্রপ্রস্তুত (predisposition) হয়, তখন প্রাণ ও জীবন সেখানে সঞ্চারণ করা হয় এবং সৃষ্টি লাভ করে। অন্যকথায়, জড়বস্তু তার পূর্ণতা ও উৎকর্ষতার যাত্রা পথে চলতে চলতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এমন এক পূর্ণতা লাভ করে যা ইতপূর্বে তার মধ্যে ছিল না। ফলশ্রুতিতে সে বিশেষ কিছু গুণ ও ক্রিয়ার অধিকারী হয় যা ইতিপূর্বে তার ছিল না। অতএব, যে জিনিসটি জীবিত হয়, সে আসলেই 'সৃষ্টি' হওয়া ও 'উৎপত্তি' লাভ করে।

এখানে একটা কথা বলা যেতে পরে যে, ঠিক আছে- নিস্প্রাণ জড়বস্তু স্বতন্ত্র ও একাকী অবস্থায় কোন গুণ ও ক্রিয়ার অধিকারী নয়। কিন্তু, তাই বলে পরস্পর সংমিশ্রিত হয়ে এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ফলেও যে জীবনের গুণ ও ক্রিয়ার অধিকারী হতে পারবে না- এমন কোন নিষেধ আছে নাকি?

-একথার উত্তর হলো : কয়েকটি জড়ীয় বা বস্তুগত অংশ একে অপরের সাথে সংমিশ্রিত হলে এবং এক অপরের সাথে ক্রিয়া বিক্রিয়া করলে যে কাজটা হয়, সেটা হলো একটি অংশের যে গুণ বা ক্রিয়া রয়েছে, তা থেকে কিছু অংশ অন্যকে প্রদান করবে এবং অন্যের কিছু গুণ ও ক্রিয়া নিজে গ্রহণ করবে। ফলে একটি 'মাঝামাঝি মেজাজ' তৈরী হবে। কিন্তু এটা অসম্ভব যে, কয়েকটি জড়ীয় অংশের একে অপরের সাথে ক্রিয়া বিক্রিয়ার ফলে এমন কোন গুণের উৎপত্তি ঘটবে, যা উপস্থিত অংশসমূহের গুণাগুণ ও ক্রিয়া থেকে ভিন্ন। তবে, যদি এ অংশসমূহের ক্রিয়া বিক্রিয়া থেকে এমন কোন ক্ষেত্রপ্রস্তুত ও পরিবেশ (predisposition) সৃষ্টির কারণ হয়, যেখানে একটি উন্নততর ও উৎকৃষ্টতর শক্তির উদ্ভব ঘটতে পারে, নিশ্চয় উক্ত শক্তিই হবে একটি (substantial maturity) তথা সারবস্তুক পূর্ণতা অর্থে, যা বিদ্যমান জড়ীয় অংশসমূহের গুণ ও ক্রিয়া থেকে উৎকৃষ্টতর। পাশাপাশি উক্ত অংশসমূহকে সত্যিকার একত্র (unified) করতে সক্ষম।

কাজেই এই যে উপরোক্ত প্রশ্নে বলা হলো : জড়বস্তুসমূহ পরস্পর সংমিশ্রিত হয়ে এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবনী গুণ লাভ করতে বাধা কোথায়?- এটা এমন একটা কথা যা ব্যাখ্যা করে বলার অবকাশ রয়েছে। যদি উদ্দেশ্য এটা হয় যে, জড়বস্তুর অংশসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় জীবনের মূল শক্তি উৎপত্তি ঘটার পরিবেশ ও ক্ষেত্রপ্রস্তুত করে দেয় এবং তখন জীবনী শক্তি আবির্ভূত হয় ও তারই অনুগমনে জীবনের গুণ ও ক্রিয়াসমূহও সৃষ্টি হয়- তাহলে একথাটি গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু যদি উদ্দেশ্য এটা হয় যে, জীবনীশক্তি ব্যতীতই প্রত্যেক জড়ীয় অংশের গুণের থেকে ভিন্নকোন গুণ হিসাবে যে জীবনীশক্তি, তা উৎপত্তি লাভ করে- তাহলে এ কথা গ্রহণযোগ্য তো নয়, অসম্ভবও বটে।

এখানে আরেকটি কথা থেকে যায়। যদি এভাবে বলা হয় যে, ঠিক আছে, জড়বস্তু আপন সত্তার মধ্যে প্রাণ বা জীবন শুন্য। আর জীবন হলো এমন এক শক্তি যা নিস্প্রাণ জড়বস্তুর শক্তির উর্ধ্বে। তবে, আমরা

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে ধরে নেব যে, বিজ্ঞানীদের গবেষণায় যেমনটা প্রমাণিত হয়েছে, বিশ্বে জড় বস্তুসমূহের শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় এবং জড়বস্তুর উৎপত্তি বা বিলুপ্তি, কোন সৃষ্টি হওয়া নয়। বরং কেবল একবস্তু থেকে আরেক বস্তুতে রূপান্তরিত হওয়া। তদ্রুপ জীবনের জন্যে এক প্রকার বিশেষ শক্তির কল্পনা করবো, যা ফলশ্রুতিতে অজড় শক্তির ন্যায় জীবনীশক্তি ও সৃষ্টি বা উৎপত্তি লাভ করে না। বরং এক রূপ থেকে আরেক রূপে রূপান্তরিত হয়। কাজেই জীবন্ত হওয়াও তাহলে সৃষ্টি হওয়া নয়।

তবে একথার উত্তরে বলতে হয়- প্রথমত: 'জীবনীশক্তি' কথাটির অর্থ স্পষ্ট হওয়া দরকার। এ শক্তিটি কি আপন সত্তায় নিষ্প্রাণ ও মৃত নাকি প্রাণবন্ত ও জীবন্ত? যদি দ্বিতীয়টাই সঠিক হয় (অর্থাৎ জীবন্ত) তাহলে প্রশ্ন হলো সেটা কি এমন, যে বলা যাবে, কোন জিনিস জীবনের অধিকারী হয়েছে। অর্থাৎ জীবন কি তাহলে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা একটা কিছু যা কোন জিনিসের সঙ্গে যুক্ত হয় বা কোন জিনিসে আপতিত হয়? নাকি এখানে তৃতীয় কোন কথা রয়েছে, যেখানে বলা হবে জীবন নিজেই প্রাণময় শক্তি, কারো সাথে যুক্ত নয়?

বলা বাহুল্য, এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় ধারণা দুটি সঠিক হতে পারে না। বাকী থাকে তৃতীয় ধারণাটি।

দ্বিতীয়ত: যদি ধরে নেওয়া হয় যে, নিষ্প্রাণ জড়বস্তুর মধ্যে সৃষ্টির প্রসঙ্গ স্বীকার করা যাবে না। বরং সেগুলোর উৎপত্তি 'শক্তির স্থানান্তর' এবং এক অংশের গুণসমূহের সাথে আরেক অংশের যোগ বিয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়- তাহলে এ ধারণা প্রাণীদের বেলায় সঠিক নয়, বিজ্ঞানীরা সবাই সে বিষয়ে একমত। জীবনের এ গুণ রয়েছে যে, এর সবটুকুর একটি নির্দিষ্ট ও স্থির পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না। কিম্বা বস্তুসমূহের জীবিত হওয়াকে স্রেফ জীবনের স্থানান্তর বলে আখ্যায়িত করা যায় না। জীবনের নির্দিষ্ট ও স্থির কোন পরিমাণ নেই। জগতের বুকে জীবনের আবির্ভাব ঘটার দিন থেকেই তা ক্রমবর্ধমান। কখনো যদি ধ্বংসও হয়ে যায়, যেমন একসাথে অনেক সংখ্যক প্রাণীর প্রাণহানি ঘটলো- তাহলে এ শক্তি অন্য কোন স্থানে জন্মও হয় না। জীবন ও মৃত্যু অবশ্যই একপ্রকার সংকোচন ও সম্প্রসারণ। কিন্তু এমন সংকোচন ও সম্প্রসারণ প্রকৃতির উর্ধ্ব স্তর থেকে উৎস লাভ করে, এমন এক অনুগ্রহ যা অদৃশ্য থেকে এসে পৌঁছে এবং অদৃশ্যে প্রত্যাবর্তন করে।

এখানে উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে Oswald Ku lpe এর উদ্ধৃতি তুলে ধরা যায় । তিনি বস্তুবাদের সমালোচনায় বলেন :

> বস্তুবাদীরা মডার্ণ ফিজিক্সের 'শক্তির অবিনাশীতা' সূত্রের লঙ্ঘন করে থাকেন। এ সূত্র মতে, বিশ্বে বিদ্যমান শক্তির সামষ্টিক পরিমাণ স্থির ও নির্দিষ্ট রয়েছে। আর যা কিছু আমাদের চারপাশে পরিবর্তন ঘটে সেটা শক্তির এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর এবং এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর ছাড়া অন্য কিছু নয়। এটা খুবই স্পষ্ট যে এ সূত্র অনুসারে পদার্থিক বাহ্য প্রকাশসমূহ পরস্পর সংযুক্ত গোলকের সদৃশ্য এবং এ গোলকের মধ্যে মেন্টাল কিম্বা ইন্ট্যালেকচুয়্যাল অন্য কোন প্রকারের গোলকের বাহ্য প্রকাশের জন্য স্থান খালি থাকে না। অতএব মস্তিস্কগত কর্মক্রিয়া তার স্বতন্ত্র জটিল রূপ সত্ত্বেও অগত্যা সে সমস্ত বাহ্য

Dhaka University Institutional Repository

> প্রকাশের মধ্যেই পরিগণিত হবে, যা কার্যকারণ নিয়ম মেনে চলে এবং মস্তিস্কের ওপরে বাইরের প্রভাবকসমূহের প্রভাবে যতসব পরিবর্তন সংঘটিত হয়, সেগুলো নিখাদ ফিজিক্যাল ও ক্যামিক্যাল রূপে ঘটা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আর এরূপেই প্রকাশিতও হয়। এই ইউনিভার্সাল মত সাপেক্ষে বস্তুর ইন্টালেকচুয়্যাল দিক থাকার বিষয়টা অবান্তর হয়ে পড়ে।[৮]

আর আমেরকিান কেমিষ্ট Abraham Cressy Morrison (1884 - 1951) বলেন :

> 'বুদ্ধিসম্পন্ন ও চিন্তাশীল মানবের আবির্ভাব আমাদের এরূপ কল্পনার অনেক উর্দ্ধে যে মনে করবো, এ আবির্ভাব জড়বস্তুর বিবর্তন ও ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে ঘটেছে এবং কোন এবং কোন স্রষ্টার হাত এতে হস্তক্ষেপ করেনি। অন্যথায় মানুষ হতো একটি যান্ত্রিক উপকরণমাত্র, যাকে অন্য কেউ এসে চালু করে এবং সচল রাখে। এখন দেখা যাক, ঐ চালক হাতটি হাতটি কে এবং সে হাতটি কার? বিজ্ঞান এখনো সক্ষম হয়নি উক্ত হাতের ব্যাখ্যা প্রদান করতে ও তাকে চিনতে। কিন্তু এ বিষয়টি জগতের কাছে সর্বসম্মত যে, এ চালকেব অস্তিত্ব স্বয়ং বস্তুদ্বারা গঠিত কোন যৌগ নয়।'[৯]

মুসলিম হাকিমবৃন্দ (দার্শনিকগণ)[১০] 'কার্যকারণ' বিষয়ে কিম্বা যেখানে প্রকৃতির বিরল ব্যাপারাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেখানে আত্মার শক্তি ও প্রভাবসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন। সাদরুল মুতাআল্লেহীন 'আসরার' গ্রন্থের কার্যকারণ তত্ত্বের আলোচনায় একটি চ্যাপ্টার রেখেছেন এই শিরোনামে 'চিন্তা ও কল্পনা কখনো কখনো কোন কোন কাজ সংঘটনের উৎস হয়।' এ অধ্যায়ে তাঁর উদ্দেশ্য হলো চিন্তা ও কল্পনা, যা জীবনের একটি লক্ষণ ও প্রকাশ- জড়বস্তুর ওপরে তার শাসনকর্তৃত্ব ও প্রভাব রয়েছে। এ আলোচনায় তিনি অসুস্থ রোগীর কানের কাছে বারবার সুস্থতার কথা পুনরাবৃত্তি করার ফলে তার সুস্থ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলার কথা উল্লেখ করেছেন। সংক্ষেপে কথা হলো- প্রাচীন ডিমোক্রিটাসীয় চিন্তার আজকের বিশ্বে কোন স্থান নেই, যে চিন্তায় বলা হতো ঃ বিশ্ব হলো স্রেফ একটি যান্ত্রিক বিশ্ব। আর সৃষ্টি হলো স্রেফ অণুর যোজন-বিয়োজন, সংমিশ্রণ ও বিভাজন বৈ অন্য কিছু নয়।

বিজ্ঞানীদের গবেষণা বস্তুবাদীদের অহঙ্কারকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করে দিয়েছে। এখন আর কেউ ডেকার্ট ও অন্যদের মতো বলতে পারবেন না যে, 'বস্তু ও গতিকে আমার হাতে দাও, আমি বিশ্ব গড়ে দেব।" বিশ্বের আদি উপাদান এতবেশি ও এত ব্যাপক গভীরে প্রোথিত যে, আমরা সেগুলোকে নিছক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ও গতির আরোপিত সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করতে পারি না।

জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে কোরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি

পূর্ববর্তী আলোচনায় আত্মা ও জীবন সম্পর্কে ইশারা করা হয়েছে। আলোচনাটি মূলত এ বিষয়ে কেন্দ্রিভূত ছিল যে, আত্মা ও জীবন কি জড়বস্তুর অপরাপর গুণের মতোই একটি গুণ? নাকি জড়বস্তু তার আপন সত্তায় জীবন ও জীবনী-গুণবৈশিষ্ট্য শুন্য? বরং জীবন নিজেই একটি রিয়েলিটি তথা বিশেষ গুণ ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবসম্পন্ন সারসত্য বাস্তবতা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তা জড়ের সাথে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত না হয়, ততক্ষণ 'জীবনী গুণ ও প্রভাব' বলতে আমরা যা বুঝি, তার উৎপত্তি হয় না?

আলোচনার এ পর্বটি ছিল দর্শনের আলোকে। তবে আল্লামা সাইয়্যেদ মোহাম্মদ হোসাইন তাবাতাবাঈ এ একই আলোচনা কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেও উপস্থাপন করেছেন। দেখা যাক, প্রাণ ও জীবন সম্পর্কে কোরআনের স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণটি কিরূপ। বিশেষ করে পরাপ্রকৃতি ও ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে জীবনের সম্পর্ক বিশ্লেষণে কোরআনের ভাষ্য কি?

কোরআনে প্রাণ ও জীবন সম্পর্কে উপর্যুপরি বর্ণনা এসেছে। এর অসংখ্য আয়াতে সৃষ্টির জীবিত হওয়া, জীবিতদের ক্রমধারায় উৎপত্তি লাভ করা, জীবনের ক্রমবিকাশ, জীবিতদের সৃষ্টিকার্যে যে নীতি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, জীবনের গুণ-প্রভাব যেমন বোধ, চৈতন্য, অনুভব, উপলব্ধি, শ্রবণ, দর্শন, প্রবৃত্তি, স্বভাব, স্বজ্ঞা, আধ্যাত্মিক পরিচালনা ইত্যাদি ব্যাপারগুলোকে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা (হিকমাত) ও মাত্রা নির্ধারণ (তাকদীর) এর নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করার অবকাশ রয়েছে, তবে আপাতত আমরা জীবন সম্পর্কিত কোরআনিক আলোচনার বাইরে যাব না। জীবন সম্পর্কে কোরআনে উল্লিখিত একটি বিষয় হলো 'জীবন আল্লাহর হাতে। আল্লাহই জীবন দান করেন এবং তিনিই তা ফিরিয়ে নেন।' কোরআন তার এ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বলতে চায় যে, জীবন আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো হাতে নেই। অন্য কেউ জীবন দিতে বা জীবন ফিরিয়ে নিতে পারে না। এ বিষয়টিই এখানে আমাদের আলোচ্য।

সূরা বাকারায় নবী ইবরাহীমের জবানিতে তৎকালীন নাস্তিক ও স্বৈরাচারী শাসককে বলা হয়েছে : 'আমার প্রতিপালক হলেন তিনি, যিনি জীবন দেন ও মৃত্যু দেন।'[১১] সূরা মুলক এ আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এভাবে : 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন।' কোরআনে এরূপ অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে আল্লাহকেই একমাত্র মৃত্যুদাতা ও জীবন দাতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেউ এ কাজে সক্ষম নয়। আর কোন কোন নবীর হাতে মৃত ব্যক্তির জীবিত হওয়ার ঘটনা যেসব আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে, সেখানে তৎক্ষণাৎ একথাও বলা হয়েছে যে, এটা তিনি করেছেন আল্লাহরই অনুমতিক্রমে। যেমন সূরা আলে ইমরান এর ৪৯ নং আয়াতে এসেছে : 'এবং (তিনি) বনি ইসরাঈলদের জন্যে তাকে রাসুল করবেন। সে বলবে, আমি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন এনেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা একটি পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করব। অতঃপর আমি তাতে ফুঁ দিব, ফলে আল্লাহর অনুমতিক্রমে সেটা পাখী হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবন্ত করব..।'

সামগ্রিকভাবে ঈশ্বরবাদী ও নাস্তিকদের মাঝে একটি মতপার্থক্যের বিষয় হলো এটা যে, ঈশ্বরবাদীরা জীবনের উৎপত্তি ও স্রষ্টা, জড়ের বহির্ভূত কোন উৎস থেকে বলে মনে করেন। অপরদিকে জড়বাদীরা খোদ

Dhaka University Institutional Repository

জড়বস্তুকেই জীবনের স্রষ্টা বলে মনে করেন। এখানে জীবনের স্রষ্টা ঈশ্বর বলে সাধারণ ঈশ্বরবাদীদের অভিমতের সাথে কোরআনের বক্তব্যের একটা মিল থাকলেও এর মধ্যেই অতি সূক্ষ্ম তবে বিশদ একটি পার্থক্য বিদ্যমান। যা কোরআনের অলৌকিকতারই একটি সনদ বটে। আমাদের বিশ্বাস, যদি ঈশ্বরবাদী বিজ্ঞানীরা এ ধ্যান-ধারণার সাথে পরিচিত হন, তাহলে চিরকালের জন্যে তারা নিজেদেরকে বস্তুবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন। একইভাবে ঐ সকল বেচারাদেরকেও তাদের ভ্রান্ত কল্পনা ও খেয়ালের বিলাস থেকে বের করে আনতে সক্ষম হবেন।

সচরাচর বিজ্ঞানীরা যখন 'জীবন' এর বিষয়টিকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করতে চান, তখন পৃথিবী পৃষ্ঠে জীবনের সূচনা ও উৎপত্তির প্রসঙ্গটি সামনে টেনে আনেন। তারা বিষয়টি একটি প্রশ্নের আকারে উত্থাপন করেন যে, 'জীবন ও প্রাণ সর্বপ্রথমবার কিভাবে উৎপত্তি লাভ করে?' বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক নমুনা ও নিদর্শন থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, পৃথিবী পৃষ্ঠে জীবনের আবির্ভাব ঘটে একটি সূচনা'র মাধ্যমে। অর্থাৎ মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালাসহ কোন জীবই অতীতে অনাদিকাল ধরে বিদ্যমান ছিল না। কারণ, স্বয়ং পৃথিবীরই বয়স নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। তাছাড়া, এই চারশ' কোটি বছরের পুরো সময়টা জুড়ে জীব ও প্রাণীদের বসবাসের উপযোগী ছিল- তাও না। সুতরাং, এখানে প্রথমবার প্রাণের অস্তিত্ব কিভাবে এলো?

আমাদের পর্যবেক্ষণ দেখে থাকি যে, সবসময় প্রত্যেক ব্যক্তি তারই স্বপ্রজাতির আরেক ব্যক্তি থেকে জন্ম নিয়ে থাকে। গম জন্ম নেয় গম থেকে, ভূট্টা জন্ম নেয় ভুট্টা থেকে, তদ্রুপ ঘোড়া জন্ম নেয় ঘোড়া থেকে, গাধা জন্ম নেয় গাধা আর মানুষ জন্ম নেয় মানুষ থেকে। অর্থাৎ প্রকৃতি সম্পূর্ণ আপনা থেকে কোন নিখাদ স্তুপ থেকে একটি প্রাণী বা একটি গাছ জন্ম দেয়ার পক্ষপাতি নয়। মোদ্দাকথা, সর্বদা একটি জীবন্ত অস্তিত্বের জন্ম হয়েছে আরেকটি জীবন্ত অস্তিত্ব থেকে। যা তার থেকে বীর্য অথবা ডিম হিসাবে নিঃসৃত হয় এবং একটি উপযুক্ত স্থানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে।

কিন্তু শুরুতে কি ঘটেছিল এবং কিসের মাধ্যমে তা সংঘটিত হয়েছিল? এই যে অগণিত প্রাণীকুল- এসবই কি একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত যিনি এদের উৎসমূল? যদি তাই হয় তাহলে স্বয়ং উক্ত ব্যক্তি কিভাবে এবং কিসের মাধ্যমে উৎপত্তি লাভ করেছেন? প্রকৃতি তো বীর্য কিম্বা ডিম ছাড়া অর্থাৎ কোন জীবন্ত সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ব্যতীত প্রাণের উৎপত্তি সংঘটিত হওয়ার বিরোধী। সুতরাং, অগত্যা একথাই বলতে হবে যে, এক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম ঘটনা অর্থাৎ পরিভাষাগত ভাবে বলতে হয়, কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে এবং ঈশ্বরের শক্তিমান হাত আস্তিন থেকে বের হয়ে এসে ঐ ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেছেন।

আর নচেৎ এ সকল প্রজাতি একই মূল থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছে এবং এদের সকলের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক বিদ্যমান? কিন্তু একথা বললেও পুনরায় ঐ একই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, মূল উৎসের ঐ ব্যক্তিটি কিভাবে এলো? বিজ্ঞান সর্বসম্মতভাবে তো প্রমাণ করেছে যে, জীবন্ত কিছু আরেকটি জীবন্ত অস্তিত্বের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে ছাড়া উৎপত্তি লাভ করতে পারে না? তাহলে কি কোন ব্যতিক্রম ও অলৌকিকতা ঘটে গেছে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা এখানে হস্তক্ষেপ করেছে ও অকস্মাৎ কোন জীবন্ত কোষের সৃষ্টি হয়েছে?!

এখানে এসেই বস্তুবাদী দর্শনের সমর্থকরা বাধ্য হন এমন সব থিওরী দাঁড় করতে যা তাদের নিজেদের জন্যেও গ্রহণীয় হয় না। আর ঈশ্বরবাদীরা বিপরীতক্রমে একে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, নিশ্চয় সর্বপ্রথম প্রাণের উৎপত্তির ক্ষেত্রে পরাপ্রাকৃতিক শক্তির হস্তক্ষেপ ছিল এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা এখানে আবির্ভূত হয়ে একে সৃষ্টি করেছে। যেমনভাবে ডারউইন, যিনি নিজে একজন ঈশ্বরবাদী হয়েও বিভিন্ন প্রজাতির উদগত হওয়াকে নিজের কাছে একভাবে সমাধান করার পর এবার উপনীত হন সেই জায়গায়, যেখানে দেখতে পান যে, পৃথিবীর বুকে একটি বা কয়েকটি জীবন্ত বস্তুর উৎপত্তি ঘটেছে অথচ অন্য কোন জীবন্ত বস্তু থেকে তা নিঃসৃত হয়নি। তখন বলেন : 'এগুলো তাহলে ঐশ্বরিক ফুঁৎকারে জীবন লাভ করেছে।'

এ প্রসঙ্গে Cressy Morison আরো বলেন :

> 'কেউ কেউ বলেন জীবনের কীটটি কেন একটি গ্রহ থেকে পলায়ন করেছে। অতঃপর সুদীর্ঘকাল ধরে মহাশূন্যে দিশেহারাভাবে বিরাজ করতে থাকে। অবশেষে পৃথিবীতে অবতরণ করে। এ বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, জীবনের কীট মহাশূন্যের নিরঙ্কুশ ঠাণ্ডার মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে এটা অসম্ভব কথা। আর যদি ধরেও নিই যে, ভাগ্যের জোরে এ যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেল, কিন্তু মহাশূন্যে ছড়িয়ে থাকা মারাত্মক সব রশ্মি নিশ্চয় তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে। আর যদি এবারও ধরে নিই যে ভাগ্যের জোরে এ ধাপটাও পার পেয়ে গেল, তাহলে আকস্মিকতার ভিত্তিতে একটি অতীব উপযুক্ততম জায়গা যেমন সাগরের সুগভীরে, যেখানে একাধিক অনুকূল উপাদান ও পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে, সেখানেই অবতরণ করেছে, যাতে তার জীবন ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং পৃথিবীর জীবচরাচরের উৎপত্তি ঘটাতে পেরেছে। এতকিছু অসুবিধার পরে এবার সবে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, জীবনের মূলকথা কি এবং অন্য গ্রহসমূহে কিভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে? আজ সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত ও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, জীবনের জন্যে যতই অনুকূল ও উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান থাকুক না কেন, জীবন সৃষ্টি করা যায় না। তদ্রুপ কোনরূপ রাসায়নিক উপাদানসমূহের সংমিশ্রণ ও ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমেও জীবন কীট উৎপন্ন করা যায় না। যেমনটা বলেছি, জীবনের বিষয়টি এখনো একটি বিজ্ঞানের সমাধান না হওয়া বিষয়।
>
> কেউ কেউ বলেন, বস্তুর খুবই ক্ষুদ্রতম কণা যা কোন অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও দেখা যায় না, তা পরমাণুর অগণিত কণার সাথে একত্র হয়ে সেগুলোর সমীকরণকে ভেঙ্গে দিয়ে সেগুলোর অংশাবলীর যোগ বিয়োগের মাধ্যমে নিজের মধ্যে জীবন সঞ্চারিত করেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও অদ্যাবধি কেউই দাবী করেন নি যে, এই ক্রিয়া-বিক্রিয়ার কারণেই জীবনের উৎপত্তি ঘটেছে।'[১২]

Cressy Morison এর এ বক্তব্য থেকে তাঁর উদ্দেশ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, জীবনের সৃষ্টি ও উৎপত্তির ব্যাপারে কোন স্রষ্টার হাত সক্রিয় ছিল। কারণ, বস্তুগত ও প্রাকৃতিক কারণাবলী দ্বারা তা ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। তিনি মানবের উৎপত্তি এবং যেসব দীর্ঘ বিবর্তন প্রক্রিয়া পার হয়ে তবে একটি চিন্তাশীল

Dhaka University Institutional Repository

মস্তিষ্কবান অসাধারণ এ অস্তিত্বের অভ্যুদয় ঘটেছে, যে বিজ্ঞানকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে তার সম্পর্কে তিনি বলেন :

> 'বুদ্ধিসম্পন্ন ও চিন্তাশীল মানবের আবির্ভাব আমাদের এরূপ কল্পনার অনেক উর্দ্ধে যে মনে করবো, এ আবির্ভাব জড়বস্তুর বিবর্তন ও ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে ঘটেছে এবং কোন এবং কোন স্রষ্টার হাত এতে হস্তক্ষেপ করেনি।'

-এ ছিল এ দলের লোকদের বিশ্বাসে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে জীবনের সম্পর্কের নমুনা। এ সংক্রান্ত অন্যান্য যেসব মতবাদ রয়েছে সেগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রায় এ বক্তব্যেরই অনুরূপ বিধায় সেগুলো নিয়ে আর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

আমরা জানি যে, অদ্যাবধি মানুষ যতই চেষ্টা চালিয়েছে, বৈজ্ঞানিক উপকরণ দ্বারা কোন জীবন্ত জিনিস তৈরী করতে সক্ষম হয়নি। যেমন কোন কেমিক্যাল দ্বারা এমন কোন গম আবিষ্কার করতে পারেনি যা জীবনীগুণ সম্পন্ন হবে এবং সেটাকে যদি বপণ করা হয় তাহলে তা সুবজ চারা ও ফলবান গাছে পরিণত হবে। কিম্বা এমন কোন প্রাণী অথবা মানুষের বীর্য আবিস্কার করতে পারেনি, যা একটি প্রাণী বা মানুষে পরিণত করা সম্ভব হয়। তবে বিজ্ঞানীরা এব্যাপারে চেষ্টা ও প্রয়াস চালাতে কোন সময় থেমে থাকেনি এবং এখানো শক্তির মহড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। যদিও এখনো পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের জন্যে স্পষ্ট হয়নি যে, ভবিষ্যতে কি একাজে তারা সফলকাম হবেন, নাকি আসলে তা মানুষের বিজ্ঞান ও শিল্প ক্ষমতার সীমা পরিধির বহির্ভূত।

এই যে বিষয়টি ভবিষ্যতের সাথেও সম্পর্কিত, সেটাও জীবনের সূচনার বিষয়ের মতোই হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে এবং অনিবার্য ভাবে ঈশ্বরবাদীদের মধ্যে যে দলটি বলে থাকেন 'জীবন ও প্রাণ' আল্লাহরই হাতে এবং আল্লাহর ইচ্ছার সাথে জীবনের সম্পর্কে বিশ্লেষণে যারা ঐরূপ ধ্যান-ধারণা পোষণ করা যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, এ বিষয়েও তারা এ অভিমত প্রকাশ করে থাকেন যে, এ ব্যাপারে মানুষের চেষ্টায় কোন ফল হবে না। কারণ, জীবনের কর্তৃত্ব মানুষের হাতে নেই। এটা আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। মানুষ নিজের ইচ্ছায় এবং বৈজ্ঞানিক ও শিল্প উপকরণাদি দ্বারা যখনই ইচ্ছা জীবনও প্রাণ সৃষ্টি করতে পারে না। স্বয়ং নবী রাসুলরাও যে মৃত জড়বস্তুর মধ্যে জীবন দান করতেন, সেটাও আল্লাহর অনুমতিক্রমেই হতো। কেউ যদি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এরূপ কোন কাজ করতে চায়, তাহলে তা সম্ভব নয়। আলবৎ অসম্ভব। আর যদি আল্লাহর অনুমতিক্রমেও করতে চায় তবুও তাকে হতে হবে ঐশীপুরুষের সমকাতারের লোক, যে মু'জিযা প্রদর্শন করবে। যদিও আল্লাহ কেবল স্বীয় আম্বিয়া ও আউলিয়া বৃন্দের হাতে ছাড়া কোন মু'জিযা প্রদর্শন করান না।

এ দলটি মানুষের বর্তমান অক্ষমতাকেই নিজেদের দাবীর পক্ষে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন যে, দেখুন মানুষ গম আবিষ্কার করে, যা রাসায়নিক উপাদানের দিক দিয়ে প্রাকৃতিক গমের সাথে কোন পার্থক্য নেই। হুবহু একরকম। অথচ তার মধ্যে জীবন নেই। এটা একারণে যে, জীবন হলো আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত

Dhaka University Institutional Repository

এবং অবশ্যই আল্লাহর অনুমতি আসতে হবে। তিনি স্বীয় নবীদের ছাড়া কাউকে এ অনুমতি প্রদান করেন না।

পবিত্র কোরআনও স্পষ্টতই ঘোষণা করে : 'জীবন হলো আল্লাহর হাতে' এবং জীবন সৃষ্টিতে অন্যের হস্ত ক্ষেপ নাকচ করা হয়েছে। কিন্তু কোরআনের কোথাও দেখা যায় না যে, এ কথা প্রমাণ করার জন্যে মানুষের কিম্বা অপরাপর প্রাণীকুলের জীবনের সূচনা কবে কিভাবে হয়েছিল সেই গোড়ার কথা খুঁজে বেড়াবে; বরং বিদ্যমান ও দৃশ্যমান এ সিষ্টেমকেই সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং জীবন ও প্রাণের এ চলমান সিষ্টেমকেই সৃষ্টি ও উৎপত্তি এবং পূর্ণতার সিষ্টেম বলে আখ্যায়িত করে। কোরআন বলে : জীবন আল্লাহর হাতে। জীবনের স্রষ্টা আল্লাহই। কিন্তু যখন জীবনের প্রশ্নে আল্লাহকেই স্রষ্টা হিসাবে প্রমাণ করতে চায়, তখন সৃষ্টির গোড়ার খোঁজে যায় না এবং এ ব্যাপারে প্রথমবার এবং পরবর্তী বারের মধ্যে কোন পার্থক্য মানে না; বরং, বলে, জীবনের এ সুশৃঙ্খল ক্রমবিকাশই হলো সৃষ্টির ক্রমবিকাশ। যেমন সূরা মুমিনের ১২-১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

> 'আমি তো মানুষকে মাটির উপাদান হতে সৃষ্টি করেছি, অত:পর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে এক নিরাপদ আধারে স্থাপন করি। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে, অতঃপর অস্থিঃপঞ্জরকে মাংস দ্বারা ঢেকে দেই, অবশেষে ওকে আরো একরূপ দান করি। সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান!'

এ আয়াতে মানব ভ্রূণের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের ধারাকে নির্দিষ্ট একটি সিষ্টেমের আওতায় উল্লেখ করে এবং এই ক্রমবিকাশের ধারাকেই পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির ক্রমধারা বলে অভিহিত করে। সূরা নূহের ১৩ ও ১৪ নং আয়াতে এসেছে:

> তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাইছ না? তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ক্রমধারায় (ধীরে ধীরে)

অন্যত্র সূরা যুমার এর ৬ নং আয়াতে এসেছে :

> 'তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে, পর্যায়ক্রমে ত্রিবিধ অন্ধকারের মধ্যে'

তদ্রুপ সূরা বাকারার ২৮ নং আয়াতে এসেছে :

> 'তোমরা কি করে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদের প্রাণ দিয়েছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন, পরিণামে তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরতে হবে।'

আর সূরা হজ্জের ৬৬ নং আয়াতে এসেছে :

> 'এবং তিনি তো তোমাদের জীবন দান করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তোমাদের জীবন দান করবেন...'

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়ের ওপরে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। সে সবগুলো আয়াতেই এ চলমান ও দৃশ্যমান সিষ্টেমকেই system of creation বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ভূ-গর্ভে বীজদানা ফেটে গিয়ে মাটি ফুঁড়ে সবুজ চারা বের হয়ে আসা, বসন্তে গাছগাছালির হরিৎ বর্ণ ধারণ করা ইত্যাদি সবই নতুন সৃষ্টি এবং পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টিকার্য রূপে অভিহিত করা হয়েছে। কোথাও চোখে পড়ে না যে, জীবন সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর সৃষ্টি কার্য ও ইচ্ছাকে শুধু প্রথম মানুষটির বেলায়ই কিম্বা পৃথিবী পৃষ্ঠে উৎপত্তি হওয়া প্রথম প্রাণীটির বেলায়ই সীমাবদ্ধ বলে গণ্য করবে এবং ঐ একটিমাত্র ব্যক্তি বা বীজদানাকেই শুধু আল্লাহর সৃষ্টি ও আল্লাহর ইচ্ছাপ্রসূত বলে পরিচয় দেবে।

কোরআনের একটি অদ্ভুত বিষয় হলো হযরত আদমের কাহিনীতে অনেক চারিত্রিক ও শিষ্টাচারমূলক শিক্ষা উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন : মানুষের জন্যে আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্যতা, জ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের অমিত প্রতিভা, জ্ঞানের সামনে ফেরেশতাদের বিনয়াবনত হওয়া, মানুষের মধ্যে ফেরেশতাদের ছাড়িয়ে যাওয়ার সামর্থ্য, লোভের ক্ষতি, অহঙ্কারের ক্ষতি, মানুষের উচ্চতর স্থান থেকে পতনের ক্ষেত্রে পাপের ভূমিকা, মানুষের মুক্তির ক্ষেত্রে এবং আল্লাহর নৈকট্যে প্রত্যাবর্তনে তওবার অবদান, শয়তানের পথভ্রষ্টকারী প্রলোভনে মানুষের মোহাসক্তি ইত্যাদি। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও কোনক্রমেই আদম সৃষ্টির বিশেষ ও ব্যতিক্রম ঘটনাকে আল্লাহ ও স্রষ্টা পরিচিতির আলোচনার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়নি। আর যেহেতু আদমের কাহিনী বর্ণনা করার পেছনে উদ্দেশ্য হলো এক শ্রেণীর চারিত্রিক ও শিষ্টাচারমূলক শিক্ষার কথা তুলে ধরা, এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার জন্যে জীবনের সূচনা সম্পর্কে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনার্থে নয়; সেকারণে কেবল প্রথম আদমের কথা উল্লেখ করেই নিবৃত্ত হয়েছে এবং অন্যান্য জীবজন্তুর জীবনের সূচনা এ পৃথিবীতে কিভাবে হয়েছিল সে বিষয়ে কোন আলোচনাই করা হয়নি।

ইতোপূর্বে যেমনটা বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরবাদীরা যখনই প্রথম জীবটির অনুসন্ধানে নামে এবং তার জীবনের ব্যাখ্যার কোন উপায় খুঁজে পায় না, তখন বলে : 'সে তো খোদায়ী ফুঁৎকারে সৃষ্টি হয়েছে।' কিন্তু কোরআন যেভাবে প্রথম মানবের জীবনকে খোদায়ী ফুঁৎকারে বলে জানে, তদ্রুপ বাদবাকি সকল মানুষের জীবনকেও খোদায়ী ফুঁৎকারে বলে জানে, যা চলমান নিয়ম অনুযায়ী ঘটে চলেছে।

এক জায়গায় প্রথম মানব সম্পর্কে ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য করে কোরআনের সূরা হিজর-এর ২৯ নং আয়াতে এবং সূরা সা'দ এর ৭২ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

> 'যখন আমি ওকে সুঠাম করেছি এবং ওতে আমার রুহ্ ফুঁকে দেই তখন তোমরা ওর প্রতি সিজদাবনত হও।'

অন্যত্র সূরা আ'রাফ-এর ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

> 'আমিই তোমাদের সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের মানবাকারে রূপদান করি এবং তারপর ফেরেশতাদের আদমের সম্মানে বিনত হতে বলি।'

Dhaka University Institutional Repository

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ আয়াতে সৃষ্টি, রূহ ফুঁকে দেয়া এবং ফেরেশতাদের বিনয়াবন হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো সকল প্রজন্মের সকল মানবের বেলায়ই প্রযোজ্য। সূরা সাজদা'র ৭-৯ নং আয়াতে এসেছে :

> 'যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উত্তম রূপে সৃজন করেছেন এবং মাটি হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে তার বংশ উৎপন্ন করেন। পরে তিনি ওকে সুঠাম করেছেন এবং তার নিকট হতে ওতে জীবন সঞ্চার করেছেন এবং তোমাদের দিয়েছেন চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণ। তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।'

কোরআনের বিশারদ যারা, তারা সবাই একমত যে, এ আয়াতে 'ওকে সুঠাম করেছেন' কথাটি দ্বারা মানবকে বুঝানো হয়নি। বরং বুঝানো হয়েছে 'তার বংশ' কে।

এ পর্যায়ে একটা বিষয়ের কারণ উদঘাটিত হওয়া দরকার যে, কেন ঈশ্বরবাদীরা সচরাচর যখনই 'জীবন ও প্রাণ' এর ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করতে চান, তখন অমনি জীবনের উৎপত্তির গোড়ার কথায় চলে যান, অথচ কোরআন কেন তার একত্ববাদী পন্থায় কখনো এ পন্থা অবলম্বন করেনি। বরং জীবন ও প্রাণের বিকাশের বিষয়টিকে পুরোপুরি সর্বতভাবে আল্লাহর ইচ্ছার সরাসরি ফল বলে জানে। এক্ষেত্রে জীবনের সূচনা ও জীবনের অব্যাহত থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য করা ছাড়াই।

সত্য কথাটা হলো এই যে, এ পার্থক্যটি কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য থেকেই জন্ম নিয়েছে। ঐ ঈশ্বরবাদীরা চান তাদের জ্ঞাত বিষয়াবলীর (জ্ঞানের) নেতিবাচক দিক দিয়ে আল্লাহর জ্ঞানে পৌছতে। ইতিবাচক দিক দিয়ে নয়। অর্থাৎ যেই মাত্র অজানা ও অজ্ঞাত বিষয়ে আটকা পড়েন, অমনি আল্লাহকে টেনে আনেন। সবসময় তারা আল্লাহকে তাদের অজানার মধ্যেই হাতড়ে বেড়ান। অর্থাৎ সবসময় এমন সব জিনিসের পেছনে যান, যেগুলোর স্বাভাবিক কারণ জানেন না। অতঃপর যখন কোন একটি নির্দিষ্ট ব্যাপারে একটি জিনিসের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক কারণ তাদের কাছে অজানা থেকে যায়, অমনি বলে ওঠেন : 'এটা তো আল্লাহর ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে!'

আর অনিবার্যতই বস্তুর স্বাভাবিক কারণসমূহ জ্ঞাত হওয়ার ব্যাপারে তাদের অজানার পরিমাণ যত বেশি হবে, ততই তাদের ঈশ্বরবাদের প্রমাণসমূহ বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে তাদের জানার পরিমাণ যত বাড়তে থাকবে, ততই তাদের ঈশ্বরাদের মাত্রা হ্রাস পাবে। একদল ঈশ্বরবাদী ও একত্ববাদীর কাছে পরাপ্রকৃতি হলো একটি গোডাউনের মতো, তাদের অজানাগুলোর জন্যে। কোন কিছু না জানলেই এবং না বুঝলেই আর তার স্বাভাবিক কারণ জ্ঞাত না হতে পারলেই অমনি সেটাকে পরাপ্রকৃতির সাথে জুড়ে দেয়। অর্থাৎ তারা পরাপ্রকৃতির প্রভাবকে সেসব ক্ষেত্রেই কার্যকরী মনে করে, যেখানে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কোন ব্যতিক্রম সংঘটিত হয়েছে এবং নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে তথা নিয়ম বহির্ভূত কিছু ঘটেছে। একারণে যখনই কোন বিষয়ে প্রাকৃতিক কারণকে খুঁজে পায়নি, তখনই একটি পরাপ্রাকৃতিক কারণকে সেখানে স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছে। অথচ তারা এ ব্যাপারে বে-খেয়াল যে, প্রথমত: পরাপ্রকৃতিরও নিজের জন্যে নিয়ম কানুন ও হিসাব রয়েছে এবং দ্বিতীয়ত: যদি একটি কারণ কোন বস্তুগত ও প্রাকৃতিক কারণের স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহলে সেটা

Dhaka University Institutional Repository

আর পরাপ্রাকৃতিক থাকে না। প্রকৃতি ও পরাপ্রকৃতি একে অপরের ধারাবাহিকতায় অবস্থান করে, বিপরীতে নয়। একটি প্রাকৃতিক কারণ যেমন পারে না কোন পরাপ্রাকৃতিক কারণের স্থলাভিষিক্ত হতে, তদ্রুপ একটি পরাপ্রাকৃতিক কারণও পারে না কোন প্রাকৃতিক কারণের পর্যায়ে স্থান গ্রহণ করতে।

কোরআন কখনোই যেসব জায়গায় ধারণা করা হয় যে, নিয়ম বহির্ভূত বা হিসাবের বাইরে কিছু ঘটেছে, সেগুলো দ্বারা ঈশ্বরবাদ প্রমাণ করার কাজে ব্যবহার করেনি। বরং, সেগুলোকেই একাজে ব্যবহার করে থাকে যেগুলোর স্বাভাবিক কারণ ও গ্রাউণ্ড মানুষের জানা। আর খোদ এ শৃঙ্খলাকেই সাক্ষ্য হিসাবে তুলে ধরে।

জীবনের প্রসঙ্গেও কোরআনের অবস্থান এ ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত যে, জীবন সর্বতভাবেই একটি উৎকৃষ্ট ও উচ্চতর জগত থেকে প্রাপ্ত অনুগ্রহস্বরূপ, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থিক জগতের উর্দ্ধে। এ অনুগ্রহ যে নিয়ম বা যে বিধানের অধীনেই আসুক না কেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় জগতের উর্দ্ধে অবস্থিত কোন দিগন্ত থেকেই তার উৎসারণ। এজন্যে জীবনের বিকাশ হলো সৃষ্টি, উৎপত্তি, পরিপূর্ণতা ও বিবর্তনেরই স্বরূপ।

অবশ্য, এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে জীবন আকস্মিকভাবেই পৃথিবীতে উৎপত্তি লাভ করুক আর পযায়ক্রমিক বিবর্তনের মাধ্যমেই ঘটুক (কোরআনের আয়াতে যার ইশারা পাওয়া যায়)- এতে কোন পার্থক্য নেই। এ যুক্তিটি প্রতিষ্ঠিত সেই ভিত্তির ওপরে, যেখানে বলা হয় যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়বস্তু তার নিজ সত্তায় জীবন শুন্য। আর জীবন হলো একটি বিশেষ অনুগ্রহের দ্যুতি স্বরূপ যা উর্দ্ধজগত থেকে উৎসারিত হতে হবে। সুতরাং জীবনের নিয়ম যেভাবে ও যে রূপেই থাকুক না কেন, ঐ সৃষ্টিরই নিয়মভুক্ত।

জড়বস্তু ও জীবনের মধ্যে অস্তিত্বের মাত্রাগত পার্থক্য হলো একটি তাত্ত্বিক ও প্রমাণনির্ভর বিষয়। আমরা যদি এদুয়ের অস্তিত্বের মাত্রাগত পার্থক্য নির্ণয়ের পথ ধরে জীবনের পরাপ্রাকৃতিক উৎসমূলের সন্ধান করি, তাহলে সেটা হবে আমাদের জানা বিষয় সমূহের মধ্য দিয়ে ইতিবাচক একটি উপলব্ধি। এগুলোর বহির্ভূত নেতিবাচক পথ নয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আল্লাহকে অনুসন্ধান করলাম আমাদের জ্ঞাত বিষয়াবলীর মধ্যে, অজ্ঞাত ও অজানার মধ্যে নয়। ফলে আমাদের আর এরূপ কিছু করার দরকার নেই যে, যেখানেই কোন স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক কারণ নির্ণয় করতে ব্যর্থ হবো অমনি পরাপ্রাকৃতিকে তার স্তর থেকে নামিয়ে এনে প্রকৃতির স্থলে স্থলাভিষিক্ত করবো। বরং অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে, কোন একটি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক কারণ বিদ্যমান। হয়তো আমাদের জ্ঞান (বিজ্ঞান) এখনো সেখানে পৌছতে সক্ষম হয় নি।

সাদরুল মুতাঅল্লেহীন তাঁর আসফার গ্রন্থের 'সিফর এ নাফস' এর মধ্যে এ বিষয়েই ফাখরুদ্দিন রাযীকে আক্রমণ করে বলেন : 'আমি অবাক হই এ লোকটি থেকে এবং তার মতো যারা, তাদের থেকে, তারা যখনই একত্ববাদের মূল বিষয়টি কিম্বা ধর্মের অন্য কোন মূল বিষয়কে প্রমাণ করতে চান, তখন শুধু এদিকে ধাবিত হন যে, এমন একটি জায়গা খুঁজে বের করবে, যেখানে স্বাভাবিক কারণটি অজ্ঞাত থাকে এবং তাদের ধারণা অনুসারে জাগতিক নিয়ম শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে থাকে এবং হিসাব নিকাশ বিপন্ন হয়ে গিয়ে থাকে।'[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

কোরআনের আয়াতমালার সাহায্য নিয়ে যে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি হলো 'সৃষ্টি' কোন মুহূর্তের ব্যাপার নয়। একটি প্রাণী বা একজন মানুষ তার পর্যায়ক্রমিক পূর্ণতার পথে চলতে চলতে সর্বদা সৃষ্টির মধ্যে থাকে। বরং, মূলগতভাবে জগতটা সর্বদাই সৃষ্টি হওয়ার মধ্যে এবং উৎপত্তি ঘটার মধ্যেই রয়েছে।

এ দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সে অনুযায়ী সৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করা হয় একটি 'মুহূর্ত' এর মধ্যে। তাই যখনই তাদের সামনে জগতের সৃষ্টির প্রসঙ্গে কথা ওঠে, অমনি প্রথম সৃষ্টির সে গোড়ার মুহূর্তের খোঁজ করতেই তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে, যে মুহূর্তে জগত সৃষ্টি হয়েছির এবং শুন্য থেকে উৎপত্তি লাভ করেছিল। যেন মনে হয়, যদি এরূপ চিন্তা না করে তাহলে বুঝি জগতটা 'সৃষ্টি' নয়। তদ্রুপ যখনই 'জীবন' সম্পর্কে আলোচনা ওঠে অমনি ছুটে যায় সেই প্রথম মুহূর্তটির অনুসন্ধানে, যখন প্রথমবার 'জীবন' এর সূচনা হয়।

চিন্তার এ ধারাটি একটি ইয়াহুদী চিন্তা-পদ্ধতি। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, '(স্রষ্টা) আল্লাহর হাত বাঁধা।' কোরআনের ভাষায় : 'ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত বাঁধা। বাঁধা পড়ুক তাদেরই হাত এবং তারা যা বলে তার জন্যে তারা অভিশপ্ত। বরং, আল্লাহর উভয় হস্তই মুক্ত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন...'[১৪] তাই আল্লাহর ইচ্ছার সাথে 'জীবন' এর সম্পর্ক প্রসঙ্গে ঐ যে দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে সবসময় জীবনের সূচনা কবে তার পেছনে দৌড়াতে হয়- এটা আসলে এ ইয়াহূদী চিন্তাধারা থেকেই এসেছে। এ ইয়াহুদী চিন্তাধারা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং দুঃখজনকভাবে মুসলিম তাত্ত্বিকরাও এ থেকে রক্ষা পাননি। অথচ, আমরা লক্ষ্য করলাম যে, কোরআনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রথম বা গোড়ার 'মুহূর্ত'র কোনই গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি।

ইতোপূর্বে ইশারা করা হয়েছে যে, আমাদের যুগে একটি প্রশ্ন করা হয় যে, মানুষ কি জীবন্ত কিছু তৈরী করতে সক্ষম হবে? অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ মানুষ কি মানুষের কৃত্রিম বীর্য তৈরী করতে সক্ষম হবে যা মাতৃগর্ভে কিম্বা অন্য কোন উপযুক্ত পরিবেশে স্থাপন করলে একটি পূর্ণ মানুষে রূপান্তরিত হবে? এর উত্তরে বলা হয়েছে, একদল ঈশ্বরবাদী, যারা আল্লাহর সাথে জীবনের সম্পর্ক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কেবল(তাদের ভাষায়) ব্যতিক্রম ও নিয়ম বহির্ভূত বিষয়গুলোর দিকে ও জীবনের উৎপত্তির গোড়ার মুহূর্তটির দিকে তাদের দৃষ্টি ও চিন্তাকে সীমাবদ্ধ রাখেন, তারা কট্টরভাবে এ সম্ভাবনার কথা নাকচ করে দেন এবং এমন ধারণার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু আমরা কোরআন থেকে শিক্ষা লাভ করি যে, এমনটা হতেই পারে, এতে কোন সমস্যা নেই। তবে, বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলার দরকার। ব্যাখ্যাটি দু'দিক থেকে হওয়া প্রয়োজন :

একটি হলো জীবন্ত জিনিসের গঠন প্রকৃতির জটিল ও সুক্ষ্ম দিকটি। অর্থাৎ এর গঠন প্রকৃতি কি মাত্রায় জটিল বিষয় যে, মানুষ কি কোনদিন সক্ষম হবে একটি জীবন্ত কোষের ভেতরে যে অংশ ও উপাদানসমূহের নিগুঢ় সমীকরণ ও সমন্বয় প্রয়োগ করা হয়েছে তার যাবতীয় রহস্যের ভেদ করতে এবং একটি জীবন্ত কোষ

Dhaka University Institutional Repository

উৎপত্তির প্রাকৃতিক যে নিয়ম তা উদঘাটন করতে? নাকি কখনোই তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না? এদিক থেকে আমরা কোনক্রমেই অভিমত প্রকাশ করতে পারি না। কারণ, তা আমাদের যোগ্যতা ও সাধ্যের বহির্ভূত। যারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তারা যতটুকু বলেছেন, সেটা হলো 'যে জিনিসটি পৃথিবী, গ্রহতারা, সৌরজগত ও তামাম সৃষ্টিজগতের সৃষ্টির চেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, সেটা হলো প্রটোপ্লাজম (Protoplasm)।'

আরেকটি মত হলো, যদি কোনদিন মানুষ সফল হয় এবং জীবের সৃষ্টি রহস্যকে ভেদ করতে সক্ষম হয় (যেমনটা ইতমধ্যে অনেক অনেক সৃষ্টির বেলায় সফল হওয়া গেছে) এবং জীবন্ত জিনিসের সকল শর্তাবলী ও গঠন উপাদানের কথা জেনে ফেলে এবং হুবহু প্রাকৃতিক জীবন্ত বস্তু তৈরী করে ফেলে, তাহলে কি ঐ কৃত্রিম অস্তিত্ব জীবন লাভ করবে নাকি করবে না? এ প্রশ্নের উত্তর হলো : নির্ঘাত জীবন লাভ করবে। কারণ, এটা অসম্ভব যে, কোন প্রাণ সঞ্চারের সমুদয় শর্তাবলী বর্তমান থাকবে অথচ প্রাণ সঞ্চারণ সংঘটিত হবে না। কেন, একথা কি ঠিক নয় যে, পরাক্রমশালী নিরঙ্কুশ পূর্ণতার অধিকারী সে মহামহিম (আল্লাহ) নি:শর্তভাবে সকলের প্রতি অনুগ্রহশীল?

এখানে আবার সম্ভাবনা রয়েছে এ সংশয়টি মনে উদয় হতে পারে যে, যদি একথাই সত্য হয় তাহলে আগে যে বলা হলো জীবন কেবলই আল্লাহরই হাতে, জীবন ও মৃত্যুর সীমানায় আল্লাহ ভিন্ন অপর কারো প্রবেশের অনুমতি নেই- তার উপায় কি হবে? যে বিষয়টি কোরআনও গ্রহণ করেছে।

এ সংশয়ের সমাধান পূর্বোক্ত আলোচনা থেকেই অনায়াসে স্পষ্ট হয়ে যাবার কথা। যদি মানুষ কোন দিন এ সাফল্য অর্জন করে, নেহায়েত যে কাজটি সে করলো, সেটা হলো জীবনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশকেই সে প্রস্তুত করে দিল মাত্র। তার মানে এটা নয় যে, সে জীবন সৃষ্টি করলো। মানুষ জীবন দেয় না। বরং, জড়বস্তুর মধ্যে জীবন সঞ্চারের ক্ষেত্র ও সম্ভাবনাকে পূরণ করে মাত্র। অর্থাৎ মানুষ হলো গতির কর্তা (প্রস্তুতকারী), অস্তিত্ব দানকারী (স্রষ্টা) নয়।

মানুষ যদি কোনদিন এ সাফল্য অর্জন করে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিচারে সেটা নিঃসন্দেহে অনেক বড় একটি সাফল্য হবে বৈকি। কিন্তু জীবন উৎপত্তির প্রশ্নে হাত থাকার দিক দিয়ে বিচারে তাদের এ কাজটা ঠিক ততটুকুই, যতটুকু পিতা মাতা সন্তান জন্মদানের বেলায় করে থাকেন। কিম্বা একজন কৃষক করে থাকেন বীজ থেকে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে। কেননা, এগুলোর মধ্যে কোনটির বেলায় মানুষ জীবনের স্রষ্টা নয়। স্রেফ একটি জড়বস্তুকে 'জীবন' গ্রহণ করার উপযুক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন করে তোলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা ছাড়া। কোরআন এ ঘটনাকে সর্বোৎকৃষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছে এভাবে :

> 'তোমরা যে বীজ বপণ করো সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরাই কি ওকে অঙ্কুরিত করো, না আমি তা করি?'[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

'তোমরা কি ভেবেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? তা থেকে তোমরা সৃষ্টি করো, না আমি সৃষ্টি করি?'[১৬]

তবে নবীদের মু'জিযার কথা আলাদা। (যদিও তা এ বিচারে অলৌকিক হয় যে, মানুষ তার সাধারণ জ্ঞান ও শক্তি দ্বারা অনুরূপ কাজ সম্পন্ন করতে অক্ষম। নবীরাও সাধারণ পন্থায় উক্ত জ্ঞান ও শক্তি লাভ করেননি। এক অসাধারণ জ্ঞান ও শক্তি তাদের সঙ্গে ছিল এবং তাদেরকে প্রকৃতির সীমানা ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে, সে কারণেই তারা সক্ষম হয়েছেন ঐরূপ বিশাল কাজের সংঘটক হতে। মানুষ যদি কোনদিন এ উদ্দেশ্যে সফলকাম হয় তবে তার অর্থ এটা নয় যে, নবীরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে যে কাজ করেছেন তারাও সে কাজ করলো। নবীরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে জীবন দান করতেন এবং তা ফিরিয়েও নিতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ যদি কোনদিন কোন শক্তি অর্জন করে, জীবনের পরিবেশ ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে মাত্র। যেমনভাবে আজ 'মেরে ফেলা'র দিক দিয়ে জীবনের পরিবেশ ধ্বংস করার শক্তি সে অর্জন করেছে। কিন্তু, 'জীবন' সঞ্চার করার সাধ্য তার নেই। 'জীবন' সঞ্চার ও দান করা কেবল আল্লাহর হাতেই।

'জীবন দান' মানুষের কাজ নয়, মানুষের কর্মসীমার বহির্ভূত। 'জীবন দান' ও 'মৃত্যু দান' আল্লাহর হাতে। আর মানুষের কাজ হলো জীবনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা মাত্র।

তবে এ আলোচনা থেকে এমন (ভ্রান্ত) ধারণাও যেন না হয় যে, এভাবে বুঝি কাজের বন্টন করা হয়েছে। অর্থাৎ কিছু কাজ আল্লাহর, সেগুলো মানুষের নয়। বরং এখানে উদ্দেশ্য কেবল মানুষের কর্মসীমার পরিধি ও পরিসর তুলে ধরা। আল্লাহর কর্মসীমা নির্ধারণ করে দেওয়া নয়। নতুবা আল্লাহ তো নিরঙ্কুশ ও সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। সর্বত্রই তাঁর কর্তৃত্ব বিরাজমান।

এ ব্যাপারে আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হোসাইন তাবাতাবাঈ'র *The Principles of Philosophy and the Method of Realism* গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে সবিস্তরে আলোচনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা ও তথ্যসূত্র :

১. **Allama Tabatabaee,** *The Principles of Philosophy and the Method of Realism, Vol: 3*

২. **Dr. Murtaza Motahhary,** *Treatises on Philosophy, P 34;*

৩. *Man in a Chemical World (1973)*, by A. Cressy Morrison. Charles Scribner's Sons, New York and London, 1937. Pp. xi

৪. Lamarckism (or Lamarckian inheritance) is the idea that an organism can pass on characteristics that it acquired during its lifetime to its offspring (also known as heritability of acquired characteristics or soft inheritance). It is named after the French biologist Jean-Baptiste Lamarck (1744–1829), who incorporated the action of soft inheritance into his evolutionary theories. He is often incorrectly cited[*citation needed*] as the founder of soft inheritance, which proposes that individual efforts during the lifetime of the organisms were the main mechanism driving species to adaptation, as they supposedly would acquire adaptive changes and pass them on to offspring.

৫. **Dr. Mahmud Behjad** : *Darwinism,* Tehran, 5th edition, p 99.

৬. Hossein Kazemzadeh Iranshahr (1884-1962), Iranian Author & Diplomat, *Psychiastry*;

৭. ড. মূর্তাজা মোতাহহারী. *মাজমুআয়ে আছার*, সপ্তম প্রকাশ, সাদরা প্রকাশনী, তেহরান, ২০০৩, খ: ১৩, পৃ: ৪১

৮. **Oswald Ku lpe***(W B. 1872-1960 Pillsburg): Introduction to philosophy:* Traslated into Persian by Ahmad Aram, Tehran, 1965

৯. Abraham Cressy Morrison (1884 - 1951), ফার্সী অনুবাদ, মুহাম্মাদ সাঈদী, পৃ: ১৪৯,

১০. যেমন ইবনে সিনা ও তাঁর আল-ইশারাত গ্রন্থে

১১. আল কোরআন ২ ঃ ২৫৮:

১২. **Abraham Cressy Morrison** (1884 - 1951), ফার্সী অনুবাদ, মুহাম্মাদ সাঈদী,

১৩. *The Principles of Philosophy and the Method of Realism,*, V 3, p 220;

১৪. আল-কোরআন, ৫ ঃ ৬৪;

১৫. আল কোরআন, ৫৬ ঃ ৬৩-৬৪;

১৬. আল কোরআন, ৫৬ ঃ ৫৮-৫৯;

Dhaka University Institutional Repository

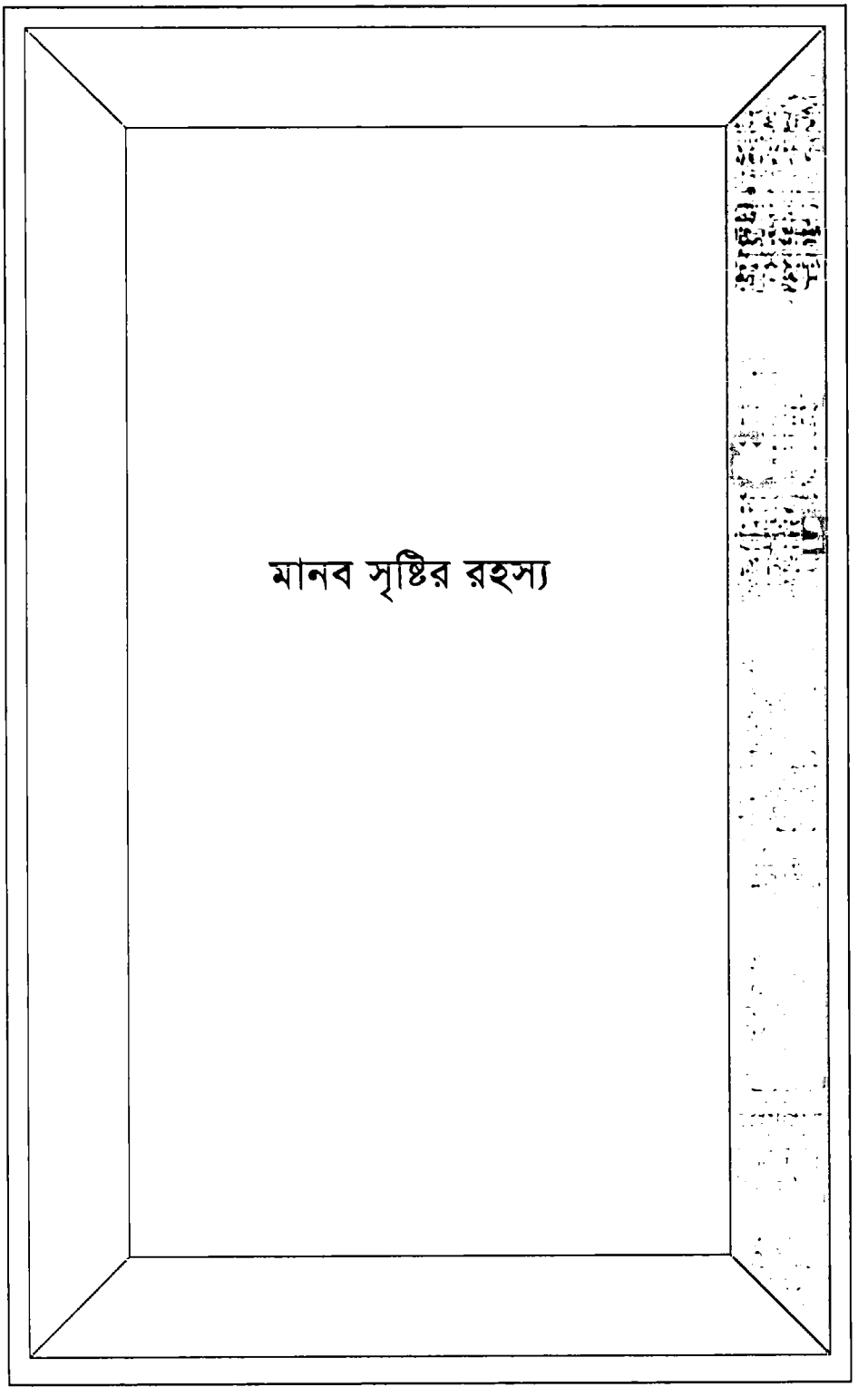

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা তাবাতাবাঈ'র দৃষ্টিতে মানব সৃষ্টির রহস্য

পরাপ্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়বাদ

এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা আল্লামা তাবাতাবাঈ'র দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করেছি যে, জগত ও জীবন প্রকৃতির জড়বস্তুর বিষয় নয়; বরং এক পরাপ্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা সৃষ্ট। একজন বাস্তববাদী দার্শনিক হিসাবে আল্লামা সে পরা প্রাকৃতিক শক্তিকে 'ঈশ্বর' (বা আল্লাহ) বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে পরাপ্রকৃতিকে অস্বীকার করে জগত ও জীবনের ব্যাখ্যা করার সকল দার্শনিক প্রবণতাই অচল। কেননা, যেখানে জীবনের অর্থ নেই, সেখানে মৃত্যুও অর্থহীন হয়। বিখ্যাত জার্মান সোসিওলজিস্ট ও পলিটিক্যাল ইকোনমিষ্ট Max Weber (1864-1920)[১] এ সত্য তুলে ধরেছেন নিম্নরূপে :

> 'সভ্য মানুষের কাছে মৃত্যুর কোন অর্থ নেই। এ কারণে যেহেতু মৃত্যুর অর্থ নেই, সভ্য মানুষের জীবনও একইরূপে অর্থহীন। কেননা, কার্যত অর্থহীন উন্নতি ও অগ্রগতির অবস্থায়, জীবন একটি অর্থহীন ঘটনায় পর্যবসিত হয়ে পড়ে। টলস্টয়ের সর্বশেষ রচনার সর্বত্র আমরা এ ধরনের চিন্তাধারার সাক্ষাৎ পাই, যা তার শিল্পে বিশেষ ছন্দ দান করেছে।'

আল্লামা তাবাতাবাঈ'র দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ ও জগতের সারসত্য বাস্তবতা এক অদ্বিতীয় আল্লাহর সাথে যোগ ও বন্ধন ছাড়া আর কিছু নয়। এ দুটিকে জানতে হলে আল্লাহকে জানা ছাড়া সম্ভব নয়।

যেহেতু মানুষ ও পরাপ্রকৃতির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র ও বন্ধন রয়েছে, কাজেই এ দুয়ের পরিচিতিও একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমনভাবে একজন ব্যক্তি মানুষ, যে তার নিজ ঐশ্বরিক সারসত্যকে উপলব্ধি করতে পারে, সে জগতের ঐশ্বরিক অন্তরভাগেও প্রবেশ করার পথ খুঁজে পায়। আত্মভোলা বে-খেয়ালী মানুষ, যে নিজেকে কেবল চিন্তার সীমানার মধ্যেই সন্ধান করে ফেরে, চূড়ান্ত পরিণতিতে সে জগতকে চিন্তা ও বুদ্ধির উর্ধ্বে দেখতে পায় না। এটা হলো সেই দাবী যা হেগেলের 'যা কিছু চিন্তনীয় নয় তার অস্তিত্ব নেই' এ বক্তব্য অস্বীকার করার মাধ্যমে জগতের সারসত্য চিন্তনীয় হওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন।

মানুষ যখন পরাপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন দৃষ্টি দিয়ে নিজের দিকে তাকায়, তখন অশেষ ঐশ্বরিক সোন্দর্য প্রত্যক্ষ করা থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে। আর এ উদাসীনতা ও বে-খেয়ালী অবস্থার মধ্যে বিরাজ করা যত দীর্ঘায়িত হয়, পরিণামে ততই সে ঐশ্বরিক সোন্দর্যকে অস্বীকার করে বসে। এ বিস্মৃতি ও ভুলে যাওয়া হলো নিজের ও জগতের সারসত্যকে ভুলে যাওয়া। কোরআনের ভাষায় : 'তারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের নিজেদের ভুলিয়ে দিয়েছেন।'[২] অর্থাৎ আল্লাহকে বিস্মৃত হওয়ার মাধ্যমে তারা

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদেরকেও ভুলে যায়। ফলে তখন কেবল নিজেদের মস্তিষ্ক ও কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট কিম্বা নিজেদের কৃতকর্মের দ্বারা গড়া ভুবনেই স্বীয় সারসত্যের অন্বেষণ করে ফেরে।

এ বিচ্যুতির পথে মানুষের জীবনযাত্রা যখন আরো এগিয়ে যায়, তখন যেহেতু তার চেয়ে শ্রেয়তর দিগন্ত সমূহকে অস্বীকার করে চলে, ফলে নিজ প্রাণের মধ্যে সত্যসূর্যের শেষ কিরণটুকুও নিভিয়ে ফেলে। ফলে তার চলার স্থান ও কাল হয়ে দাঁড়ায় সারসত্যের অস্তাচলভূমি। তখন তার চলা হয় রাতের নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে। সেখানে নিজের সহজাত বাস্তুভিটা (অর্থাৎ ঐশ্বরিক পরিবেশ) হারিয়ে এক অপরিচিত পরিবেশে বিভূঁইয়ে পরবাসীর ন্যায় ভীতি ও উদ্বিগ্নতা অনুভব করে। এ উদ্বিগ্নতা থেকে মুক্তির আকুতি তাকে অন্তহীন ও নিরন্তর যাত্রাপথে অনুপ্রেরণা যোগায়। কখনো সে নিজেকে স্বীয় মস্তিষ্কের প্রাপ্ত ও সৃষ্ট বৃত্তের মধ্যেই খুঁজে বেড়ায়। আর এটা হলো সেই পন্থা, যা পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবাদীরা উর্ধ্বলোকের দিগন্তকে অস্বীকার করার পর অবলম্বন করেছেন। আবার কখনো চিন্তা ও বুদ্ধির বৃত্তে নয়, বরং বস্তুগত আচরণ ও কর্মের সীমানায় নিজেকে খুঁজে ফিরেছে, যা তার অস্তিত্বের নিকৃষ্টতর দিক বটে। আর এটা হলো সেই পন্থা, যা ইন্দ্রিয়বাদীরা অনুসরণ করেছেন।

ইন্দ্রিয়বাদীরা, যারা ঐশ্বরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের স্তর থেকে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের স্তরে নেমে এসেছেন, তারা মানুষ ও জগতের সারসত্য জানা থেকে বঞ্চিত হন এবং জগত ও মানুষ সম্পর্কে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের চোরাবালিতেই আটকা পড়ে থাকেন। কেননা, তারা যেমনভাবে সবকিছুকে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধারণা ও থিওরীর আকারে পরীক্ষণ ও পর্যালোচনা করে থাকেন, মানুষকেও তদ্রুপ একটি ইন্দ্রিয়সর্বস্ব অস্তিত্ব হিসাবে পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেন। একারণেই তো একজন পাশ্চাত্য চিকিৎসক অপারেশন থিয়েটারে জীবন অতিবাহত করে এসে ঘোষণা করতে পারেন যে,

> 'মানুষের আত্মা বলে কিছু নেই। কারণ, আমার সত্তর বছরের চিকিৎসক জীবনে সহস্র মানুষের শরীরে অস্ত্রোপচার করেছি। শরীরের এমন কোন অংশ নেই যেখানে আমার অপারেশনের চাকু স্পর্শ করেনি। কিন্তু কোথাও আত্মা বলে কিছু আমি দেখতে পাইনি।'[৩]

এভাবে ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়ার কারণে জগত পরিচিতির ক্ষেত্রে কেউ কেউ সম্পূর্ণ প্রকাশ্যভাবে অবস্তুগত জিনিসের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন এবং হেগেলের আর্গুমেন্টের মতো করে যুক্তি উপস্থাপন করেন : 'যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তার অস্তিত্ব নেই' এবং এ যুক্তির ভিত্তিতেই রায় প্রদান করে থাকেন। অন্যরা আবার এক অর্থপূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করার মাধ্যমে ঐশ্বরিক বিষয়াদিকে অর্থহীন বলে ঘোষণা করেন।

মানব পরিচিতির ক্ষেত্রেও কেউ কেউ যেমন হিউম self এর বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন, আবার কেউ কেউ মানবের সারসত্যকে তার প্রাকৃতিক ও ইন্দ্রিয়গত চাহিদাসমূহ পূরণ করার মধ্যেই অনুসন্ধান করেছেন এবং তদানুপাতে আত্মজ্ঞানের অভাবকেই তুলে ধরেছেন। যেমন মার্কস, যিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ যখন তার 'কাজ' থেকে অবসর হয় তখনই selfless হয়ে পড়ে। অর্থাৎ মানবের কাজ ও বস্তুগত কর্ম ছাড়া আর কোন পরিচিতি নেই।

Dhaka University Institutional Repository

ঐশ্বরিক জীবন ব্যবস্থা যখন বিচ্যুত পথে অগ্রসর হয়, তখন যেহেতু তা মানবের সহজাত চাহিদা ও প্রয়োজনসমূহের বিপরীত ধারায় চলতে থাকে, অদূর ভবিষ্যতে কিম্বা দূর ভবিষ্যতে তা সঠিক রীতিনীতিতে প্রত্যাবর্তন অথবা অবাধ্যতা ও ঐশ্বরিক সারসত্য বিষয়সমূহের অস্বীকার (নাস্তিকতা) করায় পর্যবসিত হয়।

রেনেসাঁ, যা জগত ও মানুষের ঐশ্বরিক সারসত্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার মাধ্যমে আবির্ভূত হয়, দুটি নতুন চিন্তাধারার অর্থাৎ বুদ্ধিবাদ ও ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাবাদের জন্ম দেয়। রেনেসাঁ উত্তর বুদ্ধিবাদের প্রকাশ্য বৈশিষ্ট্য হলো অতিযৌক্তিক জ্ঞানকে অস্বীকার করা এবং অস্তিত্ব জগতের যেসব দিক মানবের বুদ্ধির উপলব্ধির সাধ্যাতীত, সেগুলো নাকচ করে দেয়া। রেনেসাঁর পরিভাষা অনুযায়ী আলোকন যুগে চিন্তা ও বুদ্ধিজীবীর জন্যে অস্তিত্ব জগত স্পষ্ট (উপলব্ধ) হওয়া মানে সে সকল সত্য ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করা, যা মানব বুদ্ধির জন্যে সংকেত ও রহস্যের ঘেরাটোপে আবৃত রয়েছে।

বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিবেষ্টন করে থাকা সারসত্য থেকে খোদ বুদ্ধিবৃত্তির সম্পর্কোচ্ছেদ হওয়ার পর বিগত দুই শতকে অর্থাৎ সতের ও আঠারো শতকে সে (অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি) দ্রুততার সাথে অস্তগমনের পথে ধাবিত হয় এবং নিজের স্থানকে ইন্দ্রিয়বাদের হাতে ছেড়ে দেয়। ইন্দ্রিয়বাদ পরিপুষ্ট হওয়ার সাথে সাথে জগত ও মানব সম্পর্কীয় বুদ্ধিবৃত্তিক দিকগুলো অস্বীকারের কবলে পড়ে এবং পরাপ্রাকৃতিক ও মেটাফিজিক্যাল সারসত্যসমূহে পৌছানের যত যুক্তিগ্রাহ্য পথ রয়েছে, সেগুলো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং বিশ্ব পরিচিতির দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থহীন আখ্যায়িত হতে থাকে। বৈজ্ঞানিক পন্থাগুলোও, যা মূলত ইন্দ্রিয়নির্ভর পরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতার জগত সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা প্রকৃত সারসত্যের পথে নিয়ে যায় না। বরং, কেবল সংশয়, সন্দেহ আর দ্বিধা দ্বন্দ্বের খেলায় মাতিয়ে রাখে।

নিঃসন্দেহে যদি ইন্দ্রিয়বাদীরা তাদের অভিজ্ঞতার নিরিখেই সবকিছু বিচার করেন তাহলে এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানেরও অনেক সূত্র নাকচ হয়ে পড়বে, যেগুলোর ভিত্তিমূল অভিজ্ঞতা-পূর্ব ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। একারণে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই স্বয়ং একটি বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান বিদ্যমান থাকার প্রমাণস্বরূপ, যা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয় না। অপরদিকে যে দৃষ্টিভঙ্গি বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানকেই মনুষ্য জ্ঞানের সর্বোচ্চ সীমা বলে মনে করে এবং এর ওপরে আর কোন কিছু সম্পর্কে জ্ঞানের সম্ভাবনা নাকচ করে দেয়, তাদের এ বক্তব্যের বিশ্লেষণে যারা ঐশীপুরুষের ও খোদায়ী আউলিয়া কেরামের প্রত্যাদেশমূলক জ্ঞানের বিশ্বাস করে, তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আর্গুমেন্ট উপস্থাপন করা হয়েছে।

আল্লামা তাবাতাবাঈ'র সহকর্মী এবং ইরান বিপ্লবের মহানায়ক রুহুল্লাহ ইমাম খোমেইনী বাস্তববাদী দর্শনের অঙ্গনে ছিলেন আল্লামার একজন অন্যতম সহযোদ্ধা। তিনি তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়নের (১৯৮৯ইং) সর্বশেষ কম্যুনিষ্ট নেতা মিখাইল গর্বাচেভ'র প্রতি এক ঐতিহাসিক পত্রে মানবের কতিপয় বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচয়ের প্রতি স্পষ্ট ঘোষণা ছাড়াও শেইখ সোহরাওয়ার্দীর ইশরাকী দর্শনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ আর্গুমেন্টও উল্লেখ করতঃ মানবের সজ্ঞা (Intuitive Knowledge) জ্ঞানের প্রতি ইশারা করেন, যা পাশ্চাত্যের চিন্তা ও সংস্কৃতির অন্ধ দিকগুলোকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

যদি কেউ নিজের সারসত্যকে সজ্ঞা জ্ঞান দ্বারা অনুধাবন করে, তাহলে নিজেকে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হিসাবে খুঁজে পাবে। আর যেহেতু আল্লাহর সত্তা সীমাহীন, কাজেই যে ব্যক্তির তাঁর সাথে পরিচয় হয়, সে যেদিকে দৃষ্টিপাত করবে, সেদিকে তাঁকেই প্রকাশ্যে দর্শন করবে। আর যে মানুষ স্বীয় স্রষ্টা (ঈশ্বর)কে বিস্মৃত হওয়ার মাধ্যমে নিজেকে বিস্মৃত হয়, সে তার মস্তিস্কপ্রসূত কল্প জগত ও স্বীয় কর্মের বৃত্তেই নিজেকে হাতড়ে বেড়ায়।

সৃষ্টি রহস্য

বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থা এবং মহান ঐশীপুরুষদের প্রদত্ত সংবাদ মোতাবেক সৃষ্টি-প্রক্রিয়া লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। তাহলে সৃষ্টি রহস্যটা কি? এ প্রশ্নটি দুই স্তরে উত্থাপিত হতে পারে :

১. গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

২. মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য।

যদি বলি, গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মানবের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাহলে কথাটি বেজায় ভারী কথা হয়ে যায়। কারণ, এ দাবী প্রমাণ করতে হলে দুটি মুলনীতি আগে দাঁড় করিয়ে নেবার দরকার হয়-

একটি হলো: মানুষকে সকল সৃষ্টির মধ্যে সেরা ও পরিপূর্ণতম সৃষ্টি বলে জানবো।

দ্বিতীয়টি হলো : এটা প্রমাণিত করা যে মানুষের সাথে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল অংশেরই সম্পর্ক হলো উদ্দেশ্যর সাথে মাধ্যমের সম্পর্কের মতো।

এ দুটি মুলনীতি বিজ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করা আমাদের জন্যে দুষ্কর ব্যাপার। এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি সৃষ্টিরাজি, মহাকাশের বিশাল নিহারিকা থেকে নিয়ে অতিশয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনু-পরামাণু পর্যন্ত সবই নিজস্ব গতিতে চলমান। যদিও এসবই পরস্পর সামঞ্জস্যশীল এবং একে অপরের সাথে বন্ধনযুক্ত, কিন্তু, 'মানুষের সাথে এ সকল সৃষ্টির সম্পর্ক উদ্দেশ্যর সাথে মাধ্যমের সম্পর্কের মতো' এ কথাটা যৌক্তিকভাবে প্রমাণযোগ্য নয়। কারণ, এটা সুস্পষ্ট যে, বিশাল কোন সংঘ, যার অংশসমূহ সুসমঞ্জস থাকে, তা কখনো এক ও অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রমাণ নয়। বরং, তা থেকে একাধিক ও শত সহস্র ফলাফল উৎপন্ন হতে পারে।

অপরদিকে মানবের শ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টা সামগ্রিকভাবেই বিতর্কিত বিষয়। কারণ, যদি এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা হয় সৃষ্টিসত্তার উৎকৃষ্টতার বিচারে, তাহলে আমরা তো এখনো বিশ্ব চরাচরের কোটি কোটি ভাগের মধ্যে এক ভাগের সাথেও পরিচিত হতে পারিনি। তাহলে কেমন করে মানবকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে এমন অকাট্য রায় ঘোষণা করি? পবিত্র কোরআন সরাসরি এ অর্থকে নাকচ করে দিয়েছে যে, মানুষই সৃষ্টি সেরা ও পরিপূর্ণতম সৃষ্টি। সুরা গাফির এর ৫৭ নং আয়াতে এসেছে :'মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।' তদ্রুপ, সূরা নাযিয়াত এর ২৭ নং আয়াতে এসেছে : 'তোমাদের সৃষ্টি করা কঠিনতর, নাকি আকাশ সৃষ্টি? তিনিই ইহা নির্মাণ করেছেন।'

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় পূর্ণরূপে নির্দেশ করে যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি মানব সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক কঠিন কাজ। কেননা, নিঃসন্দেহে এখানে কঠিনতর বলতে সংখ্যাগত বা পদার্থিক কাঠিণ্য কে বুঝানো হচ্ছে না। তাহলে তো মানুষের চারপাশের লোহা, সীসা ও ইস্পাতের কথাই উল্লেখ করা যথেষ্ট ছিল। নিঃসন্দেহে এখানে কঠিনতর বলতে সৃষ্টি সত্তার বিশালতাকেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু সূরা আহকাফ এর ৩৩ নং আয়াতে এসেছে : 'তারা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নাই, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম?'

-এ আয়াতে আল্লাহ এরূপ যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, আল্লাহ, যিনি অপরাগতা ছাড়াই নভমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি মৃতকে জীবিত করতেও সক্ষম। আর আত্মা বিদ্যমান থাকার দিক থেকে মৃতকে জীবিত করা প্রথম সৃষ্টি কার্য নয়। এ সত্ত্বেও আবারো এ আয়াত আমাদের বক্তব্যের প্রতিই ইশারা করে। কারণ, আত্মাকে এ জড় দেহের সাথে সংযুক্ত করাই মাহাত্ম্যপূর্ণ কাজ। যা অসাধারণ কঠিন ব্যাপার হিসাবে প্রকাশ পায়।

কিন্তু এই যে আয়াতে বলা হয়েছে '..অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান![৪]'- এর মধ্যে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, মানব সৃষ্টি অন্যসব কিছু সৃষ্টির তুলনায় বেশি মাহাত্ম্যপূর্ণ। কারণ, এ আয়াতে এ বিষয়টি বলছে যে, এ সৃষ্টিটি তার আপন সত্তায় উৎকৃষ্টতম এক সারসত্যের অধিকারী। আর এরূপ সৃষ্টিই সর্বোত্তম স্রষ্টার সৃষ্টি। কিন্তু এর থেকে উৎকৃষ্টতর ও মাহাত্ম্যপূর্ণ কোন কিছুই আর সৃষ্টি করেননি- এমন কথা এ আয়াত বলে না। এই একই প্রকারের আরেকটি আয়াত হলো এটি : 'আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।'[৫] কিন্তু যে আয়াতটি মানবকে সব সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ না হওয়ার কথা বলে, সেটা হলো সূরা বনি ইসরায়েলের ৭০ নং আয়াত : 'আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।'

এখানে যেমনটা বলা হয়েছে, মানবের শ্রেষ্ঠত্ব সৃষ্টিকূলের অনেকেরই ওপরে বটে, কিন্তু সকলের ওপরে নয়। কাজেই একথা বলা যায় না যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর নিরঙ্কুশ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মানব। কেননা, অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ ও মাহাত্ম্যপূর্ণ সৃষ্টি তার চেয়ে নিকৃষ্টতর সৃষ্টির লক্ষ্য হতে পারে না। কিন্তু মানব যে সারসত্যের দিক থেকে কি এবং তার স্থান কোন শিখর সীমায় আরোহণ করতে পারে- এটাও বিশ্লেষণ করে দেখার অবকাশ রয়েছে। প্রফেসর হামিদ পরসানিয়া এ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালিয়েছেন নিম্নরূপে :

> '...এ আলোচনার ফলাফল হলো, হতে পারে উচ্চতর সৃষ্টিগুলোর প্রত্যেকটি দলের আপেক্ষিক কোন লক্ষ্য রয়েছে। যদিও এসব সৃষ্টি, জগতের অপরাপর অংশের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটি সুসমঞ্জস ও সমন্বয়পূর্ণ সমষ্টিতে অংশীদার থাকতে পারে। কিন্তু জগতের সৃষ্টিরাজির যে অংশ জীব জগতের সাথে সম্পর্কিত তার প্রত্যেকটি সৃষ্টির আপেক্ষিক লক্ষ্য নির্ণয় করার মূল কাজটি স্পষ্ট। কেননা, খোদ জীবজন্তুর জীবনে ও একইভাবে তাদের সদস্য(প্রজাতি)দের মধ্যে যে আপেক্ষিক লক্ষ্যসমূহ রয়েছে, তা বিজ্ঞানের দিক থেকে সকলের গ্রহণীয় হতে পারে। কিন্তু সৃষ্টির জড় অংশের মধ্যে জীবের মতো আপেক্ষিক লক্ষ্যের ব্যাপারটা স্পষ্ট নয়। বরং সেগুলোর

Dhaka University Institutional Repository

> মধ্যে কেবল সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলাই পূর্ণরূপে বিদ্যমান। আর যেহেতু লক্ষ্য নির্ণয়ের কাজটি সম্পন্ন হয় মাধ্যম ও যে ফলাফল লক্ষ্য হিসাবে উৎপত্তি লাভ করে, তার পার্থক্য করার পরে, আবার অপরদিকে আমরা প্রাকৃতিক জগতের সৃষ্টিরাজির মধ্যে কেবল বিয়োজন (তথা বিভাজন) ও সংমিশ্রণই দেখি, একারণে আমাদের জন্যে এটা প্রমাণ করা কঠিন যে, সৃষ্টিসমূহের বিভাজিত (বা বিশ্লিষ্ট) দিকটি তাদের সংমিশ্রিত অবস্থার মাধ্যম? নাকি তাদের সংমিশ্রিত দিকটি বিশ্লিষ্ট দিকের মাধ্যম?
>
> তবে হ্যাঁ, একটি জিনিস আমাদের জন্যে গ্রহণযোগ্য এবং সেটা হলো যেহেতু বিশ্লিষ্ট আসল স্বরূপের মধ্যে যৌগ তথা সংমিশ্রণের (যার অস্তিত্বগত দিক রয়েছে) তা লুপ্ত হওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে, কাজেই যৌগ তথা সংমিশ্রণকে লক্ষ্য আর বিশ্লিষ্ট তথা বিভাজনকে মাধ্যম ধরাই বেশি যথাযথ বলে মনে হয়।'[১]

স্পষ্ট করে বলা যায়, গাছের ডালে পাতার হলুদ বর্ণ ধারণ করা এবং ফুল ও ফলের নষ্ট হওয়া দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'লক্ষ্য' বিবেচিত হতে পারেনা। কিন্তু এ হলুদবর্ণ ধারণ এবং ফুল ও ফলের নষ্ট হওয়া যা আসলে সংমিশ্রণ (যৌগ) সৃষ্টিকারী অংশসমূহের বিশ্লিষ্ট (বিভাজিত) হওয়ার নামান্তর মাত্র, তা অন্য আরেকটি (কিছুর) মিশ্রণ (বা যৌগের) মাধ্যম হতে পারে।

মোটকথা, প্রাকৃতিক ধারার দুই ভাগের (অর্থাৎ সংমিশ্রণ ও বিভাজন) মিশ্রণই লক্ষ্য হওয়া বুদ্ধিবৃত্তিক ও দর্শনের দিক থেকে বেশি যথার্থ। এখন এ আপত্তি ওঠে যে, বিভাজন (বিশ্লেষণ) সম্পন্ন হয় কি এজন্যে, যাতে কোন মিশ্রণ পাওয়া যায়, যেমনভাবে কোন মাধ্যম অবলম্বন করি যাতে লক্ষ্যে পৌছাই? নাকি বিভাজন সম্পন্ন হয় এবং কোন মিশ্রণের সূচনা হয়। যেমন কোন আগুন এসে পড়ে এবং দহন শুরু হয়?

এ আপত্তির উত্তরে বলা যায় : ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার দিক থেকে জড় জগতে দ্রব্যসমূহ, জীবীয় ধারার মতো স্পষ্টত, আসলে মাধ্যম ও লক্ষ্য নয়। কিন্তু আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় বলেছি : কোন সুশৃঙ্খল সংঘ (systematic unit) তো আপনা থেকেই উৎপত্তি লাভ করতে পারে না। বরং কোন চেতনাসম্পন্ন উৎপাদকের (স্রষ্টার) প্রয়োজন। এরূপ সুশৃঙ্খল সংঘকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন বলে গণ্য করা যায় না। যদিওবা আমরা উক্ত সংঘের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম নাও হই।

একথা সুবিদিত যে, একজন বুদ্ধিমান মানুষ যদি একটি সুশৃঙ্খল কারখানায় প্রবেশ করে আর তার নির্দিষ্ট প্রোডাক্টকে না দেখে, তাহলে যদিও উক্ত কারখানার যন্ত্রপাতিসমূহ তার কাছে শুধুই মেকানিক্যাল দিক দিয়েই বিবেচ্য হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মূল দিকটি থেকে সে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারে না। কারণ, এটা অসম্ভব যে, ঐ কারখানার যন্ত্রপাতিসমূহের মধ্যে এহেন শৃঙ্খলা ও সমন্বয় এবং সর্বব্যাপী সংযোগ এর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য উৎপাদন না করে থাকতে পারে।

মানব সৃষ্টির চূড়ান্ত লক্ষ্য

মানব সৃষ্টির চূড়ান্ত লক্ষ্যের ব্যাপারটি দুটি বিষয়কে ঘিরে উপস্থাপনযোগ্য :

১. স্বয়ং মানবের দৃষ্টিকোণ থেকে তার সৃষ্টির লক্ষ্য, যাকে আমরা আপেক্ষিক লক্ষ্য বলতে পারি।

Dhaka University Institutional Repository

২. গোটা সৃষ্টিকর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিক (ইউনিভার্সাল) লক্ষ্য, যা এক নিরঙ্কুশ স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত।

প্রথম বিষয়ে দার্শনিকদের মাঝে এবং অন্যান্য মানব চিন্তাবিদদের মাঝে অকাট্ট কোন উত্তর মিলবে না। বরং এ ব্যাপারে দার্শনিক ও চিন্তাবিদরা বিভিন্ন দলে মতে বিভক্ত। এখানে এরূপ কয়েকটি মতের নমুনা তুলে ধরা যায় :

১. মানুষ কিছুই নয়, নিছক এক প্রাণী ব্যতীত, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে বর্তমান এই যে সংমিশ্রিত অবস্থায় পরিদৃষ্ট হয়, সে পর্যায়ে উপণীত হয়েছে। আর এ মানুষই প্রত্যেক কালে কেবল নানা রূপে মুনাফা অন্বেষণের মাধ্যমে নিজেকে টিকিয়ে রাখা (অর্থাৎ বাঁচিয়ে রাখা) ছাড়া আর কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তার ছিল না। আর এই যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে, ভবিষ্যতেও কেবল এ আত্মপূজা ছাড়া অন্য কোন লক্ষ্য তার থাকবে না। আর যেহেতু সীমাহীন আত্মপূজা সামাজিক জীবনকে বিকল করে দেয় এবং এর ফলশ্রুতিতে তার পুরোপুরি ধ্বংসের কারণ হয়, একারণে বাধ্য হয়ে সামাজিক চুক্তিসমূহের মাধ্যমে কখনো অধিকারের ব্যাপারে, কখনো বা নৈতিকতার নামে আবার কখনো ধর্মের বেশে ব্যক্তি মানুষগুলোকে লাগাম টেনে ধরা হয়েছে মাত্র। সুতরাং যেমনটা দেখতে পাই, এ মতবাদের দৃষ্টিতে মানবের জন্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলতে বুঝায় কেবল নিজেকে বাঁচানোর প্রয়াস, যা সামজিক জীবনের পরিসরে শর্তের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, নতুবা জীবনের কোন লক্ষ্য ও গতি নেই।

২. আরেক দল চিন্তাবিদ মানব অস্তিত্বের জন্য পূর্বোক্ত মতবাদের চেয়ে আরো বিস্তৃততর লক্ষ্য তুলে ধরেন। তারা বলেন : মানবের জীবনে লক্ষ্য শুধু আহার গ্রহণ, নিদ্রাগমণ, কাম-ক্রোধ ও যৌনাচার নিবারণ, যা নিজের ভোগের উপকরণ বিশেষ, সেটা নয়। বরং মানুষ আরো কিছু সুখতৃপ্তি, যেগুলোকে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সুখ নাম দিয়ে থাকি, তা উপলব্ধি করেছে। সে সুখ তৃপ্তিতে পৌছানোকেও জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। বরং মানবের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষ এধরনের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যসমূহের প্রতি নিজের অন্তরঙ্গতা কোন অংশে কম তো নয়ই বরং অধিকমাত্রায় ও উত্তমরূপে প্রদর্শন করেছে। এর চেয়ে বড় কথা হলো, আইডলজি বা আদর্শগত লক্ষ্যসমূহ, যেগুলো মানুষের ব্যক্তি স্বার্থের জন্যে লাভপ্রদ ছিল না, অথচ স্বীয় জীবনকে ঐ লক্ষ্য অর্জনের পথে উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেনি। আরো সহজ ভাষায় বলা যায়, মানব ব্যক্তিবর্গের বিশেষ বিশ্বাস, যা তাদের পছন্দনীয় ও প্রিয় ছিল, উক্ত বিশ্বাসে পৌছতে সে এমনকি অকাতরে নিজের জীবন দান করে দিয়েছে। এই যে অকাতরে প্রাণ দান ও চরম আত্মত্যাগ আর অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশাকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়া, এর ভুরিভুরি নজীর থেকে এ মতবাদের পক্ষেই সমর্থন মেলে। যা প্রমাণ করে যে, মানব শুধু কেবল তার আত্মপূজার চক্রে আবদ্ধ ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এ মতবাদের দূষণীয় দিকটি হলো এখানে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক -এ দুয়ের মধ্যে কোন একটিকে অপরের ওপর প্রাধান্য ঘোষণা করা হয় না।

৩. তৃতীয় মতবাদে বলা হয়: মানুষ 'আমি' এর বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় লক্ষ্যকেই অন্বেষণ করে থাকে। কিন্তু যথাযথ সূক্ষতার সাথে বিচার করলে দেখতে পাব যে, মানবের আধ্যাত্মিক দিকটি লক্ষ্যবস্তু হওয়ার জন্য তার বস্তুগত দিকটি তুলনায় শ্রেয়তর। অর্থাৎ সে আসলে বস্তুগত বিষয়াবলীর উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা করে যাতে নিজের আত্মিক প্রকাশ থেকে সুখতৃপ্তি লাভ করে এবং প্রকৃতপক্ষে মানবের আত্মিক মহীমা, যা কখনো নৈতিক পন্থায় আবার কখনো অন্য উপায়ে দ্যুতি ছড়ায়, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বটে। এমনভাবে যে, বস্তুগত লক্ষ্য সমূহকে আধ্যাত্মিক সারসত্যসমূহের জন্য মাধ্যম ও উপকরণের স্থানে গণ্য করা যায়।

নিরঙ্কুশ স্রষ্টার দৃষ্টিকোণ থেকে মানব সৃষ্টির সামগ্রিক লক্ষ্য

এ ব্যাপারেও বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। শুরে আগেই বলে রাখা দরকার, যেমনটা উপরোক্ত শিরোনাম থেকেই ইশারা পাওয়া যায়, এ প্রশ্নটি কেবল তাদের জন্যেই প্রযোজ্য হয়, যারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক নিরঙ্কুশ স্রষ্টার সৃষ্টি বলে মানেন।

এক্ষেত্রে যেসব মতবাদ বিদ্যমান রয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :[৭]

১. একেশ্বরবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, মানবও অন্যান্য সৃষ্টির মতো ইউনিভার্সাল সৃষ্টির প্রকাশস্থল। এ মতবাদের প্রবক্তারা নিজেরাই আবার কয়েকটি উপদলে বিভক্ত। তাদের মধ্যে একটি দল বিশ্বাস পোষণ করে যে, সকল সৃষ্টিই আল্লাহর কার্য। আর যেহেতু কার্য হলো কারণের দ্বিতীয় প্রকাশ, কাজেই এসব সৃষ্টিই, যার সারসংক্ষেপ হলো মানব, সে আল্লাহর প্রকাশস্থল। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহর প্রকাশ তার কার্যসমূহের মধ্যে।

অপর দলটি বলেন : মানবের কার্য (তথা সৃষ্টি) হওয়াটা কেবল সাধারণ দর্শনের পন্থাসমূহের মতবাদের কথা। নতুবা, গোটা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে একটাই নিরঙ্কুশ অস্তিত্ব রয়েছে। আর অন্যরা হলো তার ক্রিয়া ও পার্শপ্রতিক্রিয়া মাত্র। এ দলের লোকেরা মানবকে কখনো কখনো আল্লাহর (স্রষ্টার) অংশ বলে পরিচয় দেয়।

এ মতবাদের মূলনীতির অপরিহার্যতা অনুসারে, মানব যে উদ্দেশ্য এ জগতে বহন করতে পারে তাহলো আত্মে প্রত্যাবর্তন এবং এটা উপলব্ধি করতে পারা যে, সে আল্লাহর সত্তার অংশসমূহের মধ্যে একটি অংশ। যদিও মানবের এই বর্তমান অস্তিত্বই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এ বিষয়ে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিলে মানবের মনোযোগ ও ঔদাসীন্যের মধ্যে কোন ফারাক করে না।

২. স্বীকৃত ধর্মসমূহের মতবাদ : সকল স্বীকৃত ধর্মই একটি সত্য কথায় অভিন্ন অবস্থানের অধিকারী। সেটা হলো, মানব সৃষ্টির লক্ষ্য হলো সেই পূর্ণতায় পৌছনো, যা তার পক্ষে সম্ভপর।

Dhaka University Institutional Repository

৩. কিছু সংখ্যক দার্শনিকের মতবাদ : তারা বলেন, আমরা এতটুকু জানি যে, মানবের অসাধারণ উৎকর্ষ ও পূর্ণতায় উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে।

৪. এ দলের বিপরীতে আরেকদল দার্শনিক রয়েছেন, যারা ধর্মসমূহের সাথে একমত পোষণ করেন এবং মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণতায় পৌছনো বলে জ্ঞান করেন, যেখানে পৌছনো মানবের জন্যে সম্ভবপর।

কোরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

পূর্বোক্ত মতবাদগুলো মানব সৃষ্টির মূল্যবান কোন যৌক্তিক উদ্দেশ্যকে স্থির করেনি। আর একেশ্বরবাদী মতবাদে যদিও উদ্দেশ্য নির্ধারনের জন্য একটি চমৎকার বাক্য ব্যবহার করে, কিন্তু গবেষণার সময় সন্তোষজনক কোন যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সমৃদ্ধ নয়। কারণ এই একটি প্রশ্ন এ মতবাদে চিরকালের জন্যে নিষ্পত্তিহীন হয়ে থেকে যাবে। সেটা হলো ঐ নিরঙ্কুশ অস্তিত্ব অর্থাৎ মহামহিম আল্লাহ যদি স্বীয় সত্তায় পরিপূর্ণতম পূর্ণতাসমূহের অধিকারী থাকেন, তাহলে এই পরিবর্তন তাঁর সাথে কোন সম্পর্কে সংঘটিত হয়েছে? তবে কি এ পরিবর্তন ছিল পূর্ণতা থেকে অপূর্ণতার দিকে? তবে কি যে অস্তিত্ব সর্বাধিক পূর্ণতম ও অসীম পূর্ণতা সম্পন্ন, তা আবার অসম্পূর্ণ হয়? আর অসম্পূর্ণ অবস্থায়ও কি আবার নিরঙ্কুশ অস্তিত্ব থাকে? আর যদি অসম্পূর্ণ থেকে পূর্ণতার দিকে পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহলে যে অস্তিত্ব পরিপূর্ণতম পূর্ণতার অধিকারী, সে কীভাবে অসম্পূর্ণ থাকতে পারে? ঐ অসম্পূর্ণ অবস্থায় কি পূর্ণতম অস্তিত্ব ছিল?

কিন্তু কোরআন ভিন্ন অন্যান্য ধর্মে যদি মানব সৃষ্টির লক্ষ্য পূর্ণতা বলা হয়েছে, এ পূর্ণতা যেহেতু খুবই সাধারণ একটি ভাবার্থ নির্দেশ করে, সে কারণে কৌতুহলী মনোবাসনাকে যেমনটা উচিত, তেমনভাবে পরিতুষ্ট করে না।

465920

কিন্তু প্রথম দলভুক্ত দার্শনিকগণ বলেছেন, মানুষের পূর্ণতায় পৌছনোর যোগ্যতা (সামর্থ) রয়েছে। কিন্তু আমরা জানিনা যে মানবসৃষ্টির চুড়ান্ত লক্ষ্য এ পূর্ণতায় পৌছনোই হবে। এরা প্রথম উক্তির তুলনায় যে বিষয়টি 'জানা কথাকেই ব্যাখ্যা করার মতোই', সেটাই পুনর্ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই যে তারা মানবের চুড়ান্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকেন, তারা যেহেতু উচ্চতর উৎসের কথা স্বীকার করেন, কাজেই সামগ্রিকভাবে হলেও উদ্দেশ্যকে মেনে নেয়া উচিত। যদিও স্পষ্টরূপে সেটা উপলব্ধি নাও করে থাকেন।

কিন্তু মানব সৃষ্টির চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে অন্যান্য মতাদর্শের তুলনায় কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতর ও যৌক্তিকতর। সে লক্ষ্যটি হলো সম্ভবপর সে পূর্ণতায় পৌছনো, তবে উচ্চতর অস্তিত্বকে সত্যিকার চেনার মাধ্যমে এবং তার উন্নত মহান স্থান সমীপে অনুনয় বিনয়ের (ইবাদাতের) মাধ্যমে।

এ বাক্যটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, এখানে চেনা ও অনুনয় বিনয় অর্থাৎ অর্বাচীনাদের ইবাদাত, যা কতেক ভাবার্থের নীচে চাপা পড়ে গেছে, যার ফল হয়েছে এরূপ যে, মানবের জন্যে জ্ঞানতত্ত্ব ও উপাসনা

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যে পরিণত হওয়াটার কোন গুরুত্বই থাকলো না। একারণে আমাদের উচিত এসম্পর্কে আমাদের সাধ্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা তুলে ধরা।

নিঃসন্দেহে উচ্চতর অস্তিত্বকে চেনা বলতে একটি বিমূর্ত (abstract) মনোযোগের কথা বলা উদ্দেশ্য নয়, যা অধিকাংশ ব্যক্তির জন্য সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ সৃষ্টি থেকে মানবের সামগ্রিক লক্ষ্য এ বিষয়টি হবে যে, সে জানবে, এ বিশ্বজগতের এক নিরঙ্কুশ স্রষ্টা রয়েছেন। অনুরূপভাবে ইবাদাত বলতে বিশেষ প্রকারের সেই দৈহিক কসরৎ বুঝায় না, যা ইবাদাতমূলক কর্মকাণ্ড পালন করার সময় করা হয়ে থাকে। কেননা, এরূপ তুচ্ছ উদ্দেশ্য মানবের মহান সৃষ্টি যা মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, সেটাকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনা।

অপরদিকে, আমরা যখন বলি, আল্লাহকে চেনা ও ইবাদত করা মানব সৃষ্টির পরম লক্ষ্য, তখন যেন এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, মানুষরা যে চেষ্টা চালায় তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার কাজে, তা ভুল। বরং, যেন তাদের উচিত আল্লাহ সম্পর্কে কয়েক ভলিউম কিতাব সাথে নিয়ে খোলা মাঠে বসে পাঠ করা আর সিজদায় যাওয়া (!) মানবের সৃষ্টির পরম উদ্দেশ্য সম্পর্কে এহেন অযাচিত ব্যাখ্যা লোকদের মননের উৎকর্ষ অর্জনের পথে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে দিয়েছে।

প্রকৃতসত্য বিষয়টা হলো এই যে, মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহর 'খলীফা' (তথা প্রতিনিধি) হিসাবে পরিচয় দেয়া হয়েছে। সে পারে স্বীয় সব রকমের নড়াচড়া ও স্থিরতাকে ইবাদাত হিসাবে আঞ্জাম দিতে। কারখানায় শ্রমিক ও ঠিকাদার, শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্র ও শিক্ষক, ইবাদাতখানায় নামায আদায়কারী, এরা সকলেই পারে নিজের অঙ্গে বা চিন্তায় ক্ষুদ্রতম কর্ম থেকে নিয়ে বৃহত্তম কর্মটি পর্যন্ত সবকিছুই মহামহিমের ইবাদাতের অন্তর্ভূক্ত করতে। কারণ বস্তুগত দিক দিয়ে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনকে সুশৃঙ্খল করাও ব্যক্তির জন্যে যেমন, সমাজের জন্যেও তেমনি আল্লাহর একটি জোরালো ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। যদি এ নির্দেশ আল্লাহর আনুগত্যের আওতায় পালিত হয়ে থাকে তাহলে তা ইবাদাতের রূপ পরিগ্রহ করে। আর যখন মানুষ বেশি বেশি বস্তুগত ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তখন যেসব ইবাদত নিখাদ ইবাদতের দিকসম্পন্ন, যেমন নামায, সেগুলোও তার মানসিক অবস্থাকে ভারসাম্যশীল করতে পারে না এবং তার চালচলন ও স্থিরতাকে কেবল মুনাফা কেন্দ্রিক হওয়া থেকে বিরত করতে পারে না। কাজেই যেমনটা লক্ষ্য করা গেল, কোরআনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইবাদাতের অর্থ নিছক কতিপয় দৈহিক কসরৎ রূপে ব্যক্তির মানসিক অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

যদি মানবের সকল চলন বলন (যা তার ব্যক্তিগত অবস্থায় হোক আর সামাজিক অবস্থায় হোক) তার প্রকৃত উপকার নিশ্চিত করে ইবাদতের রূপ পরিগ্রহ করে, তাহলে নিঃসন্দেহে তার বিশেষ ইবাদত যা নিখাদভাবে তার আত্মিকতার সাথে সম্পৃক্ত, যেমন নামায, এটা তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে প্রতিপন্ন হতে পারে। কারণ, সে তার সকল দৈহিক ও চৈত্তিক কার্যক্রিয়া (যা সে করে থাকে) দ্বারা, নিজেকে মহীয়ান অনন্ত অসীমের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

মানব সৃষ্টির জন্য এর চেয়ে উচ্চতর লক্ষ্য আর কিছু কি কল্পনা করা যায় যে, সে অনন্ত অসীমের সাথে নিজের যোগাযোগের শক্তিকে বাস্তব রূপ দান করবে? এ প্রসঙ্গে ভিক্টর হুগো'র একটি কথা রয়েছে, যা বিষয়টি সহজে বুঝতে সাহায্য করে। তিনি বলেন :

> "...এ সত্ত্বেও আমাদের বাইরে এক অনন্ত অসীম অস্তিত্ব (ঈশ্বর) রয়েছে, তাহলে কি আমাদের ভেতরেও এক অনন্ত অসীম বিদ্যমান নেই? এসব অনন্ত অসীমগুলো কি একটা আরেকটার ওপরে অবস্থান নেয় না? দ্বিতীয় অনন্ত অসীমগুলো কি প্রথমটির অধঃস্তন নয়?.. নীচের অনন্ত অসীমকে ওপরের অনন্ত অসীমের সাথে যোগাযোগে স্থাপন করাকেই 'নামায' নামকরণ করা হয়।" [৮]

এরূপ এক ঈশ্বর, যিনি মানবের অতিশয় নিকটবর্তী হওয়ার সূত্রে যোগাযোগের পাত্রে পরিণত হয়, তাঁকে চেনাটা হলো ঈশ্বরের সত্যিকার ইবাদাতের জন্যে একটি আবশ্যক ভূমিকা বা যুক্তি (গ্রাউণ্ড) স্বরূপ। এরূপ চেনাকে এবং এরূপ ইবাদতকে মানবসৃষ্টির লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করলে সেটা যুক্তিপূর্ণ হয়। একথাটাই গ্রহণ করা বরং সহজতর, জর্জ বার্ণাড শ'র একথাটি মানার চেয়ে যে 'প্রকৃতি মানব মস্তিস্ক সৃষ্টি কবেছে, নিজেকে উত্তমরূপে উপলব্ধি করার জন্যে'। কেননা, 'প্রকৃতি মানব মস্তিস্ককে সৃষ্টি করেছে' একথার অর্থ হলো প্রকৃতি মানুষকে সৃষ্টি করেছে। আর যদি ধরে নেয়া হয় যে প্রকৃতির এরূপ ক্ষমতা থাকে যে প্রকৃতির লক্ষ লক্ষ বরং কোটি কোটি সৃষ্টিপ্রজাতি (species) থেকে নির্বাচন (Natural Selection) করে এক মানুষ সৃষ্টি করতে পারে এ উদ্দেশ্যে যে, মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করবে, আর এটাই হয় মানব সৃষ্টির লক্ষ্য, তাহলে তার চেয়ে বরং মানবকে সৃষ্টি করেছেন অনন্ত অসীম মহান সৃষ্টিকর্তা আর এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো সে নিজেকে উপলব্ধি করবে এবং স্বীয় স্রষ্টাকে স্মরণ ও তাঁর ইবাদাত করার মাধ্যমে নিজের পূর্ণতায় পৌঁছবে- এ কথাটাই মানবের জন্যে বেশি শোভনীয় ও যুক্তিগ্রাহ্য হয়।

জ্বি, যদি লক্ষ্য এটা হয় যে, আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করবেন আর আমরাও এ ঝঞ্ঝাময় জীবনে কয়টা বেলা আলস্যে আকাশের তারকার দৃশ্য উপভোগ করে, আবার কিছুটা এসব নিস্তব্ধ পর্বত, উপত্যকা ও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে, কয়টা বেলা আবার বস্তুগত ও আত্মিক উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর রোগ বালাইয়ের সাথে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে মাটিতে প্রত্যাবর্তন করবো -তাহলে এটা জীবনের জন্যে নিতান্তই তুচ্ছ ও সামান্য হয়ে যায়। মানব জীবন তাহলে হবে পারস্য কবির নিম্নোক্ত এ চতুস্পদীটির চেয়ে বেশি কিছু নয় :

কয় বেলা শিশুপাঠ থেকে হয়েছি শিক্ষক
কয়বার শিক্ষকতায় জীবন করেছি স্বার্থক
শেষ কথাটা শোন তো, কি পেলাম অবশেষে
মাটি থেকে এসেছিনু, মাটিতেই গেলাম মিশে'

Victor-Marie Hugo এর আরো একটি বক্তব্য এখানে প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন :

> "বিদ্বেষ মুছে ফেলা এবং অনন্ত অসীমের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা -এটাই হলো সত্যিকার নিয়ম যে মানব তার মানবীয় কর্তব্য পালন করবে। সৃষ্টির বৃক্ষের নীচে কুর্ণিশ করা এবং এ পত্র-পল্লব

Dhaka University Institutional Repository

ঘন শাখা-প্রশাখায় ঘুরে বেড়ানোই যথেষ্ট মনে না করি। আমাদের একটি কর্তব্য রয়েছেঃ মনুষ্য প্রাণের পথে কাজ করা। অলৌকিকতার বিপরীতে রহস্যকে রক্ষা করা, উপলব্ধির অতিবর্তীকে উপাসনা করা, অযৌক্তিককে বিস্ময়সমূহ থেকে ঝেড়ে ফেলা, যা কিছু সর্বজনবিদিত তা গ্রহণ করা, বিশ্বাস কে বিশুদ্ধ করা, দীনের ওপর থেকে কুসংস্কারকে অপসারণ করা, আল্লাহকে বন্ধনসমূহ থেকে মুক্ত করা... (অতঃপর বলেন)

"উন্নতি বলতে আসলে লক্ষ্যই মূল, আদর্শ হলো সর্বোৎকৃষ্ট অনুসরণীয়, আর সেটা হলো আল্লাহর আদর্শ। নিরঙ্কুশ পূর্ণতা, পরিপূর্ণতম পূর্ণতা অনন্ত অসীম, এগুলো সবই পরস্পর সদৃশ শব্দাবলী"।[৯]

পরিশেষে, এতসব বিস্তারিত বিবরণের পরে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, মানব তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন সুশৃঙ্খল করার মাধ্যমে আল্লাহকে চেনার জন্যে (ভিক্টর হুগো যেটাকে পরশ পাথর হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন) এবং উক্ত পুত পবিত্র সত্তার উপাসনা করার জন্যে যে কর্মতৎপরতা চালায়, তাতে নিজের অস্তিত্বের মধ্যে কোন ঘাটতি ও কমতি অনুভব করে না।

এটাই হলো মানবের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এখানে 'মুনাফা' ও 'স্বার্থ' জাতীয় শব্দগুলো, যা সচরাচর আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার অর্থ বহন করে, তা নিতান্ত অবান্তর ও বেমানান হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে 'নিয়ম' আর 'কার্যফল' শব্দ দুটিই বেশি যথাযথ বলে প্রতীয়মান হয়। মানব প্রাণের নিয়ম হলো আল্লাহকে চিনবে এবং জীবনের সকল স্তরে স্বীয় বন্দেগীর কর্তব্য পালনে ব্রতী হবে। আর এটাই হলো কোরআনের এ আয়াতের অর্থ যেখানে আল্লাহ বলেন : 'আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার উপাসনা করার জন্য।'[১০]

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ আল্লাহকে চেনা ও তাঁর উপাসনা করার মধ্যে স্বয়ং আল্লাহর জন্য ক্ষুদ্রতম কোন ফায়দা নেই। কারণ, মহামহিম আল্লাহ যিনি সম্পূর্ণতম পূর্ণতাসমূহের অধিকারী, যে আল্লাহর জন্যে জগত ও মানবের দিক থেকে সামান্যতম খুঁত বা বৃদ্ধি ঘটানোর সুযোগ নেই, সেই আল্লাহ মানবকে সৃষ্টি করবেন এবং তার মারেফাত ও ইবাদত থেকে নিজে উপকৃত ও সমৃদ্ধ হবেন- এটা কল্পনীয় নয়।

এখানে একটি আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। সেটা হলো, যদি মানব সৃষ্টির পেছনে উদ্দেশ্য এটা হয়ে থাকে যে, মানুষরা মারেফাত ও উপাসনার মাধ্যমে উচ্চতর পূর্ণতাসমূহ অর্জন করবে, তাহলে কেন এবং কোন কারণে অধিকাংশ মানব ব্যক্তিই বেশিরভাগ যুগেই এ লক্ষ্যে পৌঁহতে অনীহা প্রকাশ করেছে কিম্বা অক্ষম ও অপারগ থেকেছে?

অবশ্য এ ধরনের আপত্তি তখনই সঠিক হবে যখন আমরা দুটি বিষয়কে সর্বসম্মত মূলনীতি হিসাবে স্বীকার করে নিব : একটি হলো সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যকে দুটি অখণ্ড ও অযৌগ সারসত্য হিসাবে গণ্য করবো যা অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্তভাবে বিরাজমান। দ্বিতীয় হলো এ বিষয়টিকে পরিমাণগত দিক থেকে উত্থাপন করবো।

Dhaka University Institutional Repository

- এ দুটি মূলনীতির কোনটাই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়নি।

কেননা প্রথম মুলনীতিটির ক্ষেত্রে অর্থাৎ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য হলো দুটি অখণ্ড সারসত্য, এটা বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে যেমন, দীনী দিক থেকেও তেমনি প্রত্যাখ্যান করা হয়। কারণ, এ দুটি সারসত্যের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর রয়েছে। যে ব্যক্তি একটি কর্তব্যপালন করে তার সৌভাগ্য, যে একাধিক কর্তব্য পালন করে তার সৌভাগ্যের চেয়ে কম হবে। দুর্ভাগ্যের বেলায়ও তদ্রুপ। কাজেই মানবের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে বিভিন্ন লক্ষ্য থাকে যা তাদের সামর্থ্য ও সাধ্যের উপযুক্ত করে নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় মুলনীতির বেলায়, যেখানে আমরা বলবো যে পরিমাণগত দিকটি এর মধ্যে ক্রিয়াশীল, এটাও ভ্রান্ত। কারণ, মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো, মানুষ দুনিয়ার বুকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছবে। মানবের সে লক্ষ্যটি হলো আল্লাহর পরিচয় অর্জন ও তাঁরই উপাসনা করা। দুনিয়ার বুকে একজন ইবরাহীম খলিলের অস্তিত্ব থাকা, যদিও বাদবাকী মানুষ আল্লাহকে না চিনে বা তাঁর উপাসনা না করে, তবুও সেটাই অল্লাহর চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের জন্যে যথেষ্ট। কারণ মনব সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো মানবকে পূর্ণতা দান করা। কিন্তু সেটা হবে মারেফাত ও উপাসনার মাধ্যমে। আর মহামহীম আল্লাহর মহীয়ান প্রভূত্বের দরবারে একজন মানব আর সকল মানব কোন পার্থক্য নেই।

পাদটীকা ও তথ্যসূত্র :

১. **Karl Emil Maximilian "Max" Weber,** *Basic Concepts in Sociology*, Translated & introduced by H. P. Secher, Peter Owen Ltd. reprinted 1978,

২. আল কোরআন, ৫৯ ঃ ১৯;

৩. **সুবহানী, আয়াতুল্লাহ জাফর,** *মাআরিফ-এ ইলাহী* গ্রন্থের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত

৪. আল কোরআন, ২৩ ঃ ১৪;

৫. আল কোরআন, ৯৫ ঃ ৪;

৬. **Ja'fari, Prof. Mohammad Taqi,** *Creation & Man*, Vali Asr Publications, 3rd Edition, Farus Iran Print, Tehran, 1965;

৭. **Ja'fari, Prof. Mohammad Taqi,** *Creation & Man*, Vali Asr Publications, 3rd Edition, Farus Iran Print, Tehran, 1965;

৮. **Hugo, Victor-Marie** : *Les Miserables* (1862) (ফার্সী ভাষায় অনুদিত), খ: ১, পৃ: ৪২৪-৪২৫;

৯ **Hugo, Victor-Marie**: *Les Misérables(ফার্সী অনুবাদ)*, খ: ১, পৃ: ৪১৫;

১০. আল কোরআন, ৫১ ঃ ৫১;

Dhaka University Institutional Repository

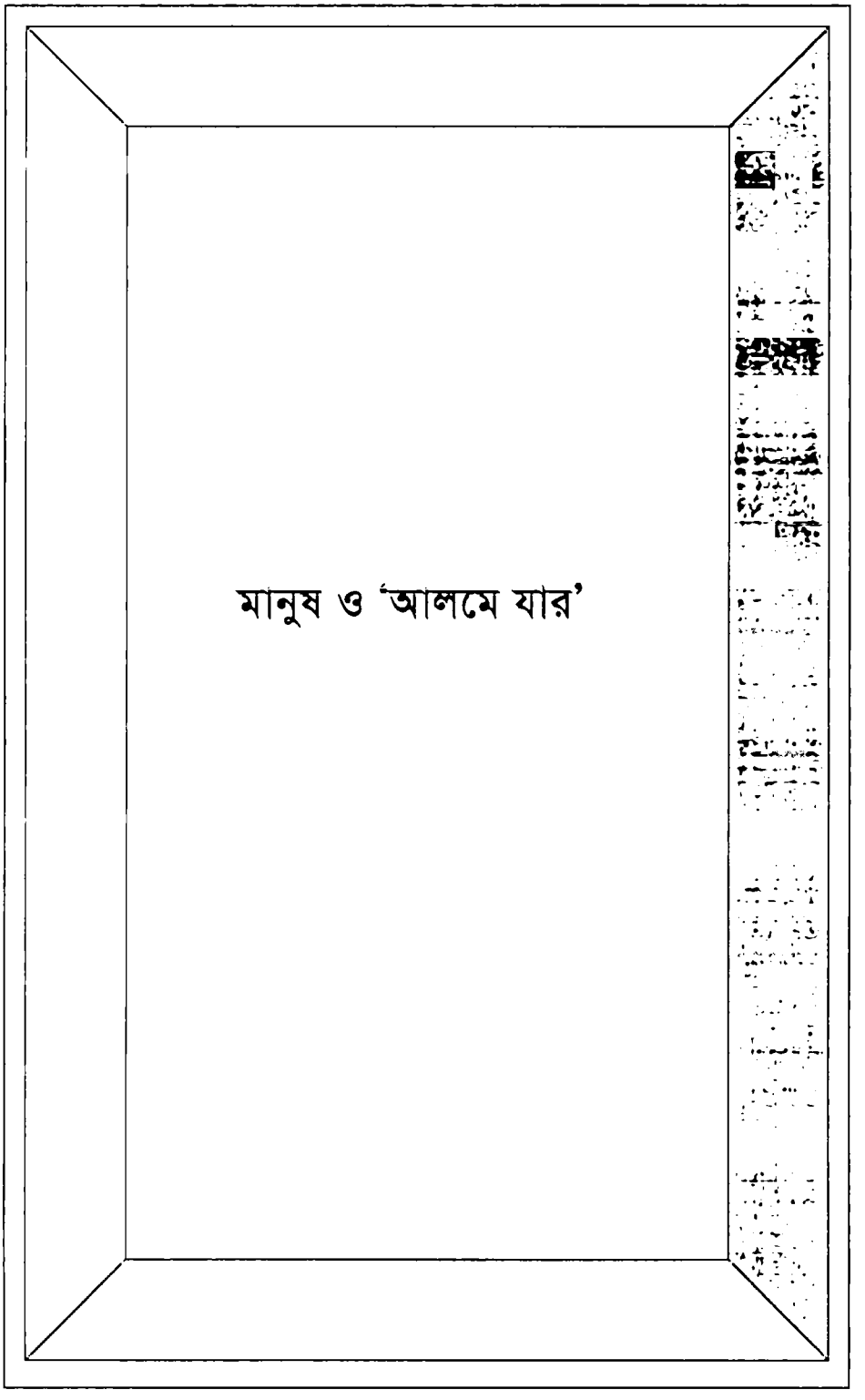

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ ও আলমে-যার

পবিত্র কোরআনে একটি আয়াত আছে যেখানে মানবের দুনিয়া পূর্ববর্তী একটি ঘটনার প্রতি ইশারা রয়েছে। কোরআনের পণ্ডিতবৃন্দ এ বিষয়টিকে 'আলমে-যার' নামে অ্যাখ্যায়িত করে থাকনে। আরবী ভাষায় 'আলম' অর্থাৎ জগত আর 'যার' শব্দের অর্থ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনু-পরমাণু। ইংরেজিতে এর অনুবাদ করা হয় 'the world of pre-existence'. মানবের দুনিয়ায় পদার্পণের পূর্বে আলমে যার-এ আল্লাহকে উপাসনা করার জন্যে মানবের পক্ষ থেকে অঙ্গীকার সম্পন্ন হয়। কোরআনের ভাষ্যকে কেন্দ্র করে মুসলিম পণ্ডিত ও দার্শনিকবৃদ সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

> *And when your Rabb brought forth the children of Adam, from their backs, their descendants, and made them bear witness upon their own selves (saying): Am I not your Rabb? Replied they: Yes! We bear witness. (This We did) lest you should say on the day of Judgment: Verily we were unaware of this (fact). (172)*

> Imam Baqir (a.s.) said: All the progeny (children) to be until *Qayamah* from the back of Adam (a.s.) was taken out, they came out, and all were like atoms, then He gave them knowledge (*Ma'rifat*) about Himself, and showed them his creation, if it was not like that then no one could recognize his Rabb.
> Imam Sadiq (a.s.) said: When Allah intended to create His creation, He spread them in front of Him, and asked them: who is your Rabb? First of all who answered, he was Hazrat Mohammad Mustafa (s.a.w.a.w.), then Amir-ul-Mo'mineen Ali (a.s.), and then Imams (a.s.) from the progeny of Amir-ul-Mo'mineen (a.s.), they all said: You are our Rabb. So Allah made only them the bearer of His Knowledge and Deen. Then He said to all the angels: these are the bearers of My Knowledge and Religion, and these are the Trustees in my creation, and everything will be found from them. Then Allah said to the children of Adam (a.s.): Testify Allah's *Rabobiyat* (Lordship) and *Walayat* and Obedience of these great Personalities. All answered: Yes, O our Lord, we testify. Allah said to the angels: You are witness. Angels replied: we are witness. He said: it should not happen that they can say on *Qayamah* that we were unaware of this.[1]

Dhaka University Institutional Repository

তবে 'আলমে যার' এর অর্থ এবং সে জগতে মানবের পক্ষ থেকে আল্লাহকে উপাসনা করার যে অঙ্গীকার-এ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ রাখা আবশ্যক :

১. কোন সৃষ্টিই তাঁর অস্তিত্ব লাভের ক্ষেত্রে স্বাধীন ইখতিয়ারের অধিকারী নয়। মানবের অস্তিত্বও এর ব্যতিক্রম নয় এবং 'আলমে-যার' এর সাথে কোন সম্পর্কিত নয়।

২. আলমে-যার সম্পর্কে বিজ্ঞানী, মুফাসসির, কালামশাস্ত্রবিদ ও হাদীসবেত্তাগণের মধ্যে অনেক কথা বিনিময় হয়েছে এবং এটাই নির্দেশ করে যে বিষয়টি একটি জটিল ব্যাপার।

৩. মহান আল্লাহ বলেন :"স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন,'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলে, 'হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা সাক্ষী রইলাম। এটা এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম।"[২]

- এখানে এই যে 'বের করা' হয়েছে, সেটা কিভাবে সংঘটিত হয়েছে। আর 'আলমে-যার' এরই বা অর্থ কি?

এ প্রশ্নের উত্তরে হাদীসবেত্তাগণ বলেন : কিছু কিছু হাদীসে এসেছে যে, আদমের সন্তানরা দুনিয়ার শেষ সময় পর্যন্ত ক্ষুদাতিক্ষুদ্র অনু-কণা রূপে আদমের পৃষ্ঠ থেকে বের হয়েছে এবং শূন্য জায়গাকে পূরণ করেছে। এ সময়ে তারা ছিল বুদ্ধি ও চেতনার অধিকারী এবং কথা বলতে সক্ষম। আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' সকলে উত্তরে বললো : জী, এবং এভাবেই সর্বপ্রথম একত্ববাদের অঙ্গীকার সম্পন্ন হয়।

আবার একদল মুফাসসির বলেন : মানব সৃষ্টির প্রথম অনুকণা বলতে বীর্য বুঝানো হয়েছে যা পিতাদের পৃষ্ঠ থেকে মায়েদের জরায়ুতে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে ভ্রূণের জগতে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবের রূপ লাভ করে। আর এ অবস্থায়ই আল্লাহ কিছু সামর্থ্য মেধা ও প্রতিভা (predisposition) তাকে দান করেছেন যাতে সে একত্ববাদের সারসত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। সুতরাং, আলম-ই যার হলো ভ্রূণের জগত। আর এ প্রশ্নোত্তর সম্পন্ন হয়েছে 'অবস্থা ও ভাবের' ভাষায়।

আরেকটি মত হলো : আলমে যার হলো আত্মার জগত। অর্থাৎ আল্লাহ শুরুতে মানব আত্মাসমূহকে সৃষ্টি করেন এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে উপরিউক্ত বক্তব্য রেখেছেন ও তাদের থেকে একত্ববাদের প্রতি স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেছেন।

আবার কারো কারো মতে 'যার' বলতে অতিশয় ক্ষুদ্র অংশকে বুঝানো হয়নি; বরং 'যার' বলতে 'যুররিয়াহ্' বা বংশধর ও সন্তানাদি বুঝানো হয়েছে। সন্তান ছোট ও (অবুঝ) শিশুই হোক আর বড় ও জ্ঞানসম্পন্নই হোক। সুতরাং আল্লাহ ও মানুষের মাঝে কথোপকথন নবীদের মাধ্যমে এবং কথার ভাষায়ই সম্পন্ন হয়েছে।

এ সম্পর্কে আরেকটি অভিমত হলো, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে 'আলমে যার'এ প্রশ্নোত্তর সম্পন্ন হয়েছে ভাবের ভাষায়। আর সেটা সম্পন্ন হয় মানবের প্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধি ও বুদ্ধি লাভের পর।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা তাবাতাবাঈ বলেন : সৃষ্টিকূল দু'ধরনের অস্তিত্বের অধিকারী। একটি হলো আল্লাহর নিকটে সামষ্টিক অস্তিত্ব, কোরআন যাকে মালাকুত (উর্দ্ধলোকীয়) অস্তিত্ব বলে আখ্যায়িত করেছে। আর অন্যটি হলো বিক্ষিপ্ত অস্তিত্ব, যা সময়ের পরিক্রমায় পর্যায়ক্রমে প্রকাশ লাভ করে। এভাবে পার্থিব মনুষ্য জীবনের আগে আরেকটি মনুষ্য জীবনের খবর পাওয়া যায়, যেখানে কোন সৃষ্টিই আল্লাহর থেকে পর্দাবৃত নয়, অন্তস্থ আপন সজ্ঞা দ্বারা তাঁকে অবলোকন করে থাকে, তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি প্রদান করে থাকে। 'আলমে- যার' এর প্রশ্নোত্তর হলো সেখানকার ব্যাপার।[৩]

উপরিউক্ত আয়াতটিকে আয়াতে মীছাক তথা 'অঙ্গীকারের আয়াত' বলা হয় এবং মুফাসসরিগণ এ আয়াত সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. এ খোদায়ী শপথ বা অঙ্গীকার কোন্ জগতে এবং কোন পরিস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছে?

২. এ শপথ অনুষ্ঠান কি সকল মানবের সমবেত উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছে নাকি একজন একজন করে মানুষের উপস্থিতিতে?

তবে, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতবৃন্দের মতামতের প্রতি ইশারা করার পূর্বে এ দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, যদিও এ আলোচনায় অনেক অস্পষ্ট ও সূক্ষ্ম দিক রয়েছে, তবু এ আয়াতটি স্পষ্টরূপে নির্দেশ করে যে, আল্লাহ প্রতিটি মানুষের সাথে মুখোমুখি হয়েছেন এবং তাদেরকে বলেছেন যে, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' আর তারাও বলেছে : 'হ্যাঁ, আপনিই আমাদের প্রতিপালক?'

আর অস্পষ্টতার সূত্রমূলটি হলো এখানে যে, আমরা নিজেরা এরূপ কিছু আমাদের স্মরণে নেই। কেউ কেউ আবার এ স্পষ্ট ব্যাপারটি থেকে চমৎকার সিদ্ধান্ত বের করেছেন এবং বলেছেন যে, এ ধরনের মুখোমুখি হওয়া ও অজুহাত দূর করা কথোপকথন কেবল আত্মস্থ ও সজ্ঞা জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। একারণে এ আয়াতে যে মা'রিফাত তথা জ্ঞানপরিচিতির ইশারা করা হয়েছে, সেটা ব্যক্তিগত জ্ঞান পরিচিতি, ইউনিভার্সাল নয় যা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে অর্জিত হয়। প্রথম প্রকারের জ্ঞানের সাথে দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞানের পার্থক্য হলো এই যে, প্রথম প্রকারের জ্ঞানে স্বয়ং স্রষ্টা ও তাঁর গুণসমূহ (যেমন এক ও অদ্বিতীয়ত্ব, প্রতিপালকত্ব ইত্যাদি) নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞানে ইউনিভার্সাল স্রষ্টারই কেবল পরিচয় মেলে, কোন গুণের নির্দিষ্টকরণ ছাড়াই।[৪]

এ শপথের স্থান কোথায় ছিল সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের মতামতসমূহ নিম্নরূপ :

১. আলমে যার নামক এ তত্ত্বটি বলে যে, মানবের আত্মাসমূহ দেহে সন্নিবিষ্ট হওয়ার আগে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুকণার সাথে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং উক্ত অনুকণাসমূহ আত্মা সন্নিবেশিত হওয়ার মাধ্যমে জীবিত ও অবগত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ এ বিষয়টিকে অঙ্গীকার নিয়েছেন। এ দলের মত অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতটি আলমে-যার' এর প্রতি নির্দেশ করে। অর্থাৎ আল্লাহ আদমের ঔরস থেকে অতিশয় ক্ষুদ্র অনুকণাসমূহ নির্গত করেছেন এবং সেগুলোর সাথে আত্মা সন্নিবেশিতে হওয়ার মাধ্যমে তাদের থেকে

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার ও শপথ গ্রহণ করেছেন। আল্লামা মাজলিসী ও আগা জামালুদ্দীন খনসারি এ মতটি গ্রহণ করেছেন।[৫]

পর্যালোচনা :

ক. এ মতটি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের পরিপন্থী। কারণ আয়াত বলছে যে আল্লাহ 'বনি আদমের' ঔরস থেকে তাদের যুররিয়াত তথা সন্তানাদি গ্রহণ করেছেন, 'আদমের' ঔরস থেকে নয়।

খ. উক্ত মত অনুযায়ী জন্মান্তরবাদ আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ বুদ্ধির নির্দেশ অনুযায়ী জন্মান্তরবাদ বাতিল। কারণ, এর ভিত্তিতে সকল মানুষ একবারই এ দুনিয়াতে পদার্পণ করেছে এবং একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকাল অতিবাহিত করে এখান থেকে বিদায় নিয়েছে এবং আরেকবার পর্যায়ক্রমে এ বিশ্বে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর এটাই তো সে জন্মান্তরবাদ।[৬]

গ. যদি এ শপথ পূর্ণ অবগতি সহকারে নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে কেন বর্তমানে কারো এ শপথের কোন খবর নেই।

২. কেউ কেউ যেমন যামাখশারি, বায়যাভি, শেখ তুসী, সাইয়্যেদ কুতুব, আল্লামা শরাফুদ্দীন আমেলী, মুহাক্কিক মীরদামাদ, আল্লামা মুহাম্মাদ তাকি জাফারী প্রমুখ বিশ্বাস করেন যে, এ আয়াতটি এখানে প্রকৃত বিষয় বলতে চায়নি, বরং উপমার মাধ্যমে ফিতরাত তথা সহজাত প্রবৃত্তির দিকেই ইশারা করেছে। এ দলের অভিমত অনুযায়ী আয়াতের উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহ অগণিত নেয়ামত প্রদানের মাধ্যমে এবং মানবকে আকল তথা বুদ্ধি প্রদানের মাধ্যমে যেন এ প্রত্যাশা রাখেন যে মানুষ এর বিপরীতে কুর্ণিশ বা মহীমা ঘোষণা করুক। আর মানুষও স্বীয় সত্তা ও সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী এরূপ দাবীর প্রতি সাড়া দিয়েছে।[৭]

- এ মতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আপত্তিটি হলো আল্লাহর বাণীর বাহ্য বক্তব্যের সাথে এর বৈপরীত্য। কারণ আয়াতে 'স্মরণ করো' কথাটি রয়েছে যা স্পষ্টতই অতীতের দিকে নির্দেশ করে।

৩. শেখ মুফিদ[৮] 'আলমে-যার' এর মূলতত্ত্বটি সত্যিকার অর্থে এবং সৃষ্টিগত অর্থেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে বিনিময় হওয়া কথোপকথন সত্যিকার অর্থে হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন এবং এ গুলোকে উপমা ও রূপকের অর্থে গ্রহণ করেছেন।[৯]

- প্রথম ও দ্বিতীয় মতের ওপরে যেসব আপত্তি প্রযোজ্য হয়, এ মতের ওপরেও সেগুলো প্রযোজ্য হয়।

৪. আলামুল হুদা'র[১০] বিশ্বাস অনুযায়ী 'আলমে-যার' সত্যিকারই ছিল। কিন্তু আদমের সকল সন্তান সেখানে উপস্থিত ছিল না। বরং এটা কেবল কাফের বংশধরদের জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল।[১১]

ক. এ মতটি আয়াতের বাহ্য অর্থের পরিপন্থী। কারণ আয়াতে যে শপথ তথা অঙ্গীকারের কথা এসেছে, সেটা সাধারণ এবং সার্বজনীন।

খ. যদি শুধুই মুশরিক ও কাফিরদের সন্তানদের শপথের কথা বলা হতো তাহলে আয়াতে কোন একভাবে সেটা উল্লেখ থাকতো।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

৫. এ সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ও কোরআনের তাফসিরবিদ আল্লামা জাওয়াদি **আমুলী**[১৩] বিশ্বাস করেন যে, এ **আয়াতে** External reality তথা বহি:বাস্তবতার কথা বলা **হয়েছে**। মহান আল্লাহ বুদ্ধি ও প্রত্যাদেশের ভাষায় **এবং নবীগণের** ভাষায় মানুষের থেকে অঙ্গীকার **গ্রহণ** করেছেন। **অর্থাৎ** আল্লাহ **বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধি** ও প্রত্যাদেশের **বার্তার** পরিপ্রেক্ষিতে মানুষদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যেন দীনের শিক্ষাকে গ্রহণ করে নেয়। আল্লামা জাওয়াদী আমুলী নিজের এ মতের সমর্থনে পাঁচটি বিষয়ের প্রতি ইশারা করেন এবং বলেন :

"এ **অর্থটি**, আলোচ্য আয়াতের বাহ্য **অর্থের ওপর চাপিয়ে** দেয়া কোন **ব্যাপার** নয়। কারণ বুদ্ধি ও প্রত্যাদেশের জন্যে কর্তব্যের (কাজের) **পর্যায়ের** ওপরে **একপ্রকার** প্রাধান্য তথা অগ্রাধিকার রয়েছে। তাই 'স্মরণ করো' কথাটির বাহ্য অর্থ বজায় থেকে যায়। **'এক** প্রকার **প্রাধান্য** তথা **অগ্রাধিকার'** বলতে এটা বোঝানো হয়েছে যে, **প্রথমে** নবীগণ আসেন **এবং** গ্রহণ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন, **অতঃপর** কর্তব্য (কাজ) সংঘটিত হয়।" [১৪]

এ মতটি তাফসির না বলে বরং অর্থের সমন্বয় বিধান করা বললে বেশি মানায়। কারণ, এটা সকলের মস্তিস্ক থেকে দূরবর্তী, উপরুন্ত এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের সম্বোধনসমূহকে প্রকৃত অর্থে গ্রহণ না করে বরং রূপক অর্থেই গ্রহণ করতে হবে।

আল্লামা তাবাতাবাঈও এই মতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন : 'যদি অঙ্গীকার গ্রহণ বলতে ঐ প্রত্যাদেশের ভাষাই বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে (উচিত ছিল) অন্যান্য আয়াতের মতো বলতেন : (লোকদেরকে এভাবে প্রচার করে দাও যে..)। অর্থাৎ তখন বলতেন না যে, (স্মরণ কর)।'[১৫]

আল্লামা তাবাতাবাঈ বিশ্বাস করেন যে এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো মানুষের ঐশী দিকটা। অর্থাৎ সাক্ষ্য গ্রহণ ও সাক্ষ্য প্রদানের স্থান এবং অঙ্গীকারের স্থান হলো মানুষের ঐশী লোক। কারণ, আয়াতের বাহ্য অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখলে যেখানে বলা হয়েছে 'যখন (অঙ্গীকার) গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ স্মরণ করো' -এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথমত: এ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থানের পূর্বে অন্য আরেকটি অতিন্দ্রীয় স্থান বিদ্যমান ছিল, যেখানে এ অঙ্গীকার সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয়ত: অঙ্গীকার গ্রহণের দৃশ্যপট, ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতির চেয়ে অগ্রবর্তী। তৃতীয়ত: যেহেতু এ দুই স্থান পরস্পর এক ও অভিন্ন এবং একে অপর থেকে আলাদা নয়, একারণে আল্লাহ ঐশী ও বস্তুগত মানবকে নির্দেশ প্রদান করেন যেন উক্ত ঐশী স্থানের স্মরণে থাকে, এবং যখন সে স্থানের স্মরণে থাকবে, তখন তা বজায় রাখবে।

এ মতটি পণ্ডিতবৃন্দের মধ্যে গভীরভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আল্লামার এ মত অনুযায়ী এবং ঐ সকল ব্যক্তি, যারা 'আলমে-যার' এবং আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে কথোপকথনের বিষয়কে গ্রহণ করেছেন, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ঐ জগতের অস্তিত্বের পেছনে যে দর্শন নিহিত রয়েছে সেটা হলো, মানুষ তার অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে আল্লাহকে দেখতে পেয়েছে এবং তাঁর একত্বের সাক্ষ্য প্রদান করেছে। আর এ সাক্ষ্যই কারণ হয় যাতে সে যখন বস্তুজগতে চলার পথে নানা বাধার সম্মুখীন হয়, তখন যেন ঐ স্বীয় আল্লাহর দর্শনের জগতকে

Dhaka University Institutional Repository

ভুলে না যায়, যা তার সুপথ ও মুক্তির মূলধনস্বরূপ। আর যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত অঙ্গীকার ও উক্ত সহজাত সাক্ষ্য মানবের প্রাণের মধ্যে জীবিত থাকবে, ততক্ষণ সে ভ্রষ্ট পথে পা বাড়াবে না এবং প্রকৃতপক্ষে ঐ ঐশী জগত ও আলমে-যার প্রত্যক্ষণ মানবের মুক্তির এবং একত্ববাদের পথে অবিচল থাকার নিশ্চয়তা দিতে পারে। অবশ্য এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যে মানব তার ঐশী জগতের ও সহজাত প্রবৃত্তির জগতের এ মূল্যবান ধনসমূহকে পাপের কালিমা ও দুনিয়ার মোহ দ্বারা পুতে ফেলতে পারে, কিন্তু যদি নবী ও ইমামগণকে এ সুযোগ দেয় যে তাঁরা সে ধনের নাগাল পাবেন, তাহলে তারা উক্ত ধনসমূহকে ধ্বংসস্তুপের নীচ থেকে উদ্ধার করতে পারেন।

তাই মহাজ্ঞানী হযরত আলী ইবনে আবি তালিব বলেন :

> 'মহান আল্লাহ স্বীয় নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন এবং কিছুকাল পর পর মানুষের চাহিদার সাথে সমঞ্জস রাসুলগণকে একের পর এক প্রেরণ করেছেন, যাতে সহজাত (প্রবৃত্তির) অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বস্ততাকে তাদের থেকে কৈফিয়ত চান এবং বিস্মৃত নেয়ামতসমূহকে স্মরণ করিয়ে দেন এবং আল্লাহর বিধানাবলী প্রচার করার মাধ্যমে তাদের ওপরে সব অজুহাতের পথ রুদ্ধ করে দেন এবং বুদ্ধিসমহের গুপ্ত হওয়া সামর্থ্যসমূহকে প্রকাশ করে দেন।'[১৬]

উল্লিখিত বাক্যাবলী থেকে আলমে-যার' এর দ্বিতীয় তাৎপর্য ও দর্শনের কথা অনুধাবন করা যায়। আর সেটা হলো, নবী , ইমাম ও সংস্কারকদের মাধ্যমে মানুষের সুপথপ্রাপ্তি সহজতর হওয়া। ঐশী জগতকে প্রত্যক্ষণ ও আলমে যার' বিদ্যমান থাকা দীনি নেতৃবৃন্দের জন্যে এ ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করে দেয় যে, তারা সহজে মানুষদেরকে সুপথে পরিচালিত করতে পারেন এবং উক্ত অঙ্গীকার ও সহজাত প্রবত্তির সে গুপ্তধনসমূহকে জীবিত করার মাধ্যমে মানুষকে সহজে সত্য সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন।

এর আরেকটি দর্শন হলো সংস্কারক এবং ধর্মীয় নেতারা অন্যদেরকে সুপথে পরিচালিত করা থেকে কোন সময়ে নিরাশ হন না। কারণ, তারা জানতে পারেন যে, মানবের মধ্যে অনেক নিয়ামক রয়েছে, যেগুলো তাদেরকে সংশোধনে সাহায্য করে। এসব নিয়ামকগুলোর মধ্যে রয়েছে মনুষ্য বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিক বিবেকবোধ, সহজাত প্রবৃত্তি, আলমে-যার ও তার ঐশী প্রত্যক্ষণের অভিজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো হলো মানবের অভ্যন্তরে ব্যুহ প্রাচীর হিসাবে পরিগণিত, যার কারণে সংস্কারকরা শেষ মুহূর্ত অবধি মানুষদের সংশোধনের আশা বর্জন করেন না। আর একারণেই কিছু কিছু মানুষ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সহসা কোন স্ফুলিঙ্গের প্রভাবে স্বীয় আসল সহজাত প্রবৃত্তি ও ঐশী অবলোকনে প্রত্যাবর্তন করে থাকে এবং সত্য ও একত্ববাদের ধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা ও তথ্যসূত্র :

[১]. **Al-Naqvi, Al-Syyed Abu Mohammad Abrar al-Hasnain Fatimi**, *Knowing Infallibles (a.s.) by Quran,* (Compilation), First Edition, June, 2007; p 95-96

[২]. **আল কোরআন**, ৭ ঃ ১৭২;

[৩]. **তাবাতাবাঈ, আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন**, তাফসীরুল মীযান, খ: ১৮, পৃ: ৩২০-৩৩৩;

[৪]. ইয়াযদি, **প্রফেসর** তাকী মেসবাহ, *মাআরেফ-এ কোরআন*, খ: ১ ও ২, পৃ: ৩৭-৪৭; (ফার্সী ভাষায় রচিত)

[৫] **কায়হান আন্দিশে** সাময়িকী, **সংখ্যা** ৫৮, মুহাম্মাদ হাসান এর লেখা **নিবন্ধ 'আলমে- যার' সম্পর্কে একটি** পর্যালোচনা'

[৬]. তাবাতাবাঈ, আল্লামা **সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন**, তাফসীরুল মীযান, খ: ৮, পৃ: ৩২৫-৩২৭;

[৭]. কায়হান আন্দিশে সাময়িকী, সংখ্যা ৫৮,

[৮]. **Ibn al-Nu'man, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Muhammad,** Title: al-Shaykh al-Mufid Birth: 948 CE Death: 1022 CE

[৯] কায়হান আন্দিশে সাময়িকী, সংখ্যা ৫৮,

[১০]. **Alam al-Huda, Abu al-Qāsim 'Alī ibn Husayn al-Syyid al-Murtadhā,** (965 -1044)

[১১]. **সাবযেভারী, মোল্লা হাদী**, *শুয়াকুল হেকাম*, খ: ১, পৃ: ২০; **মানশুরে** জাভিদ, খ: ২, পৃ: ১৮;

[১২]. মানশুর-এ জাভিদ, খ: ২, পৃ: ৮০;

[১৩] **Grand Ayatollah Abdollah Javadi-Amoli** is an Iranian Twelver Shi'a Marja. He is one of the prominent Islamic scholars of the Hawza in Qom.

[১৪] আমুলি, **আয়াতুল্লাহ** জাওয়াদী: *ফিতরাত দার কোরআন*, খঃ ১২, পৃ: ১২২-১৩৭;

[১৫] তাবাতাবাঈ, আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ **হুসাইন**, *তাফসীরুল মীযান*, খ: ৮, পৃ: ৩৩৪;

[১৬]. **নাহজুল** বালাগা (মুহাম্মাদ দাশ্তি), পৃ: ৩৮;

Dhaka University Institutional Repository

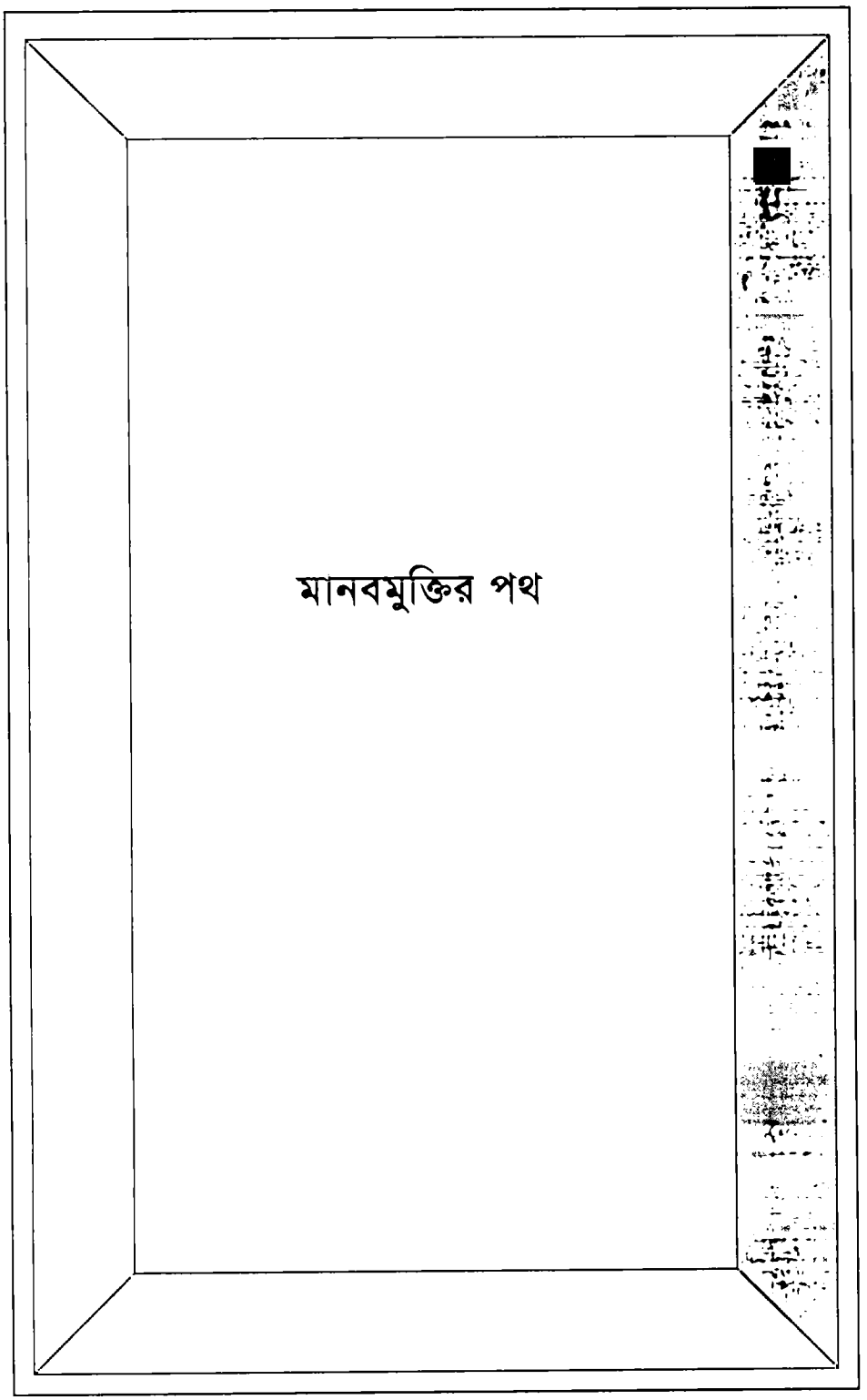

Dhaka University Institutional Repository

মানবমুক্তির পথ

মুক্তির অর্থ কি ?

কোরআনে মানবমুক্তি বলতে যা বুঝানো হয়েছে, সেটা খৃষ্টান ধর্মের মুক্তিবাণী থেকে আলাদা। কারণ, কোরআন আদম সন্তানের প্রথম পাপাচার ও তার পরিণামদশার প্রতি বিশ্বাস করেনা। কোরআন সগৌরবে ঘোষণা করে যে, মানব সন্তানরা পবিত্র সত্তা নিয়ে এবং সকল প্রকার পাপ পঙ্কিলতা মুক্ত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে থাকে। এ কারণে মানব মুক্তির প্রশ্নে কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক বেশি প্রসারিত ও উন্নততর। আর এটা হলো বিশ্ব সম্পর্কে কোরআনের বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রসূত, যে দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ব সম্পর্কে শুধু কোরআনই উপস্থাপন করে থাকে। এ দৃষ্টিভঙ্গি মোতাবেক আল্লাহ হলেন অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব (The Necessary Being; The Self-existent) এবং সৃষ্টির অস্তিত্ব দানকারী কারণ বটে। তিনি অস্তিত্বের যাবতীয় পূর্ণ গুণের সমাহার। যে কোন সৃষ্টির মধ্যে যে কোন পূর্ণতাই থাকুক না কেন, সেটা তাঁর থেকেই লাভকৃত। তবে তা প্রদান করার কারণে তাঁর নিজের মধ্যে পূর্ণতার কোন ঘাটতি সৃষ্টি হওয়া ব্যতিরেকেই। আল্লাহ নিরঙ্কুশভাবে জীবন, জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী এবং যেহেতু তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান, কাজেই তাঁর কর্ম ও সৃষ্টিগুলোও উদ্দেশ্যসম্পন্ন। মানব সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর যে উদ্দেশ্য, সেটা হলো মানব যেন সত্যিকার পূর্ণতা ও মুক্তিতে পৌছতে পারে। মানবের মুক্তি নিহিত রয়েছে শুধু আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও তাঁর বন্দেগীর মর্যাদা লাভ করার মধ্যে। অর্থাৎ মানুষ স্বীয় শক্তি ও স্বাধীনতা দ্বারা রিপু ও দুষ্ট শয়তানী প্রভাবের ওপর বিজয় লাভ করতে পারে এবং নিজ মনকে প্রতিপালন করে নিজেকে খোদায়ী পূর্ণতায় পৌছাতে পারে। মুক্তি অর্থাৎ নিজের (আমিত্ব) থেকে ছাড়িয়ে আল্লাহয় পৌছনো।

পাশ্চাত্যের মানবিক বিজ্ঞানে মানব মুক্তির বিষয়ে কোনই মাথাব্যাথা নেই

প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয় উল্লেখ করা যায় যে, পাশ্চাত্যের মানবিক বিজ্ঞানে মানব মুক্তির বিষয়ে কোনই মাথাব্যথা নেই। পাশ্চাত্যের মানবিক বিজ্ঞান বিশেষ অর্থে পার্থিব (বস্তুগত) বিজ্ঞান হিসাবে পরিগণিত হয়, তাই মানবের মুক্তি ভাবনার কোন আকুলতা সেখানে অনুপস্থিত। একটা ব্যকূলতা সেখানে মানবকে আন্দোলিত করে বটে; কিন্তু সেটা হলো বস্তুগত দিক দিয়ে মানুষ কিভাবে আরো আয়েশী জীবন লাভ করতে পারে।

অ্যারিষ্টটল সম্পদ, উত্তম বন্ধু এবং সুন্দর সুঠাম শরীরকেই সৌভাগ্যের প্রসূতি হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন এবং একটি চমৎকার ব্যাপার হলো কোরআনের ছায়াতলে বিচরণকারী দার্শনিকরা কোরআনের সঠিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বিধায় সৌভাগ্যের এ ধরনের ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছেন এবং একে সত্যিকার

Dhaka University Institutional Repository

সৌভাগ্য নয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। স্বভাবতই মানব সম্পর্কে তাদের এহেন দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন।

সক্রেটিসের দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে প্রতিষ্ঠিত যে মানব, সে হলো এমন মানব, যে কেবল মাটির পৃথিবীর সাথেই সম্পৃক্ত এবং মানবতাবাদ উত্তর চিন্তাভাবনার অধিকারী, যে দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানবের মৌলিকতা হলো তার এ দুনিয়ার চাহিদাসমূহের মৌলিকতার স্থলবর্তী।

কোরআনিক চিন্তাধারায় চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো মানবিক বিজ্ঞান। অথচ পাশ্চাত্যে চিন্তাধারার চূড়ান্ত লক্ষ্য কেবল জৌলুসেভরা এক পৃথিবী। কিন্তু বিজ্ঞানকে এভাবে (পার্থিব জৌলুসের মধ্যে) সীমাবদ্ধ করা কোরআনের চোখে পছন্দনীয় নয়। ভোগ বিলাস, সম্পদ, দুনিয়া, পদমর্যাদা, টাকা-পয়সা এসবই কোরআনের চিন্তাধারায় মূল্যবান বটে; কিন্তু মূখ্য বা মূল নয়। যেমন নাহজুল বালাগা গ্রন্থের বর্ণনা মতে, মহামতি খলীফা আলী ইবনে আবি তালিব বলেন : ক্ষমতা তখনই মূল্যবান, যখন তা ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের কাজে ব্যবহার হয়।

পাশ্চাত্যের দৃষ্টি সর্বদাই ছিল বস্তুগত মানবের দিকে

পাশ্চাত্যে মানবতাবাদ জন্ম নেয়। কারণ, তারা সর্বদা মানবের প্রতি বস্তুবাদী দৃষ্টি নিয়েই তাকিয়েছে। যা গ্রীক-ডাচ চিন্তা থেকেই উৎসারিত। জার্মান সোসিওলজিস্ট ও পলিটিক্যাল ইকোনমিষ্ট Max Weber (1864-1920) এর উক্তিটি পুনরাবৃত্তি করতে হয় :

> 'সভ্য মানুষের কাছে মৃত্যুর কোন অর্থ নেই। একারণে যেহেতু মৃত্যুও অর্থ নেই, সভ্য মানুষের জীবনও একইরূপে অর্থহীন। কেননা, কার্যত অর্থ হীন উন্নতি ও অগ্রগতির অবস্থায়, জীবন একটি অর্থহীন ঘটনায় পর্যবসিত হয়ে পড়ে। টলস্টয়ের সর্বশেষ রচনার সর্বত্র আমরা এ ধরনের চিন্তাধারার সাক্ষাত পাই, যা তার শিল্পে বিশেষ ছন্দ দান করেছে।'[১]

কোনকালেই পাশ্চাত্যে মানবের পরাপ্রাকৃতিক উপলব্ধি বিদ্যমান ছিল না যে মানব মৃত্যুর পর পূর্ণতা লাভ করে। এমনকি নিও প্লাটোনিক যুগেও এরূপ উপলব্ধি বিদ্যমান ছিল না। চার্চের ডাহা ভ্রান্তি পাশ্চাত্যের মানবকে আরও পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে ছেড়েছে।

প্লাটোর ঈশ্বর হলেন নির্মাণকারী ঈশ্বর। যে ঈশ্বর পদার্থিক জগতকে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে, প্লাটোর দৃষ্টিতে মানব হলো বস্তুসার। এরূপ নয় যে, আধুনিকতা এসে পাশ্চাত্যের উচ্চতর, আধ্যাত্মিক ও ঐশী মানবকে মাটির দিকে টেনে নামিয়েছে। কিন্তু মানব সম্পর্কে চার্চের ডাহা ভ্রান্তি ঈশ্বরের সাথে মানবের বন্ধনকে অধিকতর শিথিল করে দিয়েছে।

অপরদিকে কোরআনের অনুসারীবৃন্দ কখনোই আল্লাহ ও মানব সম্পর্কে পাশ্চাত্যের এহেন উপলব্ধির সাথে একমত ছিল না। এ ক্ষেত্রে ফারাবী ছিলেন প্রথম মুসলিম মনিষী, যিনি পাশ্চাত্যের সাথে মুসলিমদের এ পার্থক্যকে স্পষ্ট ভেদরেখা টেনে দেন। মহান এ মুসলিম চিন্তাবিদ মানব ও নৈতিকতা সম্পর্কীয় প্লাটোনিক

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাখ্যাসমূহের কোনটিকেই গ্রহণ করেন নি। আর সোহরাওয়ার্দী অ্যারিষ্টটলীয় দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করতঃ প্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গি যা ডিভাইন ভিউ এর ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা পাশ্চাত্যের সাথে তুলনা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

পাশ্চাত্যের সমসাময়িক চিন্তাবিদগণ 'মানবমুক্তি'র বিষয়টিকে বুঝার ভ্রান্তি বলে মনে করেন। আজকের যুগে পাশ্চাত্যে আল্লাহ ও মানবের মাঝে সম্পর্কের বিষয়ে এবং তার কল্যাণ ও সমৃদ্ধির বিষয়ে মৌলিক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। কারণ মার্কস, ফ্রয়েড, নিটশে প্রমুখ পশ্চিমা চিন্তাবিদগণ বিশ্বাস করেন যে, মানবের সৌভাগ্য ও মুক্তির বিষয়টি হলো একটি বুঝার ভ্রান্তি মাত্র। তাদের মতে, ঈশ্বরবাদীদের চিন্তাযন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করে না। তাই তারা অগত্যা ধর্মের আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

এক্ষেত্রে আরেকটি উপলব্ধি হলো সেই সব জটিলতা, যা তারা মানবের নৈতিকতা সম্বন্ধে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন। কেননা, তারা শুধু মানুষকেই মুখ্য ও মূল বলে থাকেন। ফলে তারা মানবের কেবল বস্তুগত প্রয়োজনের বেড়াজালেই আটকা পড়েন- নৈতিকতা যেখানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

আর এ কারণেই পাশ্চত্যে আজ মানবের নতুন উপলব্ধি দৃশ্যমান। আর সেটা হলো তাদের আত্মিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও ঐশী ধর্মের প্রতি প্রত্যাবর্তন। এতে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের উৎপত্তিকে যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে করে। আর এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতো চিন্তাবিদদের মতের বিপরীতে অবস্থান নেয়। পাশ্চাত্যে আল্লাহ ও মানুষ সম্পর্কে বৈপরীত্যপূর্ণ চিন্তার স্তুপ বিদ্যমান রয়েছে। নিটশে, হেগেল, কিয়ের্কিগের্ড ও সার্তার কিম্বা পোষ্ট মডার্ণনিজম দৃষ্টিভঙ্গি, যারা চেষ্টা করেছেন আধুনিকতাবাদের জটিলতাকে হ্রাস করতে।

পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের সাথে প্রাচ্যের দার্শনিকদের পার্থক্য রয়েছে। যেমন পাশ্চাত্যের মানবিক বিদ্যা রাষ্ট্রের চাহিদাসমূহকে পূরণ করতে সক্ষম নয়, অথচ কোরআন ও ইসলাম সৌভাগ্য, মুক্তি ও সারসত্য সম্পর্কে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছে। বিজ্ঞানেরও উচিত মানবের সৌভাগ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করার কাজে ব্যবহৃত হওয়া। বিজ্ঞানের পরম লক্ষ্য হলো মানব ও সমাজকে প্রতিপালন করা। অথচ পাশ্চাত্যের মানব প্রতিপালন ব্যবস্থা এমন এক মানব প্রতিপালন করতে চায় যে শুধু সর্বোচ্চ মুনাফা কিভাবে অর্জন করা যায় ও সর্বাধিক সম্ভোগ কিভাবে উপভোগ করা যায়, তার পেছনেই ছুটে বেড়ায়। কিন্তু আল্লামা তাবাতাবাঈ'র সুযোগ্য শিষ্য ড. মূর্তাজা মোতাহহারী'র[২] ভাষায় : কোরআনের মানব প্রতিপালন পদ্ধতি প্রয়াস চালায় এমন মানব গড়ার জন্যে, যে মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হবে এবং কল্পকাহিনীমূলক চিন্তাধারার জালে বন্দী থাকবে না। এরূপ মানব সেই বিজ্ঞানের ছায়ায় গড়ে ওঠে, যে বিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হবে মানবিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ।

মানবমুক্তির জন্য ঐশ্বরিক পদক্ষেপ

যখন আদি মানব আদম ও হাওয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, আল্লাহ অমোঘ পরিণতি হিসাবে দুটি ভিন্ন ভিন্ন পথ তাদের দু'জনের সামনে এবং তাদের অনাগত সন্তানবর্গের সামনে রাখলেন। একটি পথ মানবের সৌভাগ্য ও মুক্তির মঞ্জিলে গিয়ে শেষ হয়েছে। আরেকটি পথ তাদের দুর্ভাগ্য ও ধ্বংসের পথ। এমতাবস্থায়

Dhaka University Institutional Repository

খোদায়ী হেদায়াত ও আনুগত্য তার জন্য মঙ্গল ও মুক্তির সুসংবাদ নিয়ে আসে। পক্ষান্তরে ইবলিসী পথ অনুসরণ করলে তার পরিণাম হয় ভয়াবহ এবং নরকের আগুনই হয় তার প্রাপ্য। 'তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা সেভাবেই ফিরে আসবে। একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের পথভ্রান্তি নির্ধারিত হয়েছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছিল এবং মনে করতো তারাই সৎপথ প্রাপ্ত।'[৩]

কিছু কিছু আয়াতে এ দুটি পথের আরো স্পষ্ট পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। যেমন : সূরা তাহা'র ১২৩-১২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে : '..আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ কষ্ট পাবে না। আর যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবো অন্ধ অবস্থায়।' সুতরাং কোরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার দাবী হলো মানবের পূর্ণতা ও মুক্তি লাভে তাদের সুপথ প্রদর্শনের প্রতি চেষ্টাশীল থাকা।

মুক্তির পথ

কোরআন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী (মুমিন)দের সুপথ প্রদর্শনকে 'হেদায়াত' আর এ পথে চলাকে 'সিরাতুল মুস্তাকীম' তথা সোজা পথে চলা বলে অভিহিত করেছে। অভিধানে 'সিরাত' কথাটির অর্থ হলো আলোকিত পথ। এর মূলধাতুর অর্থ হলো 'গিলে ফেলা'। যেন এ পথে যারা চলে তাদেরকে এমনভাবে গিলে ফেলে যে, কোন রকম বিচ্যুতি ও বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা নাকচ হয়ে যায়। আর অভিধানে 'মুস্তাকীম' এর অর্থ হলো এমন ব্যক্তি বা জিনিসকে বুঝায়, যে স্বীয় পায়ের ওপর শক্তির ভর দিয়ে দাঁড়ায় এবং নিজের ওপরে ও তার সাথে যা কিছু সংশ্লিষ্ট, তার ব্যাপারে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী থাকে। একারণে যা কিছু এক অবস্থায় অটল ও অবিচল দণ্ডায়মান থাকে, তাকে মুস্তাকীম বলে। অতএব সিরাতুল মুস্তাকীম হলো এমন এক আলোকিত পথ যা অবিরত এ পথে যারা চলে তাদেরকে লক্ষ্যে ও মঞ্জিলে পৌছে দেয়। 'যারা আল্লাহে ঈমান আনে ও তাঁকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে, তাদেরকে তিনি অবশ্যই তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করবেন এবং তাদেরকে সোজা পথে তাঁর দিকে পরিচালিত করবেন।[৪]

সোজা পথই হলো কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছনোর একমাত্র পথ। এর থেকে পথভ্রষ্ট হওয়ার অর্থ হলো সৌভাগ্য ও প্রকৃত কাঙ্খিত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া। এ কারণে যারা অন্যায় ও পাপের পথে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে : 'নিশ্চয় যালিমরা আদৌ সফলকাম হয় না।'[৫]

কিন্তু জুলুম ও পাপের পথ কেন সৌভাগ্য আনে না এবং কেবলমাত্র সিরাতুল মুস্তাকীমের পথেই চলতে হবে সে সম্পর্কে আল্লামা তাবাতাবাঈ একটি চমৎকার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন : 'অত্যাচারীরা যে আশা পূরণের জন্যে জুলুমের পথে পা বাড়ায়, তাদের সে আশা পূরণ হয় না। কারণ, জুলুম কোন পথ নয় যে মানুষকে সৌভাগ্য ও আকাঙ্খায় পৌছাবে। কারণ সৌভাগ্য তখনই সৌভাগ্য হয় যখন তা

Dhaka University Institutional Repository

সত্যিকারেই ও বাহ্যিক অস্তিত্বের বিবেচনায় কাঙ্খিত হিসাবে গণ্য হয়। সেক্ষেত্রে আকাঙ্খাকারী ও অন্বেষণকারী এর অস্তিত্বগত প্রকৃতি ও চরিত্র বিবেচনা করে নিজেকে এমন সব উপায় ও সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত করে, যা উক্ত সৌভাগ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও যথোপযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ: যে মানুষটির আকাঙ্খা হলো তার শরীরের হারানো (অর্থাৎ তার থেকে নিঃসরিত হয়ে যাওয়া) অংশগুলোকে পূরণ করার মাধ্যমে তার জীবন বাঁচিয়ে রাখার নিশ্চয়তা বিধান করা, সে তখনই এরূপ আকাঙ্খায় পৌছতে পারবে, যখন প্রথমে এ আকাঙ্খার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পরিপাকতন্ত্রের অধিকারী থাকবে। অতঃপর এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যেসব উপায় উপকরণ সংগ্রহ করবে। এছাড়াও তার অস্তিত্বের বাইরের জগতে তার রুচির সাথে মানানসই প্রয়োজনমতো খাদ্যদ্রব্য বিদ্যমান থাকবে এবং সেসব উপায় ও সরঞ্জামকেও এজন্য কাজে লাগাবে। অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যগুলোকে বাইরের জগত থেকে সংগ্রহ ও পরিষ্কার করে এর বিদ্যমান রূপটি সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে ফেলবে এবং ঠিক সে অংশগুলোর রূপে পরিণত করবে যা তার শরীর থেকে নিঃসরিত হয়ে গেছে এবং একে তার শরীরের অংশে পরিণত করে শরীরের ঘাটতিগুলো পূরণ করবে। এটা কেবল মানুষের বেলায়ই নয়, সকল প্রাণীর জন্যই প্রযোজ্য।

সুতরাং প্রত্যেক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই যা কাঙ্খিত হয় এবং প্রত্যেক সৌভাগ্যই যা গন্তব্য হয়, তার বিশেষ পথ থাকে, যে পথে ছাড়া উক্ত গন্তব্যে পৌছা যায় না। সৃষ্টির নিয়ম এ সূত্রের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। তাই এ নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করার অর্থ হলো প্রকৃতপক্ষে এ সূত্রকেই লঙ্ঘন করা এবং এর স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক পথকে নাকচ করা। আর বলাই বাহুল্য যে, এর অর্থ হলো তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কারণকে বাঞ্চলো সেই মানুষটির মতো, যে সঠিক নিয়মে খাদ্য গ্রহণ না করেই নিজের বেঁচে থাকা নিশ্চিত করতে চায়। সে তার খাদ্য ও পরিপাকতন্ত্রকে নিষ্ক্রিয় রেখেছে, ফলে তার দৈহিক বৃদ্ধি ও শক্তি যোগানোর ব্যবস্থায় ব্যত্যয় ঘটে। এটা ঠিক সেই ব্যক্তির ন্যায় যে তার লক্ষ্যে পৌছনোর জন্য নির্দিষ্ট পথ রেখে বিপথে চলে। আল্লাহর কৃপাও এর ওপরে ধার্য হয়েছে যে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী, যারা চেতনা ও ইচ্ছার ভিত্তিতে জীবন যাপন করে, তারা যেন বাইরের সাথে কর্মের তুলনা করে (অবশ্য বাইরের প্রতি জ্ঞাত থাকতে হবে) জীবনকে অব্যাহত রাখবে। এমনভাবে যে, যদি তার কোন কর্ম বাইরের কোন কিছু আপতিত হওয়ার কারণে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, তাহলে উক্ত কর্ম বিফল ও বাতিল হয়ে যায়। আর যদি এ বিচ্যুতির পুনরাবৃত্তি ঘটে, তখন তাদের আপন সত্তা বাতিল হয়ে পড়ে। তখন সেই ব্যক্তির মতো হয়ে যায় যে খাদ্যের পরিবর্তে বিষ পান করেছে।

মানুষ বাইরের এ জগত ব্যবস্থা থেকে সামগ্রিক মতামত ও বিশ্বাসাবলীর অধিকারী হয়। যেমন আদি(সৃষ্টিসূচনা) ও অন্তের (কিয়ামত) প্রতি বিশ্বাস। অতঃপর সেগুলোকে বাদবাকী বিশ্বাসের জন্য মাপকাঠি হিসাবে নির্ধারণ করে। তদ্রুপ, কিছু বিধি-বিধানের অধিকারী হয়, যা দ্বারা নিজের ইবাদাত ও লেনদেনমুলক কর্মসমূহের পরিচালনা ও পরিমাপ করে থাকে। এটাই হলো মানবের সেই পথ যা তাকে সৌভাগ্যে পৌছে দেয়। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এ পথ থেকে বিচ্যুতি (অর্থাৎ জুলুম করা) তাকে প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌছে দেয় না। আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে পৌছায়, তবে তা স্থায়ী হবে না। কারণ, অন্যান্য পথও উক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সৌভাগ্যের সাথে সম্পর্কিত এবং পূর্ণ শক্তি দ্বারা ঐ বিচ্যুত পথের (জুলুমের) সাথে সংগ্রাম ও বিরোধিতা করে তাকে পশ্চাদ অপসরণে ও হটে আসতে বাধ্য করবে। এছাড়াও জগতের অংশসমূহ যা ঐ বিশ্বাসসমূহ ও বিধি-বিধানের উৎসমূল, সেগুলোও তার কাজের সাথে বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয় এবং এ অবস্থা চলতে থাকে যতক্ষণ না উক্ত ব্যক্তি ঐ যে সৌভাগ্যকে বিচ্যুত পথের মাধ্যমে অর্জন করেছে, সেটা তার হাতছাড়া হয় এবং জীবন তার জন্যে তিক্ততা বয়ে আনে। কাজেই যে অনাচারী ব্যক্তি সত্য বিশ্বাস ও মহান আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী না হয় এবং অন্যদের বৈধ অধিকারসমূহের বিঘ্ন সৃষ্টি করে (অর্থাৎ তাদের প্রতি অবিচার ও অন্যায় করে) অথবা মহাপ্রতিপালকের আনুষ্ঠানিক ইবাদাতসমূহ যেমন নামায, রোযা ইত্যাদির অবজ্ঞা কিম্বা অবাধ্যতা করে, অথবা বিভিন্ন পাপকর্ম যেমন মিথ্যাচার, অপবাদ আরোপ, ঠগবাজি ইত্যাদি এবং সার্বিকভাবে যদি এসব ভ্রষ্ট ও বিচ্যুত পথের কোন একটিকে অবলম্বনের মাধ্যমে তার লক্ষ্যে পৌছে, তাহলে তার জানা উচিত যে, দুনিয়া ও পরকালে সে নিজের লোকসানই সাধন করেছে এবং এক জীবনের সমস্ত চেষ্টা ও সাধনাকে জলাঞ্জলি দিয়েছে।

কিন্তু দুনিয়ায় নিজের প্রতি এরূপ আচরণ করে যে পথে সে চলেছে সেটা ছিল অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও নিয়ম ভাঙ্গার পথ। এর প্রমাণ হলো যদি এটা সঠিক পথ হতো তাহলে সকলেরই এ পথে চলার ন্যায্যতা থাকতো। আর যদি সকলের জন্য এরূপ পথে চলা বৈধ হয়ে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে সামাজিক নিয়ম ব্যবস্থা বিকল ও অকার্যকর হয়ে পড়বে। আর বলা বাহুল্য, যখন সমাজের ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে যাবে তখন মানবের সামাজিক জীবনও পণ্ড হয়ে যাবে। কাজেই যে শৃঙ্খলা মানব জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করবে সেটা যে রূপেই থাকুক না কেন, তা এ ধরনের ব্যক্তির সাথে সে যা অবৈধ পথে অর্জন করেছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং শীঘ্রই হোক আর বিলম্বে হোক, যতক্ষণ অবধি তার এ কর্মকে জুতো থেকে ধুলে ঝেড়ে ফেলার মতো ঝেড়ে না ফেলে ততক্ষণ শান্ত হয় না।

আর পরকালে সে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, কারণ জুলুম তার কর্মলিপিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ফলে তার মন ও অন্তরে এর কালিমা ও কলুষ লেপণ হওয়া ছাড়াও, কিয়ামতে তদানুসারে শাস্তি ভোগ করবে এবং তার কলুষপূর্ণ আত্মার চাহিদা মাফিক তার জীবন যাপন অব্যাহত রাখবে। 'সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।'[৬] 'ফলে আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করাবেন এবং পরকালের শাস্তি তো কঠিনতর, যদি এরা জানতো।'[৭] এ ধরনের আরো অনেক আয়াত রয়েছে। এসব আয়াত সবগুলোই ব্যক্তিক ও সামাজিক উভয় প্রকারের জুলুমের কথা নির্দেশ করে। আর এটা আলোচ্য বক্তব্যের সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে।

মুক্তির নিয়ামকসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস ও সৎকর্ম :

পবিত্র কোরআনে মানবের সৌভাগ্য ও মুক্তির জন্যে বিশ্বাস ও সৎকর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপায় ও নিয়ামক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ দুটিই মানবের পরিত্রাণের পথে মূলধন এবং বেহেশত লাভের চাবিকাঠিস্বরূপ। মানব জীবনে এ বিশ্বাস ও সৎকর্মের বিস্তৃতি এতবেশি যে, তার ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ইবাদাতগত সকল উত্তম কাজই এর মধ্যে শামিল হয়, তদ্রুপ তার সকল মন্দ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে মুসলিম পণ্ডিতবৃন্দের বক্তব্য হলো : কোরআন সৎকর্মের সীমা পরিধি নির্ধারণ করে স্পষ্ট কোন সংজ্ঞা উপস্থাপন করেনি। বরং কেবল এর দৃষ্টান্তসমূহের উপরেই নির্ভর করেছে। কিন্তু একটি সামগ্রিক কথায় বলা যায় : যে কর্মই ঐশী প্রত্যাদেশ কিম্বা বিশুদ্ধ মস্তিস্ক ও সুস্থ সহজাত প্রবৃত্তি আমাদেরকে নির্দেশ করে, সেটাই সৎকর্ম। তদ্রুপ এরা যা নিষেধ করে তা বর্জন করাও সৎকর্মের অন্তর্ভূক্ত হবে। তবে সৎকর্মের দৃষ্টান্ত নিরূপণের জন্য শুধু বুদ্ধিই যথেষ্ট নয়। কারণ, বুদ্ধি কেবল ভাল ও মন্দসমূহের মধ্যে একটা সীমিত অংশেরই, সেটাও আবার সামগ্রিক ভাবে নির্ণয় করতে পারে। কিন্তু ভাল ও মন্দের সিংহভাগ অংশই তাদের খুঁটিনাটি সহকারে কেবল প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই নির্ণয় করা যেতে পারে। আর প্রত্যাদেশ এক্ষেত্রে ঐশীপুরুষের আনুগত্য করার কথাই তুলে ধরে।

আল্লামা তাবাতাবাঈ'ও সৎকর্মের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন : 'কর্মের যোগ্যতা কী? এ ব্যাপারে যদিও কোরআনে ব্যাখ্যা করে বলা হয়নি, কিন্তু এর জন্যে যেসব চিহ্ন (লক্ষণ) উল্লেখ করেছে, তাদ্বারা এর অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। এরূপ চিহ্নাবলীর মধ্যে একটি হলো : সৎকর্ম সেটাই যা মহামহিম আল্লাহর দরবারের উপযুক্ত হবে। এরূপ আরেকটি চিহ্ন হলো এ কর্মের জন্য প্রতিদান (সওয়াব) প্রদানের উপযুক্ততা থাকবে। 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র পুরষ্কারই শ্রেষ্ঠ।'[৮] আরেকটি চিহ্ন হলো সৎকর্ম পবিত্র বাণী (কালেমা তাইয়্যেবা) কে উর্ধ্বে নিয়ে যায়। 'তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ সমুত্থিত হয় এবং সৎকর্ম একে উন্নীত করে।'[৯]

সুতরাং সৎকর্মের যে কয়েকটি চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কর্মের যোগ্যতার অর্থই হলো এর কারামাতের ভূষণে ভূষিত হওয়ার গুণ থাকা।[১০]

বিশ্বাস ও সৎকর্মের সম্পর্ক

মুসলিম পণ্ডিতবৃন্দের অভিমত অনুযায়ী কোরআনের বেশিরভাগ আয়াতে বিশ্বাসের পাশে সৎকর্মের কথা উল্লেখ করার পেছনে কারণ হলো, কেবল উৎপত্তি (স্রষ্টা), পরিসমাপ্তি (কিয়ামত)'র প্রতি ও ঐশীপুরুষের (রাসুল) প্রতি বিশ্বাস মানুষের জন্য উপকারী হয় না, যদি সৎকর্ম তার সাথে না থাকে। আরো সূক্ষ্ম করে বলা যায় যে, অন্তরের বিশ্বাস যদি বাইরের কর্মের থেকে আলাদা হয়, তাহলে সেটা এই সাক্ষ্য বহন করে যে, উক্ত বিশ্বাস এখনো সত্যিকার পূর্ণতা লাভ করেনি। কেননা, সৎকর্ম হলো পূর্ণ ও সত্যিকার বিশ্বাসের পরিচায়ক। তাই অন্তরের বিশ্বাস ও জিহ্বায় তা উচ্চারণের পাশাপাশি সৎকর্ম পালন করাও অত্যাবশ্যক। মানবের

Dhaka University Institutional Repository

(পারলৌকিক) মুক্তি আসলে সেই বিশ্বাসের আঁচলে বাঁধা, যার সাথে থাকে সৎকর্ম। সুতরাং বিশ্বাস বিনা সৎকর্ম কিম্বা সৎকর্ম বিনা বিশ্বাস মানবের মুক্তি তথা সৌভাগ্যের পথে কোন অবদানই রাখতে পারে না। মোটকথা, প্রতিদান ও পুরস্কারের জন্য শর্ত হলো বিশ্বাসের সাথে সৎকর্মের যোগ হওয়া। অর্থাৎ উত্তম প্রতিদান লাভ করতে হলে কর্তা ও কর্ম উভয় দিক দিয়ে সুন্দর ও নিখুঁত হতে হবে। 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত..'[১১] 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্যে রয়েছে ফেরদাউসের উদ্যান'।[১২]

বিশ্বাস ও সৎকর্মের দৃষ্টান্ত

যেমনটা ইশারা করা হলো, মানবের মুক্তি ও সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস ও সৎকর্ম, যার একাধিক ও বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। কোরআনে উল্লিখিত এরূপ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তের পরিচয় নিম্নরূপ :

১. ব্যক্তিজীবনে কর্তব্য করণীয় হিসাবে :

১. আত্মিক শক্তি (আল্লাহ ভীতি)
২. সদাচার ও পরোপকার
৩. আত্মসংশোধন ও আত্মগঠন
৪. আত্মত্যাগ ও আত্মদান
৫. রিপুপূজা ও অনৈতিক কামনা বাসনা বর্জন (এ ব্যাপারে আল্লাহ ভীতি অনুপ্রেরণা যোগাবে)
৬. আদর্শের পথে বিপদাপদ ও কষ্টের সময়ে ধৈর্যধারণ ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন
৭. মন-সংকল্প, কর্ম ও বিশ্বাসে নিষ্ঠাবান হওয়া
৮. আল্লাহর জন্যে অটল ও অবিচল হওয়া
৯. সততা ও সত্যবাদিতা
১০. ইবাদাতের কাজে যত্নবান হওয়া
১১. ভাল ও উত্তম কর্মের সাথে নিজের সম্পর্ক স্থাপন আর মন্দ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

২. শাফায়াত

শাফায়াত বা সুপারিশ হলো মানবের মুক্তির আরেকটি কারণ। কোরআনে যা অতিশয় গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লামা তাবাতাবাঈ বলেন : ঐশীসূত্রে প্রাপ্ত ভাষ্যসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পরকালে (কিয়ামত) বিশ্বাসী দলের মধ্যে একদল পাপিষ্ট মানব শাফায়াত লাভ করবে। অর্থাৎ হয় তারা

Dhaka University Institutional Repository

জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ থেকে রক্ষা পাবে, নয়তো আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরে সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। তবে এ সৌভাগ্যে তারাই অন্তর্ভুক্ত হবে যারা সত্য দীনের পথে চলেছে।[১৩]

৩. অনুতাপ প্রকাশ (তাওবাহ)

কোরআনের শিক্ষা দর্শনে মানবের জন্য কৃত ভ্রান্তি ও পাপকর্মের কারণে অনুতপ্ত হওয়া মুক্তির একটি অন্যতম নিয়ামক হিসাবে গুরুত্ব পেয়েছে। এ কাজটি একটি সৎকর্ম হিসাবেও পরিগণিত হয়। পথভ্রষ্ট মানুষ যদি তার বিচ্যুতি উপলব্ধি করে আবার সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে ধ্বংসের প্রান্তসীমা থেকেও সে মুক্তির আলোয় ফিরে আসতে পারে। একারণে অনুতপ্ত হওয়ার বিষয়টিকে কোরআনের ভাষায় মানবের জন্যে 'আবে হায়াত' তথা জীবন দানকারী পানি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুক্তির প্রতিবন্ধকসমূহ

১. পাপাচার

যেহেতু আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার নামই পাপাচার, তাই এটা মানবের মুক্তির পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় এবং ধ্বংসের প্রধান কারণ বলে পরিগণিত হয়। এক কথায় বলা যায়, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ও সমস্ত খোদায়ী অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণগুলো এই একটি কথার মধ্যেই নিহিত। তাই কোরআন পাপাচার ও আল্লাহর অবাধ্যতাকে মানবমুক্তির প্রধান প্রতিবন্ধক এবং তার ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ বলে পরিচয় তুলে ধরেছে। অবশ্য কোরআন পাপাচারকে দুভাগে বিভক্ত করেছে। যথা : কবিরা বা মহাপাপ এবং সগীরা বা ছোট পাপ। ছোট পাপের বেলায় ক্ষেত্রবিশেষে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার কথা বলা হলেও মহাপাপের বেলায় জাহান্নামের আগুন অবধারিত নির্ধারণ করা হয়েছে। যদি না কায়মনে তওবা করে।

২. নাস্তিকতা, অংশীবাদ ও কপটতা

এ তিনটি কাজই সকল পাপাচার, অবাধ্যতা ও মন:বিকৃতির উৎস। কোরআন এগুলোকে চিরন্তন আযাবের কারণ হিসাবে হুঁশিয়ারী প্রদান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা ও তথ্যসূত্র :

[১]. **"Max" Weber, Karl Emil Maximilian,** *Basic Concepts in Sociology*, Translated & introduced by H. P. Secher, Peter Owen Ltd. reprinted 1978,

[২]. **Motahhari, Dr. Morteza** (February 3, 1920 – May 1, 1979) was an Iranian scholar, cleric, Professor of Tehran University and politician.

[৩]. আল কোরআন, ৭: ২৯-৩০;

[৪]. আল কোরআন, ৪ ঃ ১৭৫;

[৫]. আল কোরআন, ৬ ঃ ২১;

[৬]. আল কোরআন, ২ ঃ ৮৫;

[৭]. আল কোরআন, ৩৯ ঃ ২৬;

[৮]. আল কোরআন, ২৮ ঃ ৮০;

[৯]. আল কোরআন, ৩৫ ঃ ১০;

[১০]. তাবাতাবাঈ, আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হোসাইন, *আল-মীযান ফি তাফসীরিল কুরআন*, সেন্টার ফর ইসলামিক পাবলিকেশন্স, কোম (ইরান), দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৪ইং, খ: ১, পৃ: ৪৫৮;

[১১] আল কোরআন, ২ ঃ ২৫;

[১২] আল কোরআন, ১৮ ঃ ১০৭;

[১৩] তাবাতাবাঈ, আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হোসাইন, *আল-মীযান ফি তাফসীরিল কুরআন*, সেন্টার ফর ইসলামিক পাবলিকেশন্স, কোম (ইরান), দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৪ইং, খ: ১, পৃ: ২৭৭;

Dhaka University Institutional Repository

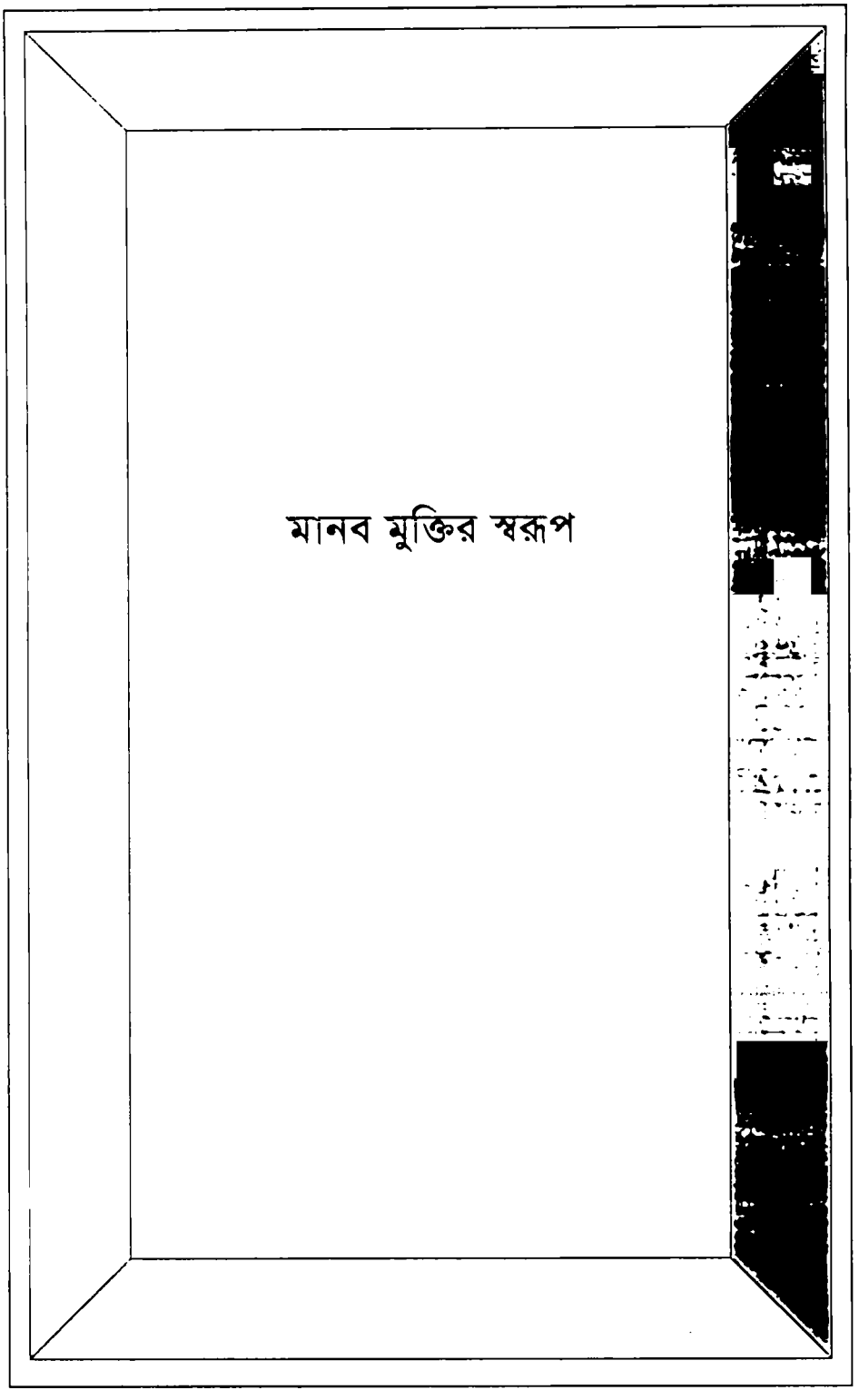

Dhaka University Institutional Repository

মানবমুক্তির স্বরূপ

প্রফেসর মুহাম্মাদ তাকী জা'ফারী বলেন :[১]

> 'সবচেয়ে নিঃস্ব হলো সেই মানুষ, যে তার মানবসত্তা চিৎকার করতে থাকে ও জীবনের দর্শন ও লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে চায়, অথচ সে এই প্রাকৃতিক জীবন ও এর কর্মকাণ্ডের দিকেই অঙ্গুলি ইশারা করে দেখায়!!"[২]

এই যে জীবন, যার উৎপত্তি ও উৎসরণ এবং বৃদ্ধির স্থল হলো কর্দমাক্ত মাটির ভূমিপৃষ্ঠ, এর দর্শনকেও খুঁজতে হবে এ মাটির বুকে এবং এর অবচেতন নিয়ম-নীতির মধ্যেই। মানবের উচ্চতর সত্তার মধ্যে নয়। কারণ, প্রাকৃতিক জীবনের সারকথা মাটির প্রকৃতিতে নিহিত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনের উন্নততর অর্থ খুজতে পাড়ি দিতে হবে উর্ধ্বলোক; মানব সত্তার উৎকৃষ্ট দিগন্ত প্রান্তে।

Richard H. Popkin [৩] এর মতে :

> "জীবন নামের এ জিনিসটির সঠিক ব্যাখ্যার জন্যে বিভিন্ন চশমা (দৃষ্টিভঙ্গি)-র প্রয়োজন। যাতে এ জিনিসটি, যা সবকিছুর চেয়ে স্পষ্ট আবার সবকিছুর চেয়ে ঘোলাটে, এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। হয়তো প্রশ্ন উঠবে, তাহলে 'এ সবকিছুর চেয়ে স্পষ্ট' জিনিসটির অনুসন্ধানে নেমেছেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, যেহেতু আমাদের আলোচনার বিষয়ই হলো জীবনের লক্ষ্য ও রহস্য উদঘাটন, একারণে জীবনের লক্ষ্য নির্ণয় করতে হলে খোদ জীবনের ওপরে সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। এ বিশ্লেষণ ছাড়া জীবন অব্যাহত থাকার মূল্য থাকে না। যেমনটা মহামতি সক্রেটিস বলেছেন, 'বিশ্লেষণ না হওয়া জীবন বেঁচে থাকার মূল্য রাখে না"[৪]

মহাকবি হাফিজ বলেন :

> মনুষ্যত্ব মটির ভুবনে হয় না অর্জন
> অন্য একটি জগতই, গড়ে মানব নতুন

যদি মানুষ প্রাকৃতিক জীবন থেকে উর্ধ্বে আরোহণ করে, তাহলে সে নিজে পুনর্বার নির্মিত হয়। তখন জগত তাকে আরেকটি রূপ দেখায়। মোটকথা, মানবের অস্তিত্ব ও জীবনের যে লক্ষ্য, তা কোরআনের দৃষ্টি অনুযায়ী কোনক্রমেই এ প্রাকৃতিক জীবন দ্বারা অর্জন সম্ভব নয়। এখানে আরেকটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাহলে কেন এ পার্থিব জীবনকে সৃষ্টি করা হলো? উত্তর হলো : জড়পদার্থ ও উদ্ভিদরাজির সৃষ্টি, হয়তো এদের নিজের দিক দিয়ে বিচার করলে অনর্থক বলে মনে হয়, কিন্তু যখন দেখা যায় যে তারা জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তুতিক্ষেত্র হিসাবে ভূমিকা রাখে কিম্বা জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে, সে দিক থেকে বিচার করলে উত্তর স্পষ্ট হয়ে যায়।

আমরা যদি এ (পার্থিব ও প্রাকৃতিক) জীবনটাকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে ধরি, তাহলে কোরআনের দৃষ্টি অনুযায়ী আমরা নিজেকে স্বেচ্ছায় এক নিরঙ্কুশ শুন্যতার আসক্ত করে তুললাম। কিন্তু যদি এ জীবনে বুঁদ না হই এবং একে প্রকৃত জীবনের উপযুক্ততম বৈতরণী (passage) হিসাবে গ্রহণ করি 'আর পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন'[৫], তাহলে একজন মানবসত্তার জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট যে লক্ষ্য কল্পনাযোগ্য, সে পথেই অগ্রসর হলাম।

আচ্ছা, এরূপ উৎকর্ষতা লাভ কি এ দুনিয়ায় সম্ভবপর?

অবশ্যই, শুধু সম্ভবপরই নয়, বরং অনন্ত অসীম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এরূপ তুচ্ছ জীবন সৃষ্টির আসল অনুপ্রেরণা ও উদ্দেশ্য সেটাই।

এ জীবনই একটি সন্তোষজনক দর্শন ও লক্ষ্যের অধিকারী হতে পারে। যেটা জড়বস্তু থেকে উদগত ও জড় বস্তুতেই বুঁদ যে জীবন, তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং, যারা ঐশীপুরুষদের আহবান শোনার প্রস্তুতি রাখে এবং নিষ্কলুস বিবেকের অধিকারী, তারা এই পার্থিব জীবন থেকেই প্রকৃত (অর্থাৎ লক্ষ্য সম্বলিত) জীবনের সূত্রপাত করে থাকে।

'বিশ্বাসী হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয় আনন্দপূর্ণ (পবিত্র) জীবন দান করবো।'[৬]

'(খোদায়ী পরীক্ষাসমূহ এজন্যে) যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে।'[৭]

বলা বাহুল্য, এখানে জীবিত ও ধ্বংস (মৃত্যু) বলতে প্রাকৃতিক অর্থে জীবন ও মৃত্যুকে বুঝানো হয়নি। বরং ঐ সাধারণ জীবনকেই বুঝানো হয়েছে প্রকৃত জীবনের বিপরীতে, যা এ জীবনকালেই মানুষের পথ ও পদ্ধতি বেছে নেয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

'যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমি পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্যে আলোক দিয়েছি, সেই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির মতো, যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সে স্থান হতে বের হবার নয়?'[৮]

উপরোক্ত আয়াতে আমরা ঐ আলোকেই জীবনের আবর্তন কেন্দ্র বলি কিম্বা ঐ দু'প্রকার জীবন্তকে জীবনে অংশীদার গণ্য করি না কেন এবং তাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য আলো ও অন্ধকার বলে মনে করি না কেন, এতে আমাদের বক্তব্যে কোন ঘটে না। সে বক্তব্যটা হলো : জীবন দু'প্রকার : আলোকময় ও অন্ধকার। আসলে অন্ধকার জীবন হলো মৃত্যুর নাম, আর আলোকময় জীবন হলো সত্যিকার জীবনের নাম। ভিক্টর হুগো'র ভাষায় : 'জীবনের সম্পর্কে একথা বলবো না যে, সৌভাগ্যবান কে আর দুর্ভাগা কে? বরং বলবো আলোময় কে আর অন্ধকারে নিমজ্জিত কে?'[৯]

Dhaka University Institutional Repository

'হে বিশ্বাসিগণ! রাসুল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করে যা তোমাদেরকে জীবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসুলের আহবানে সাড়া দিবে...'[১০]

উপরোক্ত আয়াতের তাৎপর্য অনুসারে মানুষের জন্য ঐশীপুরুষের আনীত 'আদর্শ' কে গ্রহণ করা ব্যতীত কোন জীবন নেই।

আধ্যাত্মিকতার মহাকবি জালালুদ্দীন রুমী বলেছেন :

I am the servant of the Qur'an as long as I have life.
I am the dust on the path of Muhammad, the Chosen One.
If anyone quotes anything except this from my sayings,
I am quit of him and outraged by these words.[11]

পূর্ববর্তী আলোচনার বিষয়ের সারকথা হলো কোরআনের দৃষ্টিতে সাধারণ (প্রাকৃতিক) জীবন হলো প্রকৃত জীবনের কাঁচামালস্বরূপ, যে জীবন মানুষকে অর্জন করতে হবে। কাজেই জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো খোদ সেই জীবনটা যা স্বাভাবিক জীবন থেকে উৎরে গিয়ে উন্নততর পর্যায়ে প্রবেশ করে। অতঃপর তার এ উৎকর্ষতার পথে যাত্রা অব্যাহত রাখে এবং এক পর্যায়ে ঐশ্বরিক পরিসীমায় প্রবেশ করে। এটাই হলো বিশ্বখ্যাত পারসিক কবি জালালুদ্দিন রুমি'র নিম্নোক্ত কবিতার মর্মকথা :

I died as a mineral and became a plant,
I died as plant and rose to animal,
I died as animal and I was Man.
Why should I fear? When was I less by dying?
Yet once more I shall die as Man, to soar
With angels bless'd; but even from angelhood
I must pass on: all except God doth perish.
When I have sacrificed my angel-soul,
I shall become what no mind e'er conceived.
Oh, let me not exist! for Non-existence
Proclaims in organ tones,
To Him we shall return.

অনন্ত এ মানব যাত্রা। এখানে তার বাহন হলো তার আদর্শ। 'বলো আমার সালাত, আমার উপাসনা, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।'[১২]

Dhaka University Institutional Repository

- এ আয়াতের সারকথা সংক্ষেপে এরূপ : আমার সবটুকুরই মালিক আল্লাহ। এটাই হলো এ দুনিয়ায় মানব জীবনের লক্ষ্য। আল্লাহ যার নাম দিয়েছেন বন্দেগী। বলেছেন : 'আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানবকে এজন্যে যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।'[১৩]

সাধারণ মানুষরা অধিকাংশই এমন ধারণা করে যে, বন্দেগী হলো শুধু কতিপয় নিঃরস শারিরীক কসরৎ ও কিছু স্বাদহীন পেশাদারী যিকির উচ্চারণের নাম। তারা মনে করে এরূপ বন্দেগীই তো মানব সৃষ্টির মূল অনুপ্রেরণা ও উদ্দেশ্য। অথচ তাদের এ বোকামিপূর্ণ ব্যাখ্যাই খোলস সর্বস্ব চিন্তাবিদদের আপত্তির খোরাক যুগিয়েছে। কেননা, তারা দেখেন, এটা কতই না শিশুসুলভ যুক্তি যে, কোটি কোটি প্রাকৃতিক ও মানবীয় নিয়ামকসমূহ হাতে হাত মিলিয়ে অবশেষে এমন এক মানবের উৎপত্তি ঘটাবে, আর সে মানবরা অযুত অজস্র ক্ষতিকর ও উপকারী নিয়ামকের মাঝে সীমাবদ্ধ আনন্দ আর সীমাহীন দঃখ-দুর্দশার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করবে, আর এ গভীর ব্যঞ্জনাময় জীবনের উদ্দেশ্য হবে কেবল কয়েকবার শারীরিক কসরতের মাধ্যমে উঠবস করা ও জিহ্বায় কিছু নিষ্ফল মন্ত্র পাঠ করা?!

কিন্তু আসলেই কি বন্দেগীর অর্থ কিছু শারীরিক কসরৎ আর মুখে কিছু বুলি আওড়ানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার সময়ে পালন করা হয়?

অবশ্যই না। কারণ, জগতের প্রতিটি অংশ, সেটা নিহারিকা ও ছায়াপথের মতো বিশাল কিছুরই অংশ হোক, আর মটিরগৃহে বসতকারী ছয়ভুজ পিপিলিকার অতিশয় ক্ষুদ্র শূলের অংশই হোক, তদ্রুপ সবচেয়ে অধম নাপাক কিম্বা পুত পবিত্র আদম সন্তানটির মাথার চুল, আঙ্গুলের শুষ্ক নখ ও শরীরে রক্ত তন্ত্রের মধ্যে প্রবাহমান রক্তস্রোত এসমস্ত কিছুই ইবাদতে লিপ্ত রয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা হলো, কল্পনা ও খেয়াল, আদর্শ ও চিন্তা আর বিমূর্ত ধারণা, যা সমস্তই বস্তু থেকে উৎসারিত তরঙ্গমালা, সবই এ বন্দেগীতে লিপ্ত।

'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।'[১৪]

এটাই হলো সামগ্রিক ঐশ্বরিক নির্দেশাবলী পালন করা।

'অত:পর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন, যা ছিল ধোঁয়ার কুণ্ডলীবিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন : তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললো : আমরা এলাম অনুগত হয়ে।'[১৫]

'আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলোও সকাল এবং সন্ধ্যায়।'[১৬]

এরূপ কোরআনের অনেক আয়াত রয়েছে, যেগুলোর সারমর্ম হলো বিশ্বচরাচর ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম এবং বৃহৎ থেকে বৃহত্তম সবকিছুই ইবাদাতে লিপ্ত।

আয়াতে 'ইচ্ছায়' ও 'অনিচ্ছায়' সিজদাবনত হওয়া বলতে নিম্নোক্ত দুটি অর্থের কোন একটি বোঝানো হতে পারে :

Dhaka University Institutional Repository

১. মানুষকে একদলে আর বাদবাকী সৃষ্টিকুলকে আরেক দলে ভাগ করার ভিত্তিতে। কেননা, কিছু কিছু মানুষ স্বাধীন ইচ্ছা সহকারে আল্লাহর বন্দেগী করে এবং মানুষ ভিন্ন অন্যরা অনিচ্ছায় ও বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতেই বন্দেগী (নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি তাদের শতভাগ অধীন থাকা অর্থে) করে থাকে।

২. এখানে ভাগ করা হয়েছে সকল সৃষ্টিকে। তবে ভাগের ধরণটা এরূপ যে, সকল সৃষ্টিরই রয়েছে দুটি দিক। একটি হলো : নিখাদ প্রাকৃতিক দিক। এদিক থেকে বাধ্যবাধক সিজদা ও আত্মসমর্পণ তথা ইবাদাত বিদ্যমান। কারণ, ঐশ্বরিক ইচ্ছা ও নির্দেশের সামনে তারা একটি অবচেতন মাধ্যম মাত্র, যাদের কোন স্বাধীন ক্ষমতা নেই।

আরেকটি হলো : সৃষ্টির পরাপ্রাকৃতিক দিক। সৃষ্টির পরাপ্রাকৃতিক দিকটি বলতে এটা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, সেগুলো জাগতিক নিয়মের অধীন নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক সৃষ্টিই প্রাকৃতিক গতিধারার বিপরীতে আল্লাহমুখী এক গতিধারার অধিকারী। যেমন মস্তিষ্ক ও মানসিক ঘটনাবলীর স্বাভাবিক স্তরের যে গতিধারা, যা প্রাকৃতিক অঙ্গনের সাথেই সম্পৃক্ত। অথচ এদের গভীর স্তরবিশিষ্ট গতিধারা, যা 'আমি'র সাথে সম্পৃক্ত। যেমনটা ইবনে সিনা তাঁর 'দানেশনামা-ই আলাঈ'[১৭] গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'মানব প্রবালের (Human Coral) দুটি গতিধারা, একটি এই দিকে, আর অপরটি উপরের দিকে।'

প্রত্যেক সৃষ্টিই তার ঐ আল্লাহ অভিমুখী গতিধারার দিক থেকে এমন এক ইখ্‌তিয়ারের (free will or choice) অধিকারী, যার অর্থ অনেক সাধারণ ও সর্বজনীন। যেমন মানুষের বেলায় ইখ্‌তিয়ার এক ধরনের সত্যরূপে রয়েছে, আবার জীবজন্তুর বেলায় অন্যরূপে। আর উদ্ভিদরাজির মধ্যে এর তাৎপর্য আরেক রকম এবং জড়বস্তুর বেলায় এর তাৎপর্য অন্য রকম। সকল সৃষ্টিকে ইখ্‌তিয়ারসম্পন্ন বলাটা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দিক দিয়ে অসম্ভব কিছু নয়। এটা এমন একটা বক্তব্য যাকে Giordano Bruno'র[১৮] 'কীটাণুজীব' (monad) থেকে নিয়ে Emil Butro'র 'প্রাকৃতিক নিয়মাবলী' (Natural Law) পর্যন্ত সবই সমর্থন করতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, 'আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানবকে এজন্যে যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে'- এ বিষয়টি সর্বদা এবং সর্বাবস্থায় বাস্তবে সংঘটিত হয়েছে। তাই বিশাল বিশ্বচরাচর যার সকলেই স্বীয় স্রষ্টার অনুগত ও নিয়মানুবর্তী হয়ে চলে, সেখানে কতিপয় মানুষ যারা আনুষ্ঠানিক নিয়ম কানুনের দিক থেকে ও সজ্ঞানে স্রষ্টার অবাধ্য হয়, যদি ঐ বিশাল অনুগত শ্রেণীর সাথে এ মুষ্টিমেয় অবাধ্যের আনুপাতিক তুলনা করা হয়, তাহলে অনুপাতের অঙ্কটা এতই নগণ্য হবে যে, বলা যায় সেটা হবে সসীম সংখ্যার সাথে অসীম সংখ্যার আনুপাতিক তুলনা; বরং আরো সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে : এমনকি একজন নিকৃষ্টতম ও পাপিষ্ঠতম ব্যক্তিও তার পৈশাচিকতা ও জঘন্যতম পাপকাজে এর ক্ষেত্রপ্রস্তুত থেকে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে একাজে ব্যবহৃত উপায় উপকরণগুলো ঠিকই সৃষ্টি জগতের অঙ্গনে ঐশ্বরিক নিয়মাবলীর আনুগত্যশীল ছিল। যেমন ধরুন :

এক নরপশু একটি নিষ্পাপ শিশুকে জবাই করলো। এখন এই জবাই কাজে ব্যবহৃত যে ধাতব পদার্থটি, যা প্রথমে প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে খনি অভ্যন্তরে ছিল এবং সেখানে থেকে উত্তোলন করে পরবর্তীতে যেসব কারিগরী প্রক্রিয়ায় একটি ধারালো হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, সেখান থেকে শুরু করে উক্ত হত্যাকারীর বাহুর শক্তি যা সে একাজে প্রয়োগ করেছে এবং স্থান কাল পাত্রের যে অনুকূল পরিবেশ ও ক্ষেত্র এ পাপাচারের জন্যে তৈরী হয়েছে, তদ্রুপ উক্ত শিশুর গলার নরম অংশ ও চাকু চালানোর পথে শিশুটির বাধা প্রদান না করা ইত্যাদি আরো অসংখ্য সব প্রাকৃতিক ঘটনা ও হত্যাকারীর মানসিক ক্রিয়াবলী এসবই প্রকারান্তরে প্রকৃতি ও তার নিয়মাবলীর সুপ্রসারিত অঙ্গণে আল্লাহরই পরিচালনা ও ইচ্ছার সামনে আত্ম-সমর্পিত।

আর যে জিনিসটি পাপিষ্ঠ ব্যক্তির এ অবাধ্যতা, অনাচার এবং ঔদ্ধত্যের কারণ, সেটা তার নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। এখানে 'তার নিজের সাথে' বলতে তার সেই ব্যক্তিত্বের কথা বলা হচ্ছে, যা ভাল-মন্দের জ্ঞান লাভ করার যে মাধ্যম তার রয়েছে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে তার মধ্যে যে প্রতিরোধ শক্তি রয়েছে এবং সর্বোপরি যে বিবেকের ডাক ও সুস্থ মস্তিষ্ক কর্তৃক বিচার বিবেচনা করার যে সামর্থ্য তার মধ্যে রয়েছে- এসব কিছু দ্বারা গড়ে ওঠে এবং এতসব উপায়-উপকরণের অধিকারী হয়েও এরূপ জঘন্য নিষ্ঠুর অপরাধযজ্ঞে লিপ্ত হয়। তাই, এ অপরাধ তার সাথেই সংশ্লিষ্ট। মানুষ এ জায়গায় এসে ধ্বংসপরায়ন ও পাপিষ্ঠ হয় আর ঐসব খোদাপ্রদত্ত নিরপেক্ষ সত্য বিষয়গুলো যেমন বস্তুগত দৈহিক কাঠামো, প্রাকৃতিক ও মানসিক শক্তি এবং সেই সব ঘটনা ও ফলাফল যেগুলো নিজেদের জন্য উৎকৃষ্টতম স্থান প্রতিষ্ঠা করাতে পারতো, অথচ সেগুলোকে তলানীতে নিক্ষেপ করে এবং আল্লাহর আযাব লাভের মাধ্যমে পরিণত করে।

ইতোপূর্বে এ বিষয়ে ইশারা করা হয়েছে যে, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য যে ইবাদত, একে নিছক অভ্যাসজনিত বা তুচ্ছ উপকারজনিত বিশেষ কিছু শারীরিক কসরৎ বলে ব্যাখ্যা করা একটি অবান্তর ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। যদি লোকেরা জানতো যে, ইবাদাতের অর্থ কি তাহলে এমন কাউকেই পাওয়া যেত না, যে নিজেকে মহাপ্রতিপালকের অনন্ত অনুগ্রহের আঙ্গিনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ইবাদাতের এ অর্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রফেসর মোহাম্মাদ তাকী জা'ফরী[১৯] বলেন :

'কেউ যদি এতটুকুই অবগত হয় যে

১. প্রকৃতির বিশাল কারখানাটি তার জন্যে দোলনার ন্যায়, যে তাকে চলতে শেখায় এবং দুগ্ধ পান করায় যাতে বড় হয়ে ওঠে।

২. অতঃপর প্রকৃতির এ কারখানাই তার জন্য বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরীক্ষণাগারে পরিণত হয়, যাতে তার মননে লুপ্ত গুপ্তধনগুলো প্রস্ফুটিত করে সেগুলো ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. তদ্রুপ যদি অবগত হয় যে, প্রকৃতির দোলনার দিকটি থেকে নিয়ে এর পরীক্ষণাগার হিসাবে উন্নতব দিকটি পর্যন্ত সকল অঙ্গনই হলো সুপরিসর ইবাদাতখানার একেকটি অংশস্বরূপ।

-এ তিনটি বাস্তবতাকে সামনে রেখে সে কেবল আর একটি মাত্র অবগতি, হ্যাঁ, আর একটি মাত্র অবগতি নিয়ে তার ইবাদাত শুরু করবে। সেটা হলো "এ বিশ্বজগতে সে নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্যে এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাব"[২৩] এই পথটি ধরে অগ্রসর হচ্ছে, যার সমাপ্তি ঘটে আল্লাহর সাক্ষাত লাভের মাধ্যমে।"

এই যে বলা হলো এর সমাপ্তি হলো 'আল্লাহর সাক্ষাত' লাভ, এটা এ অর্থে নয় যে, এ লক্ষ্য ও গন্তব্য দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে কিম্বা পুনরুত্থানের দিনে বাস্তবরূপ লাভ করবে; বরং, ইবাদাত শুরুর প্রথম মুহূর্তটি থেকে উক্ত লক্ষ্য ও গন্তব্য ক্রমে ক্রমে তার খোঁজে আসবে। এ ইবাদাতের নির্দিষ্ট কোন গুণগত ও পরিমাণগত রূপ নেই। ক্ষুদ্র গ্রামে ফসলের ক্ষেতে শিশুর কোদাল চালানো থেকে নিয়ে বৃহত্তর মানব কল্যাণে শতকোটি টাকার সম্পদ অকুণ্ঠে বিতরণ পর্যন্ত (যা প্রকারান্তরে খোদায়ী বাগিচায় চারা রোপণ করার নামান্তর), কিম্বা সত্য জানার লক্ষ্যে জ্ঞানের পাতায় একটি ছত্র পাঠ করা থেকে নিয়ে ইউনিভার্সাল দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, জীবিকা নির্বাহের জন্য কারখানার ধূলোবালি ঝাড়ু দেওয়া থেকে নিয়ে বৃহৎ প্রকল্পের ঠিকাদারী ও নির্বাহী প্রধানের দায়িত্ব পালন ইত্যাদি সবকিছুই উপরোক্ত শর্তে এক অদ্বিতীয় উপাস্যের ইবাদাত হিসাবে পরিগণিত।

তবে যিকিরসমূহ এবং অন্যান্য বিশেষ পদ্ধতিতে যেসব ইবাদাত, সেগুলো ঐ সকল মানুষের আত্মে ফিরিয়ে আনার জন্যে, যারা কিছু সময়ে নিজের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। আর ধীরেধীরে মন ও মননকে শাণ দিয়ে সেখানে ঐশ্বরিক সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করে এবং পূর্ণতায় উন্নীত হয়।

একটি প্রশ্ন : যদি সকল মানুষই উক্ত ইবাদাত পালনে সফল হয়, তারপর কী?

কেউ বলতে পারে যে, বুঝলাম ইবাদাতের সুবিস্তৃত অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে এবং সেটা মানুষের মুখে ইবাদাতের যে অর্থ শোনা যায়, তার চেয়ে অনেক ব্যাপকতর। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এরূপ পবিত্র ও উৎকৃষ্ট জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি কী?

উত্তর : এ প্রশ্নটি যেন এমন যে, ঝর্ণার কিনারাস্থ বিন্দু বিন্দু পানির ফোঁটাগুলো গড়িয়ে পড়ে জলধারার সাথে মিশে সময়ের পরিক্রমায় মাহাসাগরে গিয়ে পতিত হয়। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তারপরে কি? এ প্রশ্নটি যতক্ষণ পর্যন্ত পানির ফোঁটা ঝর্ণার কিনারায় গড়িয়ে পড়ার অবস্থায় থাকে ততক্ষণ যৌক্তিক হয়। কিন্তু মহাসাগরে প্রবেশ করার পর যখন ফোঁটাগুলোর অস্তিত্ব বাস্তবরূপ লাভ করবে, তখন 'তারপর কি?' এ প্রশ্ন আর যৌক্তিক থাকবে না। কারণ, আর তো কোন অপেক্ষা বাকী নেই, যে তা মেটানোর জন্যে এমন প্রশ্ন উঠবে। কিম্বা জড় পদার্থের দ্রব্য ও উপাদানসমূহ পরস্পর মিশ্রণ ও ক্রিয়ার মাধ্যমে জীবন উৎপন্ন করার পর এবং সে জীবন বৃদ্ধিলাভ করার পর আত্মাকে গ্রহণ ও তার

Dhaka University Institutional Repository

সক্রিয়শীল হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হওয়ার পরে যদি বলা হয় : তারপরে কী? তাহলে প্রশ্নকর্তার জানতে হবে যে তার এ প্রশ্নটা পানির ফোঁটা মহাসাগরে পরিণত হওয়ার আগের কিম্বা প্রাণহীন দ্রব্যের আত্মাসম্পন্ন হয়ে ওঠার আগেকার স্মৃতি বহন করে। কিন্তু বর্তমানে এ প্রত্যাশা করা অযৌক্তিক হবে যে এখনো সেই একই ক্যাটেগরির উত্তর বলা হবে, যে উত্তর পূর্ববর্তী ধাপে তার প্রশ্নের উত্তরে বলা হতো। উদাহরণস্বরূপ আত্মার ধরণ প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন করতে আগ্রহী ব্যক্তি যদি জানতে চায় আত্মার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, বর্ণ এবং (পদার্থিক) গতি ও স্থিতি সম্পর্কে, যেগুলো ইতোপূর্বে অতিক্রম করে এসেছে পূর্ববর্তী ধাপগুলোতে এবং সার্বিকভাবে ধারণা করে যে, 'কারণ' ও 'কেন' গুলো ঠিক সেরকমই, যেমনটা এরূপে পরিণত হওয়ার আগে ছিল। পাশাপাশি উত্তরগুলোও বুঝি ঠিক সেই ক্যাটেগরির, যেগুলো পূর্বে ছিল!

এরূপ হারিয়ে যাওয়া বেচারা লোককে বলা উচিত : বন্ধু হে! দৃশ্যপট বদলে গেছে। সে সময়ে যখন প্রশ্ন করতে যে কেন তোমার হাত নাড়িয়েছ এবং তোমার উদ্দেশ্য কি ছিল? তখন তোমাকে উত্তর দিত আমার ইচ্ছাই যা কলম ধরার জন্যে তাড়িত হয়েছিল, সে-ই আমার হাতকে চালিত করেছে। আর যদি পুনরায় জিজ্ঞেস করতে : কেন কলমটি ধরতে চাইছিলে এবং তোমার উদ্দেশ্য কি ছিল? তাহলে আবারও তার উপযুক্ত উত্তর শুনতে পেতে। কিন্তু তোমার প্রশ্নের পালা যখন এখানে পৌঁছবে যে জিজ্ঞেস করবে, কেন অনুভব করো নিজের আত্মরক্ষা করতে হবে? তখন অসম্ভব যে পূর্বের ন্যায় উত্তর শুনবে। কারণ, নিজের আত্মরক্ষা করা হলো একটি 'উদ্দেশ্য' যা কর্তার সত্তা (জীবন) থেকে উৎসারিত হয়, বাইরে থেকে না।

সুতরাং 'তারপরে কী' এ প্রশ্ন করা তখনই সঠিক হয় যখন প্রশ্নকারীর মধ্যে এখনো অপেক্ষার জায়গা বাকী রয়েছে, আর উত্তর এসে উক্ত অপেক্ষার জায়গাটি পূরণ করবে। কিন্তু যখন ধরে নেয়া হয়েছে যে, উর্দ্ধলোকীয় উৎসমূলের ত্রিসীমানায় প্রবেশ করার পর সকল প্রতীক্ষা ও অপেক্ষার অবসান হয়ে যায়। তখন তো 'তারপরে কি' এরূপ প্রশ্নের আর অবকাশ থাকে না। ঠিক যেমন বারিবিন্দু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে গতিশীল হয়ে সাগরপানে চলতে থাকে, তারপর এক সময় মহাসাগরের মহামিলনে মিশে গিয়ে শান্ত হয়। তখন আর কোন অপেক্ষা নেই, নেই কোন প্রতীক্ষার প্রশ্ন।

কেউ আবার একথা বলতে পারে যে, উপরোক্ত প্রশ্নটি লোকদের মাথায় অনেক এসেছে; কিন্তু এ উত্তর তাদেরকে সন্তুষ্ট করেনি। কাজেই উত্তরটা যথেষ্ট ও সঠিক নয়।

এ কথার জবাবে বলা যায়: একজন আগাছা সাফকারী লোকের কথা ধরুন, যার কাস্তে ভোঁতা হয়ে গেছে এবং আগাছা সাফ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। এই অক্ষমতাই কাটাবাগান সম্পর্কে শতাধিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এমনকি স্বয়ং তার অস্তিত্বের ব্যাপারে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এদিকে আপনি যেহেতু ঐ কাটাবাগানের সব বিষয়ে অবগত আছেন, সেহেতু সম্পূর্ণ যুক্তি ও প্রমাণসিদ্ধ উত্তর তাকে প্রদান করলেন। কিন্তু সে বলে : তারপরে কী? এ কাটাবাগানের আসলে একটি যন্ত্রণা রয়েছে। সেটা হলো তার কাস্তে ভোতা হয়ে যাওয়া, যা তাকে ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে। তাই সে কাস্তে শান দেবার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য রেত খুঁজে বের করার পরিবর্তে কাটাবাগান ও নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনার সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ উত্তরগুলোকেও অবোধগম্য বলে গণ্য করে এবং বলে : 'তারপরে কী?'!!

সমস্যাটা কোথায় ?

কিতাবকে না পড়ে যদি করা হয় মাথার বালিশ !

পারস্যের মহাকবি রুমীর কবিতায় এসেছে :

"আমার ইবাদাতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি জিন ও মানব..'- পড় এ কথাটি
এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই জগত সৃষ্টির
যদিও এ কিতাবের উদ্দেশ্য ঐ বিদ্যা দান
বালিশও হতে পারে তুমি যখন করো শয়ন"

কবিতার এ কয়টি চরণে চমৎকার ভাবে সত্য কথাগুলো ফুটে উঠেছে। মানুষ ও জগত হলো দুটি সারসত্যের নাম। তবে অনেক কাজে ও অনেক ব্যাপারে অদ্ভুত নমনীয়তার সামর্থ্য রয়েছে এদুয়ের। মানুষের কথাই ধরা যাক। তাকে যে অবস্থা ও প্রেক্ষিতেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেভাবেই গড়ে ওঠে। রক্তপিপাসু জল্লাদও হয়। হিংস্র পশুর চেয়েও হিংস্র হয়। আবার ফেরেশতাদেরকেও ছাড়িয়ে যায়। গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও মানুষ থেকে বে-খেয়াল হয়ে পড়ে। সকল মানুষ ও জগত তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সকল মানুষ ও জগতকে ভালবাসে। দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকে নিয়ে থুড়থুড়ি বৃদ্ধ পর্যন্ত নির্বিশেষে মানবের মাথার খুলি দ্বারা সৌধ নির্মাণ করে! নিকৃষ্টতম ব্যক্তির হাতের পুতুল হয়। আবার এমন স্বাধীনতাও পায় যে মহাকবি হাফিযের ভাষায় :

যা কিছুতেই রঙের সম্পর্ক রয়েছে তা থেকে মুক্ত হয়। তুচ্ছ কোন জিনিসের কাছে বন্দী হয়ে পড়ে। মহত্তের এমন শিখরে পৌঁছে যে, বিশ্ব জগত তার অন্তরের এক কোণে স্থান নেয় এবং সে ভার অনুভব করে না।

জ্বি, এ মানুষ থেকে গোটা মানবের মুক্তি ও সৌভাগ্যের প্রতীক যেমন গড়া যায়, তদ্রুপ রক্তপিপাসু ফেরাউন নমরূদ কিম্বা চেঙ্গিসকেও গড়া যায়। তবে মানুষের এই যে বিভিন্ন রূপ ধারণ, যার কোন কূল-কিনারা নেই, এতে অবশ্য তার ঐশ্বরিক উর্দ্ধলোকের প্রতি আকর্ষণের যে মহান উদ্দেশ্য রয়েছে, সে বাস্তবতার সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি হয় না।

এখানে হয়তো কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, মানুষ নামের এ বস্তুটা, যে, সকল জঘন্য ও ইতরামির সাথে নমনীয় হতে পারে, তার জন্যে কি-ইবা আর উদ্দেশ্য থাকতে পারে? অর্থাৎ এই যে বস্তুটা, যাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই রূপান্তরিত করা যায় এবং সবকাজেই যাকে পাওয়া যায়, সে তো মোমের সমতুল্য কিছু, যাকে যে কোন রূপে রূপদান করা যায়। এরূপ বস্তুর আবার কি-ইবা উদ্দেশ্য থাকতে পারে?! কে জানে,

Dhaka University Institutional Repository

একি সেই বস্তুটিই নাকি যা নাস্তিকগণ (Nihilist) যেমন টমাস হবসরা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন?

উত্তরে বলবো, না। এটা আপনাদের বড়ই ভুল হচ্ছে। কারণ, আপনারা মহাকবি রুমীর উপমার দিকে লক্ষ্য করুন। একটি কিতাব, যার বিষয়বস্তু হলো মানবের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়। কিন্তু এ কিতাবকে পড়ার বদলে আপনি বালিশের স্থলে একে মাথার নীচে রেখে সুখনিদ্রায়ও যেতে পারেন। কিম্বা ঘর গরম করার জন্যে এটা পুড়িয়ে আগুনের তাপ উৎপাদন করতে পারেন। আপনার কাপড়ে ধুলো লেগে যাবে বলে আপনি ঐ কিতাবটি ধুলোর ওপরে বিছিয়ে তার ওপরে বসতে পারেন। কিম্বা মলত্যাগের পর আপনার অঙ্গ পরিষ্কার করার জন্য এর কাগজ ছিড়ে ব্যবহার করতে পারেন। এখন প্রশ্ন হলো : এই যে কিতাবের বিচিত্র ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই বলে কি ঐ কিতাব ও তার ভেতরের বিষয়বস্তুর যথার্থ ও যৌক্তিক উদ্দেশ্য ও মূল্য হারাবে?! দুঃখজনকভাবে একদল দার্শনিক ও চিন্তাবিদ যখন দেখেন যে, অধিকাংশ মানব হলো এ শ্রেণীর অর্থাৎ বিভিন্ন রূপে ও কাজে তারা নমনীয় হয়, তখন অমনি ফলাফলে পৌছান যে বৃথাই এ মানব জীবন!

সত্যিই মানুষ বড় সরলপ্রাণ।

আমরা এসব লোকের সাথে এমন কি একটি কথাও বলবো না। শুধু এটুকু ছাড়া যে, তাদেরকে অনুরোধ করবো, অনুগ্রহ করে আপনারা আগে আপনাদের অস্তিত্বকে প্রমাণ করুন। তারপর আসুন, তখন দেখা যাবে আপনাদের বক্তব্য কি এবং মানুষ ও জগত নামের এই মহামূল্য কিতাব থেকে কি চান? আর কেনই বা এ দু'খণ্ড কিতাবকে না পড়ে বালিশ রূপে মাথার নীচে রেখে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হয়েছেন?!

মোটকথা, আমরা যদি এরূপ নিদ্রা পরিত্যাগ করে এবং জীবন ও জগতকে বালিশ না বানিয়ে বরং এর বিষয়বস্তুকে মনোযোগের সাথে পাঠ করি তাহলে অন্য এক দৃষ্টি আমাদের গড়ে উঠবে। যতবেশি জীবনের রাজ্যে গভীরে প্রবেশ করবো, ততবেশি জীবনের সাথে আল্লাহর সম্পর্ককে অনুধাবন করতে সক্ষম হবো, যে আল্লাহ কার্যকারণ নিয়মের উর্দ্ধে এবং যে কোন পূর্বালোচনার প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তদ্রুপ জীবনের সারসত্তা থেকে যে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলাদা নয় সেটাও স্পষ্ট হয়ে যায় এবং 'তারপরে কী?'- এ রঙীন প্রশ্নেরও নিষ্পত্তি হয়ে যায়। মানব মন খুঁজে পায় প্রশান্তি। দু'হাত মেলে বরণ করে নিতে তার কোন কুণ্ঠা থাকে না জীবনের এগিয়ে চলা (অর্থাৎ মৃত্যুকে)। 'হে প্রশান্ত চিত্ত! ফিরে এসো তোমার প্রতিপালকের নিকট সন্তুষ্ট ও সন্তোষজনক হয়ে, আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।'[২১]

লক্ষ্যসম্পন্ন জীবনের বৈশিষ্ট্য :

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত যে জীবন, তার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেগুলো প্রত্যেকটি একদিকে যেমন পরবর্তী জীবনের উন্নততর লক্ষ্যের পথে উপকরণ তথা মাধ্যম, অন্যদিকে সেগুলো নিজেও আবার উন্নত লক্ষ্য হিসাবেও গণ্য। কারণ, যেহেতু জীবনের উৎকৃষ্ট লক্ষ্য হলো ঐশ্বরিক সাক্ষাত জগতে প্রবেশ করা, সেহেতু আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলো উক্ত লক্ষ্যপথের জন্য মাধ্যম ও উপকরণ হিসাবে পরিগণিত হয়। আবার

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু এ আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলো ঐ উৎকৃষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে বিমূর্ত (abstract) অবস্থায় সুস্থিত (stabilized) হয়, সেকারণে এগুলোর লক্ষ্য হওয়ারও একটি দিক রয়েছে। যেমন 'জ্ঞান'। জ্ঞানের একটি দিক রয়েছে মাধ্যম হিসাবে সত্যে উপনীত হওয়ার, তদ্রুপ মানসিক পূর্ণতা হিসাবে জ্ঞান লক্ষ্যও বটে। আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্যবান জীবনের জন্যে বহিরাগত বা আকস্মিক ধরনের কোন বিষয় নয়; বরং, তা এরূপ জীবনের উৎকৃষ্ট ফসল হিসাবে বিকশিত হয়। এ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো যথা :

১. উর্ধ্বলোকীয় অঙ্গীকার

এটাই হলো লক্ষ্যবান জীবনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যা মানবতাবাদের (Humanism) মূল উপাদান। উন্নত ও উর্ধ্বলোকীয় অঙ্গীকার বলতে বুঝায় : বিশ্ব জগতে নিজের স্থানকে জানা এবং পূর্ণতার যাত্রা পথে অবিরাম চলতে থাকা ও ব্যক্তিত্বকে সফল করা। এ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটানোর মাধ্যমেই উর্ধ্বলোকীয় অঙ্গীকারের ছায়াতলে সামাজিক অঙ্গীকারসমূহ পালন করার অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং তা এক দায়ভারের চাপ থেকে জীবন চালনার চালিকাশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আর ক্ষমতা ও অন্যান্য বিশেষ সুবিধার অজুহাতে সামাজিক অঙ্গীকার পালনে ফাকিবাজি ও দায়িত্ব এড়িয়ে চলার ব্যাপারটাও নাকচ হয়ে যায়। কারণ, এখানে অন্যদের সাথে অঙ্গীকার আসলে নিজের সাথেই অঙ্গীকারের নামান্তর।

২. জীবনের মূল্য চেনা

কেবল লক্ষ্যসম্পন্ন জীবনই পারে জীবনের প্রকৃত রূপটি প্রস্ফুটিত করে তুলতে এবং একে নিছক (প্রকৃতির নিয়মের) বাধ্যবাধকতার আবর্তে আবদ্ধ কোন মামুলী জিনিস বলে প্রতিপন্ন না কওে; বরং এটাকে উচ্চতর স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে মূল্যমান দান করে। মানুষের জন্য কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারাই এটা প্রমাণিত করা যায় না যে, 'জীবন' তার মূল রাজ্যের মধ্যে এমন একটি সারসত্য জিনিস যে, সমস্ত জীবকুল হলো সে সারসত্যের থেকে উৎসারিত ঢেউয়ের মতো। এটা কেবল তখনই প্রমাণিত করা যাবে যখন জীবন উচ্চতর কোন লক্ষ্যের অধিকারী থাকবে, যার সত্যিকার চেহারাকে প্রকাশিত করতে পারে। জাত বা সত্তার প্রতি সম্মান, যা সকল মানবতাবাদী, বিশ্ব মানবাধিকার সনদ, মানববিশারদ দার্শনিকবৃন্দ এবং ঐশীপুরুষ ও নৈতিকতার ধর্মপুরুষগণের উৎকৃষ্ট আদর্শ, সেটা লক্ষ্যসম্পন্ন জীবনের এ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে নেওয়া ব্যতীত সম্ভবপর হবে না।

৩. আলোকপূর্ণ ও সৌভাগ্যপূর্ণ হওয়া

কোন সে ব্যক্তি, যে জীবনের বিপদ আপদের গহীন অন্ধকারে নিজের 'আমি'কে গোলযোগ ও হতভম্ব অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারে? প্রত্যেক মানুষই তার ব্যক্তিত্বের বড়ত্ব ও ছোটত্ব অনুপাতে এরূপ অন্ধকার ও দুর্যোগের বিড়ম্বনার মুখোমুখি হয়। কখনো এ অন্ধকার ও দুর্দশা মানুষের অস্তিত্বের জগত ও আত্মার আকাশকে এমনভাবে ঘন-ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত করে তোলে যে এমনকি খোদ্ মানুষকে দেখার ক্ষমতাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেয় এবং যে, কোন ধরনের প্রতিরোধের মনোবলও ভেঙ্গে দেয়। এরূপ অসহায় মুহূর্তে কেবল জীবনের উচ্চতর লক্ষ্যই মানুষকে ঐ অন্ধকারের তিমিরে বিধ্বস্ত হওয়া থেকে

Dhaka University Institutional Repository

এবং ঐ দুর্দশার মধ্যে বিপর্যস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার শক্তি যোগায়। এখানে যে আলোক ও সৌভাগ্যের কথা বলা হচ্ছে তার অর্থ এটা নয় যে, লক্ষ্যবান জীবনের সকল বিষয়ই আলোময় হবে এবং যেসব সুখতৃপ্তি সচরাচর তাদেরকে সৌভাগ্যবান করে, তার মধ্যেই বুঁদ হয়ে থাকবে; বরং, উদ্দেশ্য এটা যে, উচ্চতর লক্ষ্য মানুষ ও জগতের সকল অঙ্গনে এক অর্থবহ আলো নিক্ষেপ করে। যার ফলে যদিও জীবনের খুঁটিনাটি দিকগুলো অন্ধকার ও বেদনাপূর্ণ থাকেও, কিন্তু জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্র ও ফসল আলোময় ও সৌভাগ্যঘন বলে পরিগণিত হয়।

৪. বিশ্ব-জগতকে সিরিয়াস (অকপট) ভাবে নেওয়া

বিশ্ব-জগতের প্রত্যেকটি অংশ ও সম্পর্কের মধ্যে নিয়মের শাসন বিদ্যমান। আর এ নিয়মই আমাদের বিজ্ঞান উৎপত্তির উৎস বটে। সে দিকে লক্ষ্য রাখলে এ সত্যটি প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ব-জগত হলো একটি earnest systematic unit বা অকপট নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা। মাক্স পালাঙ্ক[২২] ও বার্ট্রাণ্ড রাসেল এর ভাষায় এই অকপট বাস্তবতা দৃশ্যমান জাগতিক বিষয়াবলীর পর্দার আড়ালে ও জগতের পদার্থিক সম্পর্ক বন্ধনের অন্তরালে চলমান রয়েছে।[২৩]

বলা বাহুল্য, বিশ্ব-জগতকে সিরিয়াস ভাবে গ্রহণ করা ব্যতীত লক্ষ্যপূর্ণ জীবনের কোন Logic আমাদের থাকবে না। একারণেই বলা যায় : এ বৈশিষ্ট্যটি উক্ত জীবনের জন্য যেমন কারণ (Cause) এর দিক হতে পারে, তদ্রূপ কার্যের (effect) দিকও হতে পারে। কারণ, যদি কারো জন্য বিশ্ব জগত সিরিয়াস হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে তার জন্য জীবনও সিরিয়াস প্রমাণিত হবে। কেননা, জীবন তো জগতেরই একটা অংশ। আবার বিপরীতক্রমে, যে ব্যক্তির জন্যে জীবন লক্ষ্যসম্পন্ন বলে প্রমাণিত হয়, আর জগত ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্কটা যেহেতু 'সমগ্র' ও 'অংশ' এর সম্পর্ক, কাজেই বিশ্ব-জগতও সিরিয়াস ও লক্ষ্যসম্পন্ন বলে তার কাছে গ্রহণীয় হবে।

লক্ষ্যসম্পন্ন জীবন বিশ্ব-জগতকে সিরিয়াসভাবে নেয়। এর কারণ হলো : যদি জগতের ওপর কর্তৃত্বশীল নিয়মসমূহকে সিরিয়াস বলে গণ্য না করে, তাহলে এর ফলে খোদ জীবনই ক্রীড়াকৌতুক ও তুচ্ছতায় পর্যবসিত হবে। আর মানবীয় গুণ-মান, মর্যাদা, মূল্যবোধ ও বাস্তবতা সবকিছুই একমুষ্ঠি হেয়ালি কল্পনা ও নিরর্থক জল্পনারই নামান্তর হবে।

৫. উর্ধ্বলোকীয় মুক্তি অর্জন

জীবন যখন লক্ষ্যসম্পন্ন বলে গণ্য হবে, তখন আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে জড় ও জীবনের দ্বন্দ্বে যে ভারী শিকল সজ্জিত রয়েছে, সেটা আত্মা থেকে খুলে আমাদের রিপু ও প্রবৃত্তির অমূলক কামনা-বাসনার গলায় বাঁধা হয়। আর একেই আমরা বলি উর্দ্ধলোকীয় মুক্তি। অথচ লক্ষ্যহীন জীবনে উক্ত শিকল, রিপু ও প্রবৃত্তির গলা থেকে খুলে আত্মার গলায় বাঁধা হয়। একেই আমরা বলি পাশবিক লাগামহীনতা।

উর্ধ্বলোকীয় মুক্তির জীবন হলো লক্ষ্যসম্পন্ন জীবনের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এ মুক্তির অর্থ হলো মানব ব্যক্তিত্বের ঘাটতি সৃষ্টিকারী ও তাকে কল্পনাসর্বস্ব আত্মপূজায় বুঁদ করে ফেলার কারণসমূহ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

নিস্তার লাভ করা। এমনকি অন্যান্য মুক্তি, যা মামুলি জীবনযাত্রা পরিচালনার জন্যে অর্জন করা হয়েছে সেগুলো থেকেও নিস্তার লাভ করাকে বুঝায়, যেমন সামাজিক মুক্তি ও আকীদাবিশ্বাসগত মুক্তি।

তাই উর্ধ্বলোকীয় মুক্তি অর্জন ছাড়া জীবনের কোন যৌক্তিক অর্থ খুঁজে পাইনি। এটাই মানব মুক্তির স্বরূপ।

পাদটীকা ও তথ্যসূত্র :

১. **Ja'fari,** Professor **Mohammad-Taqi** (1923 - 1998) born in Tabriz was a prominent Iranian scholar, thinker, and theologian. He was the only Iranian Philosopher who made conversation on various philosophical problems with British Philosopher Sir Bertrand Russell.

২ **Ja'fari,** Professor **Mohammad-Taqi** , *Philosophy and the objective of life.*, p117 (Written in Persian language)

Popkin, Richard H. (December 27, 1923—April 14, 2005) was an academic philosopher who specialized in the history of enlightenment philosophy and early modern anti-dogmatism.

৪. **Popkin, Richard H.**, *Philosophy Made Simple*, Avrum Stroll (Paperback - July 1, New York, 1993)

৫ আল কোরআন, ২৯ ঃ ৬৪;

৬. আল কোরআন, ১৬ ঃ ৯৭;

৭. আল কোরআন, ৮ ঃ ৪২;

৮ আল কোরআন, ৬ ঃ ১২২;

৯. **Hugo, Victor**, *Les Misérables,* (Prof. Mohammad-Taqi Ja'fari রচিত Philosophy and the objective of life বইয়ের ১২৬ পৃষ্ঠার বর্ণনা থেকে উৎকলিত।)

১০ সূরা আল-আনফাল, আয়াত নং ২৪;

১১. **Balkhī, Jalāl ad-Dīn Muḥammad,** *Quatrain* No. 1173, translated by Ibrahim Gamard and Ravan Farhadi in *"The Quatrains of Rumi"*, an unpublished manuscript

১২ আল কোরআন, ৬ ঃ ১৬২;

১৩ আল কোরআন, ৫১ ঃ ৫৬;

১৪ আল কোরআন, ১৯ ঃ ৯৩;

১৫. আল কোরআন, ৪১ ঃ ১১;

১৬ আল কোরআন, ১৩ ঃ ১৫;

১৭. *Danishnama-i 'Alai* is called "the Book of Knowledge for [Prince] 'Ala ad-Daulah". One of Avicenna's important Persian work and it covers such topics as logic, metaphysics, music theory and other sciences of his time.

Dhaka University Institutional Repository

[২৭] **Bruno, Giordano** (1548 – February 17, 1600), born Filippo Bruno, was an Italian Dominican friar, philosopher, mathematician and astronomer, who is best known as a proponent of the infinity of the universe.

[২৮] **Ja'fari,** Professor **Mohammad-Taqi,** *Philosophy and the objective of life.*, p143 (Written in Persian language)

[২৯] আল কোরআন, ২ : ১৫৬.

[৩০] আল কোরআন, ৮৯ ঃ ২৭.

[৩১] **Planck, Max Karl Ernst Ludwig** (April 23, 1858 – October 4, 1947) was a German physicist who is regarded as the founder of the quantum theory, for which he received the Nobel Prize in Physics in 1918.

[৩২] **Max Planck** বলেন : 'আমরা পদার্থবিদরা হলাম সেই প্রত্নতত্ত্ববিদদের ন্যায়, যারা প্রকৃতির সূত্র ও নিদর্শনাবলী থেকে এর পরাপ্রাকৃতিক বাস্তবতাসমূহকে পাঠ করে থাকি।'

আর **Bertrand Russell** বলেন : 'আমরা হলাম সেই জন্মগত বধিরের সাথে তুলনীয়, যে একটি আসরে বসে রয়েছে, যেখানে দলগতভাবে বাদ্য পরিবেশন করা হচ্ছে। আর উক্ত বধির লোকটি সে বাদ্য শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু তার সুসমঞ্জস বুদ্ধি দ্বারা অনুধাবন করছে যে এ আসরের কাজ কেবল বাদকদলের বাদ্যযন্ত্রে হাত চালানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

Dhaka University Institutional Repository

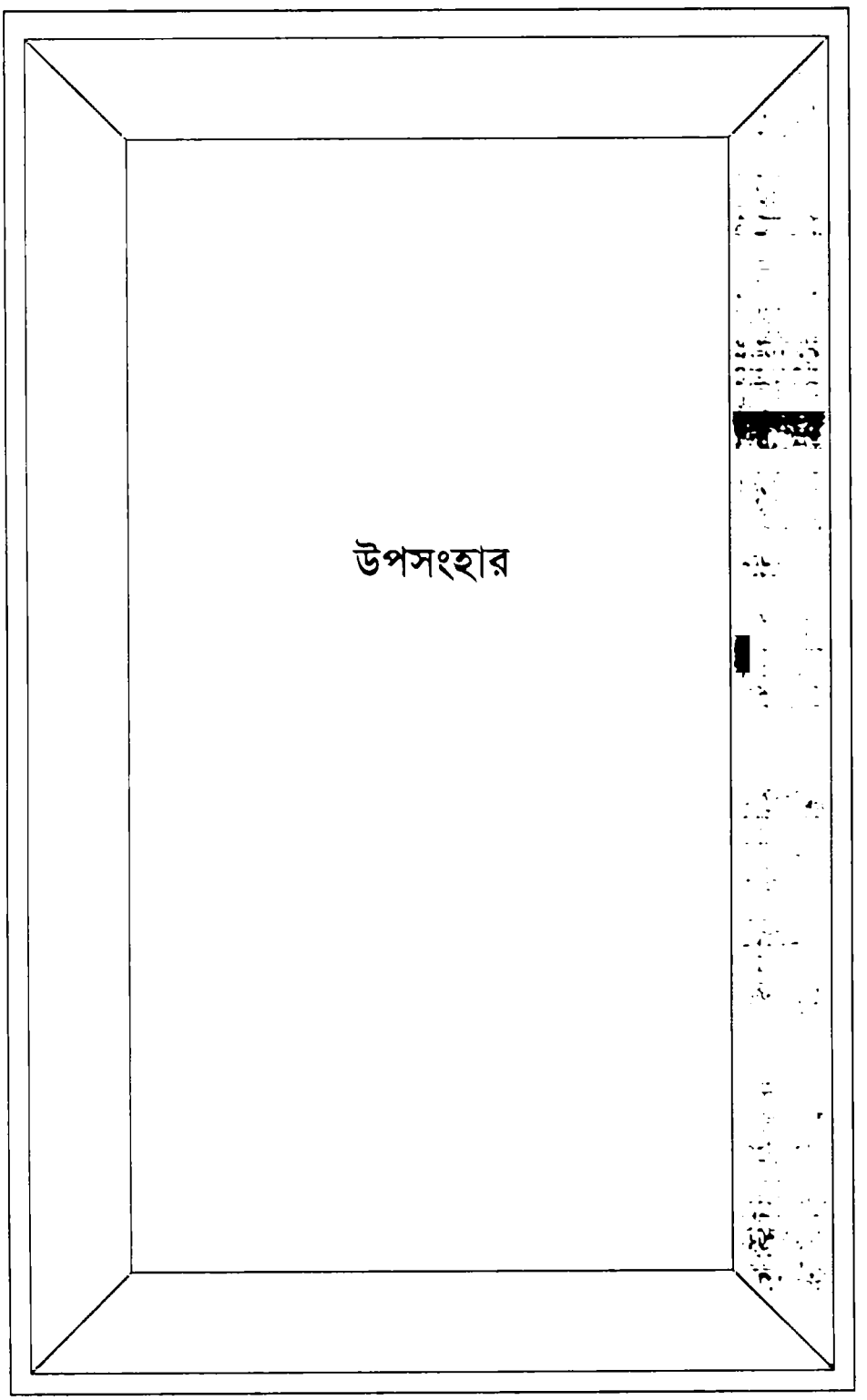

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায়, "আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ'র দর্শনে মানব মুক্তির স্বরূপ" শীর্ষক অত্র অভিসন্দর্ভটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী গবেষণাকর্ম। জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ অর্জনের সাথে সাথে মানবের মুক্তির ভাবনাও বদলে যাওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তাই বলে মানুষের প্রকৃত অস্তিত্ব অর্থাৎ আত্মাকে অস্বীকার করে জড়বাদের মধ্যেই যারা মানব মুক্তির অন্বেষণ করেছেন, আল্লামা তাবাতাবাঈ তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি মানবের মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানবের অস্তিত্বের অতলে ডুব দিয়েছেন। আর ঐ গভীর থেকে যে মণি-মুক্তা আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছেন সেগুলো পর্যালোচনা করে দেখতে পেয়েছেন যে, আসলে মানবের মুক্তি নিহিত রয়েছে স্বীয় মহান স্রষ্টার সমীপে নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণের মধ্যে। মানুষ দুনিয়ার সুযোগকে এমনিভাবে ব্যবহার করবে যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি বয়ে আনে। আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টির কিছু চিহ্ন রেখেছেন। যে ব্যক্তি চিরন্তন পরকাল অর্জন করে এবং নিজেকে পার্থিব সুবিধা আদায়ের নিমিত্তি আল্লাহকে রাগান্বিত করে না, সে মুক্তি লাভ করলো। যে মানব মুক্তি কামনা করে, সে কথায় ও কাজে আল্লাহর নবী এবং ওয়াসীর অনুসরণ করে, যারা হলেন সত্যিকার মুক্তিপ্রাপ্ত মানব। আর এটা কোন একটি বা দুটি কাজের ওপরে নির্ভর করে না। এমন নয় যে, কেবল নামায, রোযা ও যিকিরই তাকে মুক্তি দিয়ে থাকে; বরং যদি প্রত্যেক কাজই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে সম্পন্ন হয়, তাহলে তা মুক্তির ক্ষেত্র গড়ে দেয়। এমনকি পিতামাতর প্রতি দয়ার্দ্র দৃষ্টিপাতও মুক্তির মাধ্যম হয়। এখানে আসল কথাটা হলো, মানব আল্লাহর সন্তুষ্টিকে ঘিরে আবর্তিত হবে, অন্য কিছু নয়। মুক্তি অর্জন করতে কখনো যুদ্ধের ময়দানের ফ্রন্ট লাইনে অবস্থান গ্রহণ করবে, কখনো কল-কারখানায় তা অন্বেষণ করবে। আবার কখনো বা সংসার ও পরিবারের মাঝেই এর উৎস নিহিত রয়েছে।

আমরা যদি আমাদের জীবন ও দীনকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন না করি, তাহলে মুক্তির অভিজ্ঞতা আস্বাদন করতে পারি। আর সামগ্রিকভাবে দীনের নির্দেশাবলী হলো আমাদের সৌভাগ্য ও মুক্তির সোপান। কিন্তু দুঃখজনকভাবে মানুষ কতিপয় বিচ্ছিন্ন ও দ্রুত অপসৃয়মান বিষয়ের কারণে ইউনিভার্সাল ও গভীর বিষয়াবলীকে বিস্মৃত হয়ে যায়। তখন সে ঐ তুচ্ছ বিষয়ের পেছনেই ধাবিত হয়, ভুলে যায় যে আমরা দুনিয়ালোকে এসেছি পরলোকের ফসল আবাদ করার জন্যে। ঠিক যেন সেই শিশুটির মতো, যার মাতৃজঠরের প্রত্যেকটি ক্ষণই হল নতুন পরিবর্তন লাভের এবং প্রতিটি মুহূর্তেই সে পরিবর্তন, বিবর্তন ও বৃদ্ধিলাভের মধ্যে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

যদি কোন স্থানে ভ্রূণ-শিশুটির বৃদ্ধি ক্ষণিকের জন্যেও থেমে যায়, তাহলে তার শরীরে বিশেষ বৈকল্য সৃষ্টি হবে। কাজেই মাতৃজঠরের ভ্রূণটি কখনোই বলতে পারে না যে, এ কয়টি ঘন্টা আমি বিবর্তন ও বৃদ্ধি লাভ ছাড়াই কাটিয়ে দেই, পরবর্তীতে এটা পুষিয়ে নেব- এটা কখনোই সম্ভবপর নয়। এতে তার ভয়ানক ও অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে। আমরা যদি আমাদের জীবনের মুলনীতিগুলো আমাদের দীন বা ধর্ম থেকেই গ্রহণ করি, যা সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও ব্যক্তি মত থেকে মুক্ত, এবং তদানুসারে চলি তাহলে একটি আনন্দময়, নিরাপদ ও উদ্যমী জীবন লাভ করবো। কিন্তু মানুষরা এক সময় এ দীনের অনুসরণ করে চলে, আবার অন্য সময়ে অনুসরণ করে না। এর কারণ হলো তারা দীন পালন করে মজা পায় নি। দুঃখজনকভাবে পরিবারগুলোতে সন্তানদের দীনের আলোকে প্রতিপালন করার জায়গাটি শূন্য রয়ে গেছে। বরং দীনের প্রতি আচরণ করা হয় ব্যক্তিগত রুচিবোধ থেকে। তাদের আবরণটা দীনের। কিন্তু এর শর্ত ও পরিস্থিতি নির্ধারণ করা হয় ব্যক্তির রুচি আর সমাজের পছন্দানুসারে। আল্লাহর সন্তুষ্টি আসলে কিসে- সে দিকটার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

মনে রাখতে হবে যে, কর্তব্য ব্যক্তিকে আইনপরায়ন করে, প্রেমিক করে না। কিন্তু বন্দেগীর অপর নাম প্রেম ও আসক্তি। পরিশেষে বলা যায়, জড়বাদী দর্শন যখন মানব জীবনকে সংশয়বাদের কানাগলিতে ঠেলে দিয়ে মুক্তির পথকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছে, তখন আল্লামা তাবাতাবাঈ'র এ দর্শন সত্যিকার মানব মুক্তির সোপান হোক, স্বস্তি ও শান্তি ফিরে আসুক মানুষের জীবনে। হতাশা নয়, আশায় বুক বাঁধুক বিশ্বমানব।

অত্র অভিসন্দর্ভে সে কথাই প্রতিধ্বণিত হয়েছে বার বার।

সমাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. Corbin, Henry, ***Histoire de la philosophie islamique,*** Gallimard, Paris, **1986,** Persian Version, Amir Kabir Publication, Tehran, 1991.

২. Durant, Will, ***The Story of Philosophy***, Washington Square Press, 1972. Persian Version, Daneshzuie Publication, Tehran, 1994.

: Aurobindo, Sri : ***The Life Divine;*** Sri Aurobindo Binding: Paperback, Co-author/s: Sri Aurobindo

৪. Tabatabaee, Allamah Syed Mohammad Hossain : ***Human Being from Beginning to End,*** 2nd Edition, Allama Tabatabaee Publication, Tehran, 1991.

৫. Parsania, Prof. Hamid, ***Hadis-e Peymane***, Ma`aref - Fifth Printing, Tehran.

৬. James, William, ***The Varieties of Religious Experience,*** Longmans, Green Company, New York, 1929, Persian Version, Daneshzuie Publication, Tehran, 1993.

৭. Jafari, Prof. Mohammad Taqi., ***The Message of Wisdom,*** Keramat Publishing Association, Tehran, 1998, ISBN 964-6608-00-0

৮. Durant, Will : ***The Pleasure of Philosophy;*** Washington Square Press, a division of Simon & Schuster Inc. 1927, Translated into Persian by Abbas Zaryab, Tehran 1994.

৯. Thomas, Henry and Thomas, DanLee, ***Living Adventures in Philosophy***, The County Gile press Gorden City, N.Y. **1886.** Persian Version by Amir Kabir Publication, Tehran,1989.

১০. Morrison, Cressy **:** ***Man in a Chemical World***, Charles Scribner's Sons, New York and London, 1937.

১১. **Hugo, Victor-Marie** : *Les Misérables (*The Miserable Ones, A. Lacroix, Verboeckhoven & Ce, 1862. Persian Version by Amir Kabir Publication, Tehran,1960.

১২. Jafari, Prof. Mohammad Taqi, ***Creation and Man,*** Vali Asr Publications, 3rd Edition, Farus Iran Print, Tehran, 1965;

১৩. Al-Naqvi, Al-Syyed Abu Mohammad Abrar al-Hasnain Fatimi, ***Knowing Infallibles (a.s.) by Quran,*** (Compilation), First Edition, June, 2007.

Dhaka University Institutional Repository

১৪. *আল-কোরআন*, বঙ্গানুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত, বিশতম মুদ্রণ, জুন ১৯৯৮ ইং,

১৫. Emadi, Daryai, *A Glossary of Islamic Words*, Islamic Publication, First Edition, Tehran, 1995.

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *মানুষের ধর্ম*, বুক ক্লাব, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩।

১৭. দাশতি, প্রফেসর মুহাম্মাদ: *নাহজুল বালাগা*, যাহ্‌দ প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, তেহরান, ২০০১।

১৮. Carrel, Alexis: ***L'Homme, cet inconnu* (*Man, The Unknown*)**, 1935, ফার্সি অনুবাদ : ইনায়াত, দুনিয়ায়ে কিতাব প্রকাশনী, তেহরান, ১৯৯৪

১৯. হাকিমী, প্রফেসর মোহাম্মাদ রেযা : *আল্লামা মোহাম্মদ তাকী জা'ফারীর-র চিন্তা ও দর্শন*, রিসার্চ সেন্টার ফর ইসলামিক থট এণ্ড কালচার, তেহরান, ১৯৯৮।

২০. **The Vancouver Statement,** 1989.

২১. **Tabatabaee, Allamah Syed Mohammad Hossain : *Tafsir Al-Mizan,*** Institution for Research and Propagation of the teachings of Ahlul Bait (a.s.) Publication, Qom, 2003.

২২. Behjad, Dr. Mahmud : ***Darwinism,*** Tehran, 5th Edition.

২৩. Kulpe, Oswald : ***Introduction to philosophy:*** Translated into Persian by Ahmad Aram, Tehran, 1965

২৪. মেতাহ্‌হারী, ড. মূর্তাজা : মাজমুআয়ে আছার (রচনাসমগ্র), সপ্তম মুদ্রণ, তেহরান, ২০০৩।

২৫. Popkin, R.H., ***Philosophy Made Simple,*** Avrum Stroll, Paperback, New York, 1993.

২৬. Balkhī, Jalāl ad-Dīn Muḥammad : ***Quatrain*** No. 1173, Translated by Ibrahim Gamard and Ravan Farhadi in *"The Quatrains of Rumi"*, an unpublished manuscript.

২৭. **Avicenna : *Danishnama-i 'ala'i* (*The Book of Scientific Knowledge*), ed. and trans. P Morewedge, The Metaphysics of Avicenna, London: Routledge and Kegan Paul, 1973**

২৮. Rúmí, Maulánà Jalálu'd-din Muhammad : *Masnaví-i Ma'naví,* translated and abridged by E. H. Whinfield, London: 1989.

২৯. Yazdi, Professor Taqi Mesbah : ***Ma'ref –e Quran*** (teachings of Quran), Dar Rahe Haq Institute, Qom, 2000.

৩০. Amoli, Ayatullah Jawadi : ***Tafsir-e Tasnim***, Isra Publication, Qom, 2009.